তব গঙ্গা

গোপাল হালদার

প্রথম সংস্করণ

১৩৬০

দাম তিন টাকা আট আনা

—লেখকের অন্যান্য বই—

কথা-সাহিত্য :—ভূমিকা, ভাঙন, সোতের দীপ, উজান গঙ্গা; একদা, অন্যদিন, আর-একদিন, ধূলিকণা।

প্রবন্ধ-সাহিত্য :—সংস্কৃতির রূপান্তর। মুদ্রণের অপেক্ষায় :—বাঙালী সংস্কৃতিরূপে (নূতন সংস্করণ), বাজেলেখা (নূতন সংস্করণ), বাঙালা সাহিত্যের রূপ-রেখা (পূর্বভাগ)।

৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা ডি, এম, লাইব্রেরীর হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা, বাণী-শ্রী প্রেস, শ্রীসুকুমার চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত রঙ্গিন হালদার

শ্রীচরণেষু—

এই গ্রন্থের ঘটনা-কাল পাঠকের নিকট স্পষ্ট: আনুমানিক ১৮৫৮ হইতে ১৮৭০। পরবর্তী একটি গ্রন্থখণ্ডে ইহার পরবর্তী কালের কথা বলা হইল। তাহা এখনো যন্ত্রস্থ।

২৯. ৯. ৫৩ ইং

লেখক

কোম্পানির দোহাই

১

পীতাম্বর গাঙ্গুলীর পত্র লইয়া লোক আসিয়াছে। দেবপ্রসাদ চৌধুরীকে সঙ্গে না লইয়া চিত্রিসার হইতে তাহার নৌকা ফিরিবে না। দেবপ্রসাদ আর একবার সেই পত্র পাঠ করিল—

শ্রীশ্রী দুর্গা শরণং

পরম শুভাশীর্বাদ বিশেষঞ্চ, কল্যাণবর দেবপ্রসাদ! আমাদের শুভাশীর্বাদ জানিবা ও বাটীস্থ সকলকে তাহা জ্ঞাপন করিবা। ('বিধির বিধানে' কাটিয়া পরে লিখিয়াছেন) মা জগদম্বার নিকট শতকোটি অপরাধে অপরাধী হওয়া বশতঃ আমি অদ্য অগাধ বিপদ সমুদ্র-মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছি। কোথাও কূল-কিনারা দর্শন করি

না। আশার দীপবর্তিকা প্রজ্বালিত করিয়া আমাকে উদ্ধার করিবেক, এমত সুহৃৎ তুমি ব্যতিরেকে অন্য কুত্রাপি কেহ নাই। মনুষ্যজাতি বহু পুণ্যবলে পুত্রলাভ করিয়া স্বর্গীয় পূর্বপুরুষগণেরও তৃপ্তি-বিধান করিয়া থাকে। কিন্তু হা হতোস্মি! ভাই রে দেবপ্রসাদ! লিখিতে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হয়, আমি সুপুত্রদিগের পিতা হইয়াও আজ সেই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছি। নন্দীগ্রামের গাঙ্গুলীগোষ্ঠীর স্বর্গগত পিতৃপুরুষগণও সম্ভবত বংশধরগণের পিণ্ডলাভ করিতে সক্ষম হইবেন না। তুমি বুদ্ধিমান; ইহা হইতেই আমার বিপত্তি অনুমান করিতে পারিবা। ধর্মত্যাগী শত্রুগণের কুপরামর্শে আমার সংসারে কীদৃশ সর্বনাশ সঙ্ঘটিত হইতে চলিয়াছে, তাহা পত্রে অধিক লিখব না। তোমাদিগেরও বিপদ অনুমান করিতে পারিবা। রাজীব একপক্ষকাল পূর্বে অধ্যয়ন মানসে মাতুলালয়ে গমন করিয়াছে, অতএব তাহার বিষয়ে সঠিক সংবাদ আমরা অবগত নাহ। এই দুর্জন সংসর্গ হইতে তুমি শ্রীমানদিগকে রক্ষা না করিলে আর কোনো উপায় সন্দর্শন করি না। তুমি তাহাদের ভক্তিভাজন গুরুজন। পত্রপাঠ তুমি অত্রাগমন করতঃ সর্ববিষয়ে মা ভগবতীর কৃপায় সুব্যবস্থা স্থাপনে আমাকে সহায়তা করিবা,—ইহার কিছুতে অন্যথা না হয়। চিন্তাহরণ ও গিরীশের জননী এই সম্বন্ধে এখনও কিছুই অবগত নহেন। তাহানকার বর্তমান স্বাস্থ্যে এই মর্মান্তিক সমাচার শুনিলে তাঁহার জীবনরক্ষা অসম্ভব হইবেক। ত্বদীয়া জ্যেষ্ঠ ভগ্নী ঠাকুরাণী পুত্রসমীপ বালকদিগের অদর্শনে অত্র উন্মাদিনীপ্রায় ভোজ্যপানীয় ত্যাগ করিয়াছেন। তাহানকারও সনির্বন্ধ অনুরোধ—তুমি অবিলম্বে এইখানে আইস। পত্রসহ নৌকা ও লোক অপেক্ষা করিবে। তোমাকে সঙ্গে গ্রহণ না করতঃ আগমন করিতে পারিবেক না। এই দুর্বিপাকে গৃহস্থিত আত্মীয় কুটুম্ব

সর্বজন আজ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মা জগদম্বা তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশলে রাখুন। গুরুজনদিগের পাদপদ্মে প্রণাম• নিবেদন করিতেছি। বয়ঃকনিষ্ঠ ও কনিষ্ঠাদিগের সকলকে আমার শুভাশীর্বাদ জ্ঞাপন করিবা। ইতি মোং ঢাকা, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ। শুভাশীর্বাদ পত্রমিদং

শ্রীপীতাম্বর গঙ্গোপাধ্যায় দেবশর্মণঃ

দেবপ্রসাদ পত্র হাতে বসিয়া রহিল। ঘটনা সে অনুমান করিতে পারিতেছে। পীতাম্বর গাঙ্গুলীর পুত্র চিন্তাহরণ ও গিরীশ যে ব্রাহ্মান্দোলনে বিশেষরূপ মাতিয়া উঠিয়াছে, তাহা সে শুনিয়াছিল। সে বুঝিল, হয়ত তাহারা এখন ব্রাহ্ম মতে দীক্ষাগ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। দেশে যাহা ঘটিতেছে তাহাতে চিন্তাহরণ ও গিরীশ যে এই পথ অবলম্বন করিতে পারে, তাহা দেবপ্রসাদ পূর্বেই অনুমান করিয়াছিল। রাজীব তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র, চিন্তাহরণ গিরীশেরই সহযোগী, তাহাদের আবাল্য বন্ধু। এই বৎসর রাজীবের পরীক্ষা। চিন্তাহরণ দুই বৎসর পূর্বেই এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছিল। তখন পীতাম্বর গাঙ্গুলী তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন—গৃহিণী নন্দীগ্রামে থাকেন, ঘরে পুত্রবধূ আনিতে চাহেন। চিন্তাহরণের বিবাহ দিতে তথাপি পীতাম্বর বেশ বিলম্ব করিয়াছেন;—তিনি বাল্যবিবাহের বিরোধী। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিন্তাহরণ জলপানি পায়। গিরীশ গত বৎসর প্রবেশিকায় প্রথম স্থানই অধিকার করিয়াছে দুইজনাই ব্রহ্মধর্মে উৎসাহী। কিন্তু দেবপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজীব কি করিতেছে? এই বৎসর তাহার পরীক্ষা। সেও যে বন্ধুদেরই অনুগামী, এই কথা দেবপ্রসাদ কেন, চৌধুরী বাড়ির সকলেই জানে। সম্প্রতি সেই অশান্তি অবশ্য কিছু কমিয়াছে।

রাজীবের সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো কথা গাঙ্গুলী মহাশয় লেখেন

নাই। মাতুলালয়ে গিয়া থাকিলে তাহার জন্য আশঙ্কা নাই। দেবপ্রসাদ পত্র খুলিয়া আর একবার পড়িল—"তোমাদিগেরও বিপদ অনুমান করিতে পারিবা।" দেবপ্রসাদ নিঃশঙ্ক হইতে পারে না।

চৌধুরী বাড়ির সকলেই ততক্ষণে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছে। ঢাকা হইতে গাঙুলী মহাশয়ের পত্র লইয়া নৌকা আসিয়াছে। কি ব্যাপার?

বৃদ্ধা বড় কর্ত্রী সদরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: পীতাম্বর কি লিখিয়াছে? রাজীবের কথা?

না, রাজীবের কথা নয়। তবে আমাকে যাইতে হইবে।

কেন? কোনো কিছু অমঙ্গল নয় তো? —শঙ্কিতা হন বৃদ্ধা।

না, অমঙ্গল নয়। বিষয়ঘটিত গোলমাল।

শৈলীর মাতাও জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন। আরও কেহ কেহ আসিল। কেহই আশ্বস্ত-বোধ করিতে পারে না। দেবপ্রসাদ বিশেষ মিথ্যা আশ্বাসও দিতে পারে না। তাহার নিজের মনেই দৃঢ় বিশ্বাস নাই। যাহা ঘটিবে, তাহা সে নিরোধ করিতে অক্ষম। সকলেই তাহা জানিবেও, গোপন করিবার উপায় নাই। গৃহে, গ্রামে নানা কথা শুধু আরও গোলমাল সৃষ্টি করিবে।

অন্তঃপুরে নিজের ঘরে পৌছিলে ভার্যা মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিল: তোমাকে না কি শহরে যাইতে হইবে? —তাহার চোখে-মুখে উদ্বেগ।

হাঁ।

একটু নীরব থাকিয়া মহেশ্বরী বলে: তোমার শরীর ভালো নয়। নিজে না গেলে হয় না?

পত্র দেখ, বুঝিতে পারিবে। —শান্ত হইলেও কণ্ঠস্বর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

দেবপ্রসাদ মহেশ্বরীর হাতে পত্রখানা দেয়! মহেশ্বরীও জানিত

স্বামী তাহাকে সবই বলিবেন। সে কম্পিত বক্ষে পত্রপাঠ শেষ করিল; তারপর মুখ তুলিয়া চাহিল। দেবপ্রসাদ বলিল: বুঝিলে সব?

আগেই বুঝিয়াছিলাম।—মহেশ্বরী নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।—কিন্তু পত্রে রাজীবের বিষয়ে তো কোনো স্পষ্ট কথা নাই।

আমিও তাহা দেখিতেছি। সে মাতুলালয়ে গিয়াছে, তাহা একটা ভালো কথা।

সে কি করিবে?—মহেশ্বরীই জিজ্ঞাসা করে সোদ্বেগে।

মহেশ্বরী আরও স্থির ভাবে তাহা বুঝিতে চাহে। দেবপ্রসাদ উত্তর দিল: কি করিয়া বলিব? এখন সে বড় হইয়াছে;—সে স্বাধীন।

'স্বাধীন।'—মহেশ্বরী কথাটা পূর্বেও শুনিয়াছে। কিন্তু দেবপ্রসাদ যাহাই বলুক, সে উহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারে নাই। মহেশ্বরী বেশ বুঝিল—দেবপ্রসাদ ভাবিত হইয়াছে, এবং নিজেকে নিরুপায়ও বোধ করিতেছে। মহেশ্বরীর ওষ্ঠাধরও এইবার কাঁপিল। সে তাড়াতাড়ি বলিল: না, রাজীব অমন হইবে না।

দেবপ্রসাদও আশ্বাস খুঁজিয়া পায়। উৎসুকভাবে সে বলে: কিসে তোমার এই কথা মনে হয়?

—রাজীব মাস কয় পূর্বে নিজের মাতৃশ্রাদ্ধ যথারীতি সম্পাদন করিয়াছে, তাহার উগ্রতা অনেকটা কমিয়াছে। তাহার মাতা জীবিত নাই বটে, কিন্তু সে মাতুলের গৃহে গিয়াছে, এবং তাহার মাতুল ন্যায়রত্ন 'বাঘের মত মানুষ'।—একটু থামিয়া মহেশ্বরী বলিল: আর তাহা ছাড়া তুমি আছ। তোমার কথা রাজীব অমান্য করিতে পারিবে না। দেবদেবী না মানুক, তোমাকে সে মানে।

দেবপ্রসাদ চিন্তামগ্ন হইল। মহেশ্বরীও উদ্বিগ্নদৃষ্টি। পরে অকস্মাৎ সে বলিল: বিভূতিকে আমি আর বিদেশে পাঠাইব না।

দেবপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্র বিভূতি এখনো মাত্র বৎসর আট-নয়ের বালক। বাড়িতে পিতার বিদ্যালয়ে প্রাথমিক পড়াশুনা করে। তাহাকে ইংরেজী ইস্কুলে পড়াইবার কথা লইয়া স্বামীস্ত্রীতে জল্পনা-কল্পনা চলিত। ছেলেকে দেবপ্রসাদ বিদেশে পাঠাইবার কথা বলিত। মহেশ্বরীর তাহা ভাবিতে কষ্ট হয়—সে কি বিভূতিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে? এই মুহূর্তে কিন্তু মহেশ্বরীর মনে অন্য ভয়ে জন্মিতেছে। সে বলিল: কাজ নাই তাহার ইংরাজী ইস্কুলে পড়িয়া।—কাহার মাতৃ কণ্ঠ ব্যাকুল।

দেবপ্রসাদ এইবার হাসিল। বলিল: ইংরাজী ইস্কুলের দোষ কি? কত জনাই তো পড়ে ইস্কুলে।

মহেশ্বরী একবার ভরসা পায়। আবার পরক্ষণেই ভাবিয়া শিহরিয়া উঠে: না, না, কাজ নাই আমাদের অত আশায়।

দেবপ্রসাদ সহাস্যে বলিল: তাহার তো দেরী আছে। এখন রাজীব, চিন্তাহরণ ও গিরীশের কথা ভাবিতে হয়।

চৌধুরী বাড়িতে সকলেই শঙ্কিত। পত্রে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও সকলেই অনুমান করিতে পারিতেছে—চিন্তাহরণ ও গিরীশ বোধ হয় 'খ্রীষ্টান' হইয়া যাইবে। আর রাজীব? কেহ কিছু উল্লেখ করে না। যেন তাহার সম্বন্ধে আশঙ্কা নাই, ইহা ভাবিতেই তাহারা চায়। তাহাদের চৌধুরীদের ভবিষ্যতের সকল আশা রাজীব। সে কি বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়া ধর্ম, বংশ, গৃহ সব ভাসাইয়া দিবে? আশঙ্কা ও উদ্বেগ বুঝি চাপা যায় না।

হঠাৎ হয়ত শৈলীর মা বলিয়া ফেলেন—মহেশ্বরীর মতই: কাজ নাই রাজীবের শহরে ইংরাজী পড়িয়া। দেবপ্রসাদ তাহাকে চিত্রিসারে ফিরাইয়া আনুক।

'আসুক সে। পরীক্ষার কথা শুনিব না, এখনি বিবাহ দিতে হইবে।—

তুমি আপত্তি করিলেও আর শুনিব না।'—দেবপ্রসাদকে জানায় বড় কর্ত্রী ঠাকুরাণী, দেবপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূ। ঠিক হয়, বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র অনন্ত রাজীবের মাতুলালয়ে যাইবে; ন্যায়রত্ন অনুমতি দিলে রাজীবকে বাড়ী লইয়া আসিবে। আপাতত তাহার শহরে গিয়া আর কাজ নাই। সেখানে সমাজ ধর্ম সব উহারা ভাসাইয়া দিতেছে।

দেবপ্রসাদ রাত্রিতেই শহরে রওনা হইবে।

আবার উঠিয়া পড়ে চিন্তাহরণ ও গিরীশে কথা—কি দুর্ভাগ্য পীতাম্বর গাঙ্গুলীর! অমন মানী মানুষের ছেলেদেরও এমন দুর্মতি।

গুরু ভার চাপিয়া থাকে চিত্রিসারে চৌধুরী বাড়ির সকলের বুকে।

২

পীতাম্বর গাঙ্গুলী আর একবার দেওয়ান বসন্ত সরকারের বাসাবাটী হইতে হতাশ হইয়া ফিরিলেন। বসন্ত সরকার জিরতলীর কুমারদিগের দেওয়ান। কুমারেরা তাঁহার হাতে ধরা, তিনি তাই অগাধ ক্ষমতার অধিকারী। পীতাম্বর গাঙ্গুলীর মত তিনিও শহরে 'উন্নতিশীল দলের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বৎসর দুই-তিন পূর্বে দলের মধ্যেই বিবাদ বাধে। একদল নিজেদের পরিচয় দেয় 'উন্নতিশীল ব্রাহ্ম দল' নামে। বসন্ত সরকারও পীতাম্বর গাঙ্গুলী অমনি নিজেদের দলের নাম রাখিল 'হিন্দু-হিতকারী দল'। বসন্ত সরকার তাই এত চটিয়াছেন—কত সাহস এই ব্রাহ্মগুলির! এই শহরে—তাঁহাদের বুকের উপর—পীতাম্বর গাঙ্গুলীর পুত্রদের পিতৃগৃহ হইতে তাহারা অপহরণ করে? তাঁহার তাঁবে জিরতলীর সর্দার লাঠিয়াল আছে কেন?

কিন্তু কোথায় যে ব্রাহ্মরা ছেলে দুইটাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, সেই সঠিক সংবাদই পাওয়া যায় নাই। সর্দার লাঠিয়াল করিবে কি?

সংবাদ সংগ্রহ এইবার শক্ত হইয়াছে। সেবার যখন তাহারা দলের নাম রাখিল 'হিন্দু-হিতকারী দল,' তখনো একবার চিন্তাহরণ ও গিরীশ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। তখন তাহারা ব্রাহ্মদের উপাসনা গৃহের সংলগ্ন ছাত্র 'মেসে' ছিল। তাহারা তখন স্বচ্ছন্দে শহরে ঘুরিয়া বেড়াইত, কলেজে যাইত। পীতাম্বর গাঙুলী গাড়ী লইয়া তাহাদের তাই কলেজের পথে ধরিয়া ফেলেন। ধরিয়া একেবারে নিজ বাসাবাটীতে লইয়া আসেন, তাহাদের উপরে পাহারা বসান। অবশ্য তাহাতে কিছুই হইত না, ইহা তিনি নিজেও জানেন। চিন্তাহরণ চুপ করিয়া থাকিলেও দৃঢ়-সংকল্প। আর গিরীশ পিতাকে মান্য করিয়া যে চুপ করিয়া থাকিবে, তেমন ছেলে নয়,—দুরন্ত তেজী ছেলে সে। গিরি ঠাকুরাণী সারাদিন তাহাদের চোখের সম্মুখে বসিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে কোনোরূপে তাহাদের গৃহে থাকিতে তখন রাজী করেন। চিন্তাহরণ ও গিরিশ তাঁহার পুত্রাধিক; তাহাদের জন্যই ত তিনি বিদেশে বাস করিতেছেন। 'মাসী মা' সঙ্গে না আসিলে ত গিরীশ প্রথম শহরে পড়িতে আসিতেও চাহে নাই। তিনি ত শুধু 'মাসী মা' নহেন, রুগ্ন মায়ের স্থান গ্রহণ করিয়া নন্দীগ্রামেও তিনিই তাহাদের বরাবর পালন করিয়াছেন।

সেবার চিন্তাহরণ ও গিরীশ তাই নিজেদের গৃহে ফিরিয়া আসে, মাসী মা জয়লাভ করেন। অবশ্য তিনি স্থির করিয়া দিয়াছিলেন—গৃহে তাহারা ব্রাহ্মোপাসনা করিবে, তাহাদের স্বাধীন মতের উপর কেহ হাত দিবে না। গিরি ঠাকুরাণী নিজেই সব ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। যাহা

করে করুক, তবু তাহারা গৃহে আছে, সমাজে আছে,—তাঁহার চোখের সম্মুখে আছে।

হয়ত এই জন্যই ব্রাহ্মরা এবার গিরীশ ও চিন্তাহরণকে এমন করিয়া লুকাইয়া ফেলিয়াছে যে, কিছুতেই তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। চারিদিকে প্রবল জনরব—কেশব সেন শীঘ্রই নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবেন। তখন এখানেও উন্নতিশীল ব্রাহ্ম দলের উৎসব হইবে। গিরীশের বন্ধু মহেশ দত্ত-ব্রাহ্ম ডিপুটি হরকান্ত দত্তের ছেলে—ইস্কুলে পড়ে। সে বলিতেছে—সেই সময়েই চিন্তাহরণ ও গিরীশ ব্রাহ্ম মতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নূতন সমাজে যোগদান করিবে। কলেজের যুবকেরা কেশব সেনের নামে সকলেই পাগল;—বৎসর তিন পূর্বে ঢাকা আসিয়া তিনি সকলকেই মাতাইয়া গিয়াছিলেন। চিন্তাহরণ ও গিরীশই আবার এই যুবক দলের নেতা। চিন্তাহরণ ব্রহ্মানন্দের ভক্তির আবেগে বিচলিত, গিরীশ তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতায় উদ্দীপ্ত। ব্রাহ্মরা বলেন, তাহারা প্রকাশ্যে সমাজে যোগদান না করায় যুবক দলের মনোবল অনেকাংশে বিনষ্ট হইতেছে। তাই ব্রাহ্ম কর্তৃপক্ষরাও এই চক্রান্তে যে জড়িত আছে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। পীতাম্বর-বাবু অনুমান করিতে পারেন কোথায় তাহাদের আশ্রয় লইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সংবাদ সঠিক দিতে পারিত রাজীব। হয়ত এই কারণেই ঠিক দিন সাতেক পূর্বে সে বই পত্র লইয়া মাতুলালয়ে গিয়াছে। বলিয়া গিয়াছে পূজার পূর্বে ফিরিবে না। পীতাম্বর গাঙুলী ছুটাছুটি করিতেছেন। মাসী মা অন্দরে আকুল হইয়া কান্নাকাটি করেন। বসন্ত সরকারও সঠিক সংবাদ পাইতেছেন না, কিছুই করিতে পারেন না।

দেবপ্রসাদ চৌধুরী শহরে আসিয়া পৌছিল। রাজীবের বিষয়ে সে একটু আশ্বস্ত বোধ করিতেছে। রাজীব যখন ন্যায়রত্নদের

গৃহে তখন রাজীবের জন্ত আপাতত তাহাদের বিশেষ আশঙ্কা নাই।

পীতাম্বর গাঙ্গুলী দেবপ্রসাদকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন। গাঙ্গুলী মহাশয় দেবপ্রসাদের পুরাতন মুরুব্বি; এমন মানী ও দেমাকী লোকটা করেন কি? দেবপ্রসাদ সত্যই বিচলিত বোধ করে—আধা-টাকপড়া মাথায় কোথায় তাঁহার সেই কেশ-পারিপাট্য, সেই গোঁফ দাড়ির সযত্ন বিন্যাস? চুল যাহা আছে উস্ক-খুস্ক, চোখে অস্থিরতা, অসহায়তা। সেই আত্মসন্তুষ্ট, অবাধ-গতি, সর্বদা মুরুব্বি সাজিয়া সদা ব্যস্ত মানুষের এই দশা?

দেবপ্রসাদের দ্বিধা ও সংকোচ না মানিয়া অন্দর হইতে 'ছোট চৌধুরীকে' উদ্বেল অন্তরে ডাকাইয়া পাঠান গিরি ঠাকুরাণী। গাঙ্গুলী মহাশয়ই দেবপ্রসাদকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান: আর লজ্জা নিয়মের কথা তোলা কেন ভাই? ছেলেদের জন্য আমারই কি মুখ আছে মানুষের কাছে? দেখিবে—গিরি ঠাকুরাণীকে পাগল হইতে বাকি।

পীতাম্বর গাঙ্গুলীর বাসাবাটিতে আশ্রিত অনুগত এমন একটি লোক নাই যে এই 'মাসী মায়ের' কথা ভক্তিতে কৃতজ্ঞতায় না বলে। বিদেশে সকলেরই তিনি আপদে-বিপদে ভরসা। দেবপ্রসাদের তো কথাই ছিল না, সে গাঙ্গুলীদের কুটুম্ব, গাঙ্গুলী মহাশয়ের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত সহকারী। বৎসর তিনেক পূর্বে রাজীবের বসন্ত হইলে গিরি ঠাকুরাণীই রাজীবকে জোর করিয়া অন্দরে আনাইয়াছিলেন। কথা না বলিলেও দেবপ্রসাদও দূর হইতে তখনই দেখিয়াছে গিরি ঠাকুরাণীর আশ্চর্য স্নেহ-মমতা ও কর্মকুশলতা, গৃহকর্তা ও ছেলে-বুড়া সকলের উপর তাঁহার অসীম ক্ষমতা। কে তাহার রূপে-গুণে বিমুগ্ধ না হইয়া পারে?

দেবপ্রসাদকে দেখিয়াই কিন্তু সেই গিরি ঠাকুরাণী এখন কাঁদিয়া আকুল হইলেন। এখনও দ্বারের অন্তরালেই রহিলেন বটে, কিন্তু সেখান হইতেও দেখা গেল তাঁহার অর্ধাবগুণ্ঠিত মুখ। দেবপ্রসাদ চমকিত হইল। রাজীবের শুশ্রূষা কালে মাঝে-মাঝে দিনে এক আধবার করিয়া এই গৃহকর্ত্রীকে সে তখন দেখিয়াছে—দেখিবার মতই তিনি! পূর্ণাঙ্গী সেই বিধবার দেহে তখন পরিণত যৌবনের সুস্থির শ্রী আসিতেছে। তথাপি মুখে, চোখে, উজ্জল ললাটে, সহাস্য আননে প্রাণৈশ্বর্য যেন প্রত্যক্ষ। আনন্দে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত; অথচ বুদ্ধিতে, সহজ মর্যাদায় আবার সুসংহত। এই রমণী জন্মিয়াছেনই যেন সংসারে কর্ত্রী হইতে। কিন্তু এখন এ কি মূর্তি সেই গিরি ঠাকুরাণীর! অবশ্য এই কয় বৎসর তাঁহাকে দেবপ্রসাদ দেখে নাই। কিন্তু এখন যে দেখিয়া চমকিত হইতে হয়। সেই সবই আছে, কিন্তু সবই যেন আচ্ছন্ন হইতে চলিয়াছে। হয়ত এই কয় বৎসরে বয়সের জন্যই দেহ অনেকটা উজ্জলতা হারাইয়া থাকিবে। রূপৈশ্বর্যেও তাহাতে ভাঁটা পড়িতে পারে। কয়দিনের চোখের জলে, বিনিদ্র রাত্রির ভাবনায় ক্লান্তিতে সেই গরিমাভরা মুখে এখন কালি ঢালিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহাও তো সব নয়। দেবপ্রসাদ কি এই যাতনা না বুঝিয়া পারে? সে বেশ জানে—গিরীশ চিন্তাহরণ 'মাসীমায়ের' প্রাণ।

কণ্ঠের উদ্‌গত রোদন দমন করিতে করিতে গিরি ঠাকুরাণী অন্তরাল হইতেই বলিলেন: ছোট চৌধুরী, আপনি তাহাদের শিক্ষক। আপনার হাতেই তাহারা মানুষ। আপনাকেই তাহারা মান্য করে, আর কাহারও কথা শুনিবেও না। তাই আপনাকে তাড়াতাড়ি আনাইতে লোক পাঠাইয়াছি।—বলিতে বলিতে গিরি ঠাকুরাণী একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাথার অবগুণ্ঠনও বড় করিয়া টানিতে ভুলিয়া

গিয়াছেন সেই গিরি ঠাকুরাণী! চোখের জলে ভাঙিয়ে পড়িলেন গিরিঠাকুরাণী:

একবার তাহাদের বাড়ি লইয়া আসুন। আমার কথা থাকুক—তাহাদের মায়ের কথা ভাবুক। চিন্তাহরণের সেই বউটির কথাও ভাবুক!

দেবপ্রসাদের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠে। সে কাহারও কথা না ভাবিয়া পারে না। রাজীবের কথাও তাহার মনে পড়ে। মনে পড়ে চিন্তাহরণের রুগ্না মায়ের কথা, বালিকা বধুর কথা! আর, এই গিরি ঠাকুরাণীকে তো চক্ষেই সে দেখিতেছে।

কিন্তু কোথায় তাহারা দুই ভাই? বসন্ত সরকারের সঙ্গে দেখা করিতে গেল দেবপ্রসাদ। দেওয়ান সাহেব রাগে গর গর করিতেছেন। ইংরেজ পুলিশ সাহেব কিছুক্ষণ পূর্বেই কোতোয়ালীর বড় দারোগাকে দিয়া দেওয়ান সাহেবকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন—শহরে ইহা লইয়া কোনো শান্তি ভঙ্গ হয়, ইহা তিনি চাহেন না। উগ্র ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বসন্ত সরকার বলেন,—আমরা যে থানায় খবর দিয়াছি, দুই দুইটা ছেলে যে নিখোঁজ, তাহার কোনো উত্তর নাই। 'তাহারা স্বাধীন—বড় হইয়াছে।' দারোগা বলে কি জানো?—'জানেনই তো ব্রাহ্মরা সাহেবদের হাত করিয়াছে—খ্রীস্টানে খ্রীস্টানে ধূল পরিমাণ।' মিথ্যা কথা বলে না ত।

দেবপ্রসাদও বুঝিল—ইহার পিছনে ব্রাহ্ম বড় চাকুরিয়ারা কেহ আছে। ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ হরকান্ত দত্তের সহিত পাল্লা দেওয়া এমনিতেও হিন্দুদের কাহারও যোগ্যতায় কুলাইত না। তিনি নূতন শিক্ষিত ডিপুটি, গম্ভীর প্রকৃতি। তাঁহারা মদ্যপান করে বলিয়া তিনি তাহাদের সহিত ঘৃণায় কথাও বলিতেন না। এখন পুলিশ সাহেবের

নির্দেশ শুনিবার পর দেওয়ান বসন্ত সরকারও আর কিছুই করিতে উদ্যোগী হইলেন না। দেবপ্রসাদই বা করিবে কি ?

দেবপ্রসাদ অনেক ভাবিয়া নিজ কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল।

ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হরকান্ত দত্তের বাসাবাড়ি। সায়ংকালীন উপাসনা চলিতেছে। বাহিরে বসিয়াও দেবপ্রসাদ যেন পরিচিত কণ্ঠ শুনিতে পাইতেছে। সেই কণ্ঠ কি ভুলা যায় ? উপাসনান্তে প্রবেশ করিলেন একত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের ভদ্রলোক। বারান্দায় দেবপ্রসাদকে দেখিলেন।

দেবপ্রসাদ দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিল।

কি চাই আপনার ?—প্রতি-নমস্কার করিয়া ভদ্রলোক আবার এই প্রশ্ন করিলেন।

চাই—হাঁ, সত্য কথাই বলিবে দেবপ্রসাদ—আমি চিন্তাহরণ ও গিরীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।

স্থির দৃষ্টিতে তাকাইলেন হরকান্ত দত্ত। দৃঢ় গম্ভীর দেহ যেন আরও দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে। চোখে ভ্রূকুটি ফুটিল, কণ্ঠও কর্কশ হইল : এখানে তাহারা আছে, তুমি জানো ?—আর 'আপনি' নয়, একেবারে 'তুমি'।

হাঁ একটু আগে গলা শুনিয়াছি—দেবপ্রসাদ ধীর স্বরে বলিল। —কিন্তু আপান ব্রাহ্ম। মিথ্যা কথা বলিবেন না, জানি। বলুন 'নাই' ; আমিও মানিব—আমি ভুল শুনিয়াছি।

গাম্ভীর্য আবার গর্বে পরিণত হইল। তিনি ব্রাহ্ম, 'মিথ্যা কথা বলিবেন না,' জানে সকলে। হরকান্ত দত্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন :

'না' বলিব না। কিন্তু বলিব—দেখা হইবে না।

দেবপ্রসাদ বিনীত' সাহসে বলিল: অন্যায় ক্ষমা করিবেন। আপনি মানুষের স্বাধীনতা মানেন। তাহাদের একবার বলুন—দেবপ্রসাদ চৌধুরী চিত্রিসার হইতে আসিয়াছে, দেখা করিতে চাহে। তাহারা যদি বলে, 'দেখা হইবে না,' আমি আপনার কথাই গ্রহণ করিব।

আর একবার দেবপ্রসাদের আপাদমস্তক ডিপুটি সাহেব দেখিলেন; সন্দেহের কিছু নাই। কিন্তু লোকটা স্বাধীনতার কি বোঝে?

বলিলেন: স্বাধীনতা! আপনারা মানুষের স্বাধীনতার কি জানেন?—একটু উপহাস তাঁহার কণ্ঠস্বরে। উগ্রতা কিন্তু কমিয়া আসিতেছে। দেবপ্রসাদও আবার 'আপনি' হইয়া উঠিয়াছেন। লোকটাকে হরকান্ত দত্তের নিতান্ত অশিক্ষিত মানুষ মনে হয় না।

সহাস্যে দেবপ্রসাদ বলিল: এই মাত্র জানি—মানুষের স্বাধীনতা, —এবং জাতির স্বাধীনতা—কাহারও স্বাধীনতা—কাড়িয়া লইবার অধিকার অন্যের নাই।—স্বরটা কিন্তু সুদৃঢ় বিশ্বাসের।

দাঁড়াইয়া দেবপ্রসাদকে দেখিতে লাগিলেন হরকান্ত দত্ত দুই বৃহৎ চক্ষু দিয়া। কুঞ্চিত ললাটে চোখ বুজিয়া একটু কি ভাবিলেন। তারপর বলিলেন: বসুন।—বলিয়া তিনি ভিতরে গেলেন। দেবপ্রসাদ আবার বাহিরের বেঞ্চে বসিল।

হঠাৎ কে আসিয়া প্রণাম করিল।

চিন্তাহরণ!—জড়াইয়া ধরিল দেবপ্রসাদ—এত বড়, এত সুন্দর হইয়াছ তুমি!

চলুন ভিতরে, কথা হইবে।

তখন চিন্তাহরণ ছিল তরুণ কিশোর—একটু রোগা ছিপছিপে, ভাবুক প্রকৃতি। দেবপ্রসাদ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে।—

বড় হইয়াছে, তাহা তো হইবেই। কিন্তু মুখেও একটি স্থির বিনীত ভাব আসিয়াছে। এইটি কে? গিরীশ নিশ্চয়। সেই চঞ্চল, বাড়ির আদরের ছেলে কেমন চোখ তুলিয়া মাথা উঁচু করিয়া দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়াছে।

আদেশের স্বরে এবার গৃহস্বামী বলিলেন: নিন, কথা বলুন। আমি যাইতেছি।

আশ্চর্য হইয়া গিরীশ বলিল: কেন, আপনার যাইতে হইবে কেন?

দেবপ্রসাদও বলিল: আপনি থাকিলেই বরং ভালো।

তোমাদেরও স্বাধীনতা চাই—আলাপে-আলোচনায়।—বলিয়া সগর্বে বিদায় লইলেন ডিপুটি সাহেব। তাঁহার মর্যাদাজ্ঞান আছে, গর্বও আছে!

গিরীশ এইবার প্রণাম করিল। না, সে চিন্তাহরণ নয়; শান্ত, স্থির, শ্রদ্ধা তাহার নাই। সে প্রদীপ্ত যুবক—তেজীয়ান অশ্বের মত আপন শক্তিতে অধীর। মাথা নিজের সম্মতিতে ছাড়া নীচু করিতে সে অস্বীকৃত। এতক্ষণ সে তাই প্রণামও করে নাই।

নিয়মিত কুশল-প্রশ্ন করিল চিন্তাহরণ: কবে আসিলেন চৌধুরী খুড়া? বাড়িতে কেমন আছেন সবাই? ইত্যাদি। শেষে:

কাজ আছে বুঝি কিছু?

কাজ? না তোমাদের জন্যই আসা।—দেবপ্রসাদ জানাইল।

গিরীশ বেশ শক্ত করিয়াই বলিল: আসিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

দেবপ্রসাদ বলিল: আমিও তাহা জানি। কিন্তু গাঙুলী মহাশয় ডাকিলে না আসিয়া কি আমি পারি?

গিরীশ তৎক্ষণাৎ বলিল : বেশ, কি করিয়া খবর পাইলেন আমরা এই বাড়িতে আছি? গোয়েন্দা লাগাইয়াছেন বুঝি আপনাদের দেওয়ান বাহাদুর? লাঠিয়ালও আপনার সঙ্গে দিয়াছেন সম্ভবত?—এ যেন তাহার জিরতলীর প্রজা। পাইক দিয়া ধরিয়া আনিলেই হইল—কাছারিতে 'বাঁশডলা' দিবেন। ভয়ে ভয়ে নাকে খত দিবে নিরুপায় মেরুদণ্ডহীন প্রজা।

অধীরতা ও ক্ষোভ চাপিতে শিখে নাই গিরীশ। সেই জিদী আর বাড়ির আদরের কনিষ্ঠ পুত্রই রহিয়াছে। কিন্তু চিন্তাহরণ তাহার ভাব দেখিয়া সংকোচ বোধ করিতেছে। ইতিমধ্যে আর একটি যুবকও আসিয়া তাহাদের নিকটে বসিয়াছে। বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও সে নম্র নয়; তাহার দৃষ্টিতেও সব্যঙ্গ হাস্য। চিন্তাহরণ আরও বিব্রত বোধ করিল। দেবপ্রসাদ বুঝিল এই সেই মহেশ দত্ত—ডিপুটি বাবুর পুত্র। চিন্তাহরণ তাড়াতাড়ি বলিল : থামো, গিরীশ! তারপর বলিল : আপনার শরীর একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে, চৌধুরী খুড়া। তাহা লইয়া না আসিলেও হইত।

হইত তাহা জানি। কিন্তু তবু আসিতেই হইবে—তোমার বাবা ডাকিলে। তাহা তোমরা বুঝিবে না। একে উনি কুটুম্ব—গুরুজন। তারপরে দেখিয়াছ আমি তাঁহারই আশ্রয়ে প্রতিপালিত। শোনো তবে গিরীশ, তুমি রাগ করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদের খবর কাহারও নিকট পাই নাই। হয়তো তোমার বাবা বোঝেন যে, তোমরা এই বাড়িতে আছ। কিন্তু সেই সংবাদও তাঁহারা সঠিক জানেন না। আমি আসিয়াছি নিজেই। কেমন মনে হইল—হরকান্তবাবু ইংরেজী শিক্ষিত, মিথ্যা কথা বলিবেন না।

দৃপ্ত হাস্য দেখা দিল মহেশের চোখে।

গিরীশ হাসিয়া উঠিল: ইংরেজী শিক্ষিতেরা মিথ্যা কথা বলে না নাকি?

তাহাই তো শুনিয়াছি। হিন্দু কলেজের ছাত্র মিথ্যা বলে না, এই নাকি তাহাদের গর্ব।

মহেশ দত্ত বলিয়া উঠিল: মিথ্যা গর্ব। তাহারা মিথ্যা বলিত না?—মদ গিলিত গেলাসে গেলাসে। না করিত এমন কুকর্ম নাই।

গিরীশ একটু নিম্নস্বরে বলিল: না, মিথ্যা হয়তো তাহারা বলিত না। কিন্তু ইংরেজী শিখিয়াছিল তাহারা কি জন্য? মাইকেল না হয় বাংলা কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু ইংরেজের কোন মহৎ গুণটা তিনিই পাইয়াছেন—তাহাকে লইয়া যে আপনারা এখানে পর্যন্ত হৈ-চৈ করেন?

আবার চিন্তাহরণ বাধা দিল; না হইলে গিরীশের ইংরেজী-মাহাত্ম্য কীর্তন বুঝি থামিবে না। চিন্তাহরণ বলিল: দত্ত মহাশয় কিন্তু মেণ্টাল এণ্ড মর‍্যাল ফিলজফির ভক্ত। ইংরেজীর ছাত্র নন। তা যাউক, অনেক ইংরেজী জানা লোকও মিথ্যা বলে, ইংরেজীতে কি করিবে? তবে উনি বলিতেন না। কারণ উনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী—মিথ্যা বলা উহাঁর পক্ষে অসম্ভব।

দেবপ্রসাদও তাহা কতকটা মানে: তাই আমি সাহস করিয়া আসিলাম। তোমরা যদি দেখা না করিতে সে ভিন্ন কথা, উনি ত মিথ্যা বলিতেন না।

অনেকটা সন্দেহ বুঝি কাটিয়া যাইতেছে ধীরে ধীরে। মহেশ দত্তও একটু স্থির হইল।

গিরীশ বলিল: দেখা তো হইল। এখন বলুন কি বলিবেন?

দেবপ্রসাদ বলিল: আমি কথা বলিতে জানি না, যাহা মনে

হয় তাহা বলি। বাড়ি বসিয়াও ত ব্রহ্ম-উপাসনা চলে। তবে কি ভাবিয়া তোমরা গৃহ ছাড়িয়া দিলে তাহা বলো। নিজে আর কি বলিব ? বরং তোমাদের কথাই শুনিতে চাই। ভাল বুঝিলে বলিবও ;— কারণ তোমাদের বাবার ব্যাকুলতা আর তোমাদের মাসীমায়ের কাতরতা, তাহাও দেখিয়াছি। ওদিকে বাড়িতে তোমাদের মা—বধূমাতা—এই সংবাদ শুনিয়া কি করিবেন, তাও বুঝিতে পারি।

গিরীশ বাধা দিয়া বলিল : বুঝিয়াছি সব। সে সব বলিয়া তবু বিশেষ ফল হইবে না। আপনার বিশ্বাস—বাড়িতে বসিয়া সব হয় ? না, তাহা হয় না, আমরা জানি। আমার জ্ঞান, আমার বুদ্ধি, আমার শক্তি, আমার আদর্শ—এই সবের জন্য চাই আমার মতানুযায়ী, ঘর-বাড়ি, কাজকর্ম, মন্দির ;—যেখানে বাধা নাই সমাজের, পরিবারের, ইষ্টি-গোষ্ঠীর। ইংরেজীর দোহাই দিতেছিলেন। জানেন ইংরেজের চরিত্র ? তাঁহারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতকে শ্রদ্ধা করে। সত্য, স্বাধীনতা, কর্তব্য-নিষ্ঠা—তাঁহাদের জীবনের আদর্শ। তাই তাঁহাদের এত উন্নতি। ইংরেজী শিখিলাম, কিন্তু তবু যত কুসংস্কার আর তেত্রিশ কোটি দেবতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে শিখিলাম না—এই মিথ্যাচার অসম্ভব আমাদের পক্ষে।

গিরীশ যেন ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা করিতেছে। বলিয়া চলিয়াছে : যাহারা সত্যের মর্যাদা দিতে জানিল না, সত্য ও তাহাদের মর্যাদা দিবে না। সুনীতির সঙ্গে যাহাদের বিবাদ, পৃথিবীতে তাহাদের পরাজয়ই অবধারিত। এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহাদের মার্জনা নাই— বিধাতার বিচারে।

চলিয়াছে ত চলিয়াছেই। দেবপ্রসাদ শুনিতেছেন। অবাক হইতে-ছেন তাহার বাকপটুতায়, তেজস্বিতায়, আত্মবিশ্বাসে। মনে মনে

তাহাকে প্রশংসাও করিতেছিলেন। না হয় আছে গিরীশের কেমন উগ্রতা; উহা তাহার তেজস্বী স্বভাবের আতিশয্য, অন্য কিছু নয়। তাহার কথায় মহেশ দত্তের মত রূঢ়তা নাই, নিঃসন্দেহ।

দেবপ্রসাদ শেষে বলিল: তোমাদের ধর্ম হইল জ্ঞান ও কর্মের বিষয়। আমাদের ধর্ম হইল আচার-বিচারের কথা। কিন্তু আচার বিচারের ভয়েই বা ঘর ছাড়িতে হইবে কেন? লেখাপড়া শিখিয়া নিজে তুমি স্বাধীন হইলে কে তোমাকে আটকাইবে? আসল কথা কি জানো—নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো চাই; স্বাবলম্বী না হইলে স্বাধীন হইবে কি করিয়া সংসারে?

গিরীশ এইবার থামিল, ও মানিল—তাহাই সে দাঁড়াইবে। তাই আর পিতার আশ্রয়ও সে চায় না।

এখনো তোমরা পড়াশুনা করিতেছ; স্বাবলম্বী হইতে হইলেও এই সময়ে একটা অবলম্বন ত চাই?—দেবপ্রসাদ বলেন।

না। গিরীশ জানে ইংরেজ মতের স্বাধীনতা খর্ব করিয়া পিতার সাহায্যও গ্রহণ করে না।

আসিল এই সময় চিন্তাহরণের পালা। সে কথা কহিল শান্তভাবে ও স্থির স্বরে, এবং বেশ নম্রভাবেও।

বিধাতা ছাড়া আর কোনো আশ্রয়ই আশ্রয় নয়। আর তাঁহার আশ্রয় লইলে সে আশ্রয় হইতে তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করেন না।

চিন্তাহরণের কণ্ঠ ক্রমে বিশ্বাস ও আশায় আর্দ্র হইল: তিনিই পরম-আশ্রয়, পরম-নিলয় মানুষের। চারিদিকে এই সূর্য-চন্দ্র-তারা, কাহাকেও তিনি আশ্রয়-চ্যুত করেন না। জীবে-জন্তুতে কোথাও তাঁহার দয়ার অন্ত নাই। কিন্তু মানুষই তাঁহার প্রিয়তম। মানুষেরই প্রাণের মধ্যে

তিনি তাই আসিয়া আপন আসন পাতিয়াছেন। আমার অন্তরের মধ্যেই আছে সেই পরম আশ্রয়। বাহিরে কোথাও নাই।

বক্তৃতা নয়, বিশ্বাসে আর ভক্তিরসে কথা আপ্লুত। যেই চিন্তাহরণ কাব্য পড়িত, কেমন স্বপ্নে কল্পনায় সেই কৈশোর বয়সেই আবিষ্ট হইত, সেই চিন্তাহরণ বুঝি এখন ভাবুকতায়, ভক্তিতে অভিষিক্ত-চিত্ত মানুষটি হইয়া উঠিতেছে—এই বয়সে। এখনো ত সে কুড়িতে পা দেয় নাই। তবু যেন সুস্থির যৌবনের সংযত, সংহত পুরুষ। এই ভগবদ-বিশ্বাস, এই ভক্তিস্নিগ্ধতা—ইহা দেবপ্রসাদের স্বভাবগত নয়, কিন্তু ইহা সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। তথাপি তাঁহার সংশয় জাগে,—মনে পড়ে বনমালী চাটুজ্জের কথা, চিন্তাহরণকে তাঁহার উৎসাহ দান। সেও যে আশা করিয়াছিল চিন্তাহরণ কবি হইবে, সাহিত্যিক হইবে—মধুসূদনের মত এই ভাব-গঙ্গায় এই পূর্ব দেশ হইতে বঙ্গভূমিকে পরিপ্লুত, পবিত্র করিয়া তুলিবে।

দেবপ্রসাদ একবার জিজ্ঞাসা করিল: চিন্তাহরণ, তুমি আর পদ্য এখন লেখ' না?

চিন্তাহরণ হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে বিমূঢ় হইল। তারপর লজ্জা পাইল। চক্ষু আনত করিল। গিরীশই উত্তর দিল: লেখেন। অমনি আবৃত্তিও করিল:

নিয়মে বাতাস বহে, নিয়মে আকাশ রহে
গ্রহ তারা দীপভরা সাজে।
প্রেমের অমিয় রাশি নিত্য উঠে পরকাশি
মানুষের অন্তরের মাঝে।
সেখানে আনন্দে রবি আঁকিছে বর্ণের ছবি,
ভাতিছে জ্ঞানের গ্রহতারা,

সেখানে সত্যের আশা মিটায় অনন্ত তৃষা
প্রেমেতে মিলিছে ভক্তিধারা।

এক মুহূর্তের জন্য দেবপ্রসাদও সব ভুলিয়া যায়। জিজ্ঞাসা করিতে চাহে—মাইকেল কি কিছু লিখিয়াছেন নূতন কাব্য?—'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর 'পরে? তোমরা 'কপালকুণ্ডলা' পড়িয়াছ?—কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয় না। চিন্তাহরণ তৎপূর্বেই সলজ্জভাবে বলে: মিল দিতে পারি, তাই পদ্য লিখি। কিন্তু তাহা যেন শব্দ লইয়া খেলা করা। ভাষায় বলিতে পারি না—যে কথা বলিতে চাই। ভাবের ঘরে চুরি করা চলে না। তাই সর্বাগ্রে সত্যকে আশ্রয় করিতে চাই।

মূল কথাটার সে ফিরিয়া আসিয়াছে। দেবপ্রসাদ অবশ্য তাহা কখনো একবারে ভুলিয়া যায় নাই। সেও নিজের আসল কথায় আসিল:

আমি তোমাদের বুঝাইতে পারিব না। তবে বলিতে পারি—সবই ত তোমাদের গৃহে সম্ভব। তাহা ছাড়া, বাপ-মা, ভাই-বোন, সমাজ-সংসার সকলের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া মানুষ নিজেও কি স্বস্তি পায়?

যুক্তি প্রয়োগ আরম্ভ হইল। গিরীশ প্রবলভাবে আপনার মত প্রকাশ করে—মহেশও তাহাতে যোগ দেয়: কুসংস্কারের মধ্যে, মিথ্যার মধ্যে যে স্বস্তি, সে স্বস্তি ত মৃত্যুরই সমতুল্য। মনুষ্য জীবন কৃমিকীটের জীবন নয়। জ্ঞানে কর্মে সত্যে তাহা জাগ্রত হয়।

চিন্তাহরণ বলিয়া গেল: মিথ্যার মধ্যে স্বস্তি নাই। সত্যেই শান্তি, সত্যেই মুক্তি, সত্যেই অমৃত। মায়া-মমতায় অন্ধ না হইয়া প্রিয়জনের জন্যও সত্য-দৃষ্টি কামনা—ইহাই আসল স্নেহ মমতা ভক্তি।

মীমাংসা হইল না॥ হইবে না, দেবপ্রসাদ তাহা জানিত। গিরীশ

তাই দাঁড়াইয়াও উঠিয়াছে। দেবপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল: তোমরা তবে আমাদের ত্যাগ করিবে?

মনঃস্থির করাই ছিল। দুই জনে জানাইল: আপনারা হিন্দুরাই আমাদের ত্যাগ করেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলে বাড়ি হইতে দূর করিয়া দেন, দেশ-গাঁ হইতে তাড়ান।

এই কথারও উত্তর আছে—তুমি আমাদের সমাজ ছাড়িলে, আমাদের ধর্ম ছাড়িলে আমাদের কেহ রহিবে কি করিয়া? কিন্তু দেবপ্রসাদ তাহা বলিতে চাহে না। সে বলিল: তোমাদের মা নন্দীগ্রামে। কি বলিব তোমার মাসীমাকে এখানে?

গিরীশ বলিল: প্রণাম দিবেন। তিনি আমাদের ভুলিবেন না। আমরাও তাঁহাকে ভুলিব না। মাকেও তাহাই জানাইবেন।

মহেশ দত্তের মুখে কেমন হাসি ফুটিল। হাসি গোপন করিতে সে আগাইয়া গেল—দেবপ্রসাদ সেই পুরানা প্যাঁচ দিতেছে—মা, মাসীমা।

সেই শেষ কথা, বলিবে কি? দেবপ্রসাদ স্থির করিতে পারিতেছে না। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল—সে গুরুজন, এই প্রশ্ন এই বয়সে ও সম্পর্কে কনিষ্ঠদের নিকট পাড়িবে কি? দেবপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই পদ অগ্রসরও হইল, তারপর আবার দাঁড়াইল—না, সে বলিয়া ফেলিবে। এই বুঝাপড়া করিতেই হইবে।

একটা কথা, শেষ কথাও। চিন্তাহরণ বিবাহিত; বধূমাতা এখনো বালিকা। বধূমাতার কি হইবে?—দেবপ্রসাদ বলিল।

এই প্রশ্নটাও যেন জানা ছিল। গিরীশই তাই মুচকি হাসিয়া উত্তর দিল: এগার বছরের একটি মেয়েকে ধরিয়া গলায় বাঁধিয়া দিয়াছেন। সেই মেয়ের বয়সটা কি যে, বুঝিবে বিবাহের?

চিন্তাহরণ কিন্তু মুখ অবনত করিয়া রহিয়াছে। দেবপ্রসাদ বলিল : তোমরা ত বোঝ। তোমরা ত মান বিবাহ—বিবাহ।

হাঁ। সেও বুঝিয়া নিজের মত যাহা স্থির করিবার করিবে। তাহার পূর্বে কথাই উঠে না,—কোনো সম্পর্কও সত্য নয়।

দেবপ্রসাদ চিন্তাহরণের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। সে কি নিজ মুখে একটা কথাও বলিবে না? শুধু গিরীশের জবানীতেই এই কথাও বলিবে—এইরূপেই তবে তাহাদের স্বাধীনতার ধারণা?

মহেশ মুখ ফিরাইয়া অপেক্ষা করিতেছে—দেবপ্রসাদের 'শেষ কথা' কি এখনো ফুরাইবে না? লোকটা কম ধূর্ত নয়।

চিন্তাহরণ?—উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ডাকিল দেবপ্রসাদ। কিছু বলিবে না তুমি, চিন্তাহরণ?

চিন্তাহরণ মুখ তুলিল। সেই মুখে দৃঢ়তা, কিন্তু বেদনাও কি বিন্দু-মাত্র নাই? মৃদু, স্পষ্ট কণ্ঠে চিন্তাহরণ বলিল : জোর করিব কি করিয়া? কিন্তু পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব—সত্য পথ যেন মিলে।

শেষ হইয়া গেল 'শেষ কথা'। দেবপ্রসাদ বিষণ্ন মনে পথে বাহির হইল। গৃহে ফিরিবে কি? না। সে বুড়ীগঙ্গার দিকে চলিল। সেও সন্তানের পিতা—এমন হইলে সে কি করিয়া সহিত এই বিচ্ছেদ? মা-বাপ স্ত্রী—তাহাদের স্নেহ-মমতা কি মিথ্যা? কতখানি সত্য তবে বিধাতা নিরাকার পরমব্রহ্ম রূপে?

চিত্রিসারে ফিরিবার পূর্বেই দেবপ্রসাদ জানিল—চিন্তাহরণ ও গিরীশ ঢাকা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আর ততক্ষণে চিত্রিসার হইতেও সংবাদ আসিল—রাজীব মাতুলালয়ে যায় নাই।

৩

রাজীবের সঙ্গে প্রায় সাত আট বৎসরের বন্ধুত্ব চিন্তাহরণদা' ও গিরীশের,—পাঁচ বৎসর এক সঙ্গে পড়াশুনা, এক গৃহে বসবাস।

মধ্যমগ্রামের ইংরেজী স্কুলে রাজীব প্রথম বৎসর দুই ইংরেজী পড়িয়াছিল; তারপর সে দেবপ্রসাদকে ধরিল—শহরে পড়িবে।

বাড়ির ছেলেদের মধ্যে রাজীবেরই মানুষ হইবার কথা। তাহার সহোদর রাঘব তাহার অপেক্ষা বৎসর চারেকের বড়। কিন্তু সে দর্পিত ও উদ্ধত প্রকৃতি। লেখাপড়াও করে না। অনন্ত তাহাদের জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা, সকলের বড়। কিন্তু সে সরল, নির্বোধ, গোঁয়ার। মাছ ধরা, লাঠি খেলা, বাচ খেলা লইয়াই সে মাতিয়া রহিল। আশ্চর্য ব্যাপার, চৌধুরী বাড়িতে সে প্রায় নিরক্ষর! রাজীব কিন্তু আশৈশব ছিল সুস্থ, সাধারণ বুদ্ধিতে সজীব, উদ্যোগী। ক্রমেই তাহার পড়াশুনায় উৎসাহ বাড়িল; আর তাহা দেখিয়াই যেন তাহার উপর মেজদাদা রাঘবের আক্রোশ বাড়িয়া গেল। বুদ্ধির ও বিদ্যার খ্যাতি অর্জন করিয়া রাজীব বাড়িতে ও গ্রামে সকলের নিকট রাঘবকেই ছোট করিতেছে, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঠিক সেই কারণেই অনন্ত হইল রাজীবের পৃষ্ঠপোষক—তাহার খেলাধুলায় গুরু। মধ্যমগ্রামের মধ্য ইংরেজি স্কুলের রাজীব ভালো ছাত্র। তাহার নিজের মনে এইটিই প্রধান গর্ব।

রাজীবের সেই গর্বে আঘাত লাগিল চিন্তাহরণ ও গিরীশ এই দুই ভাইকে দেখিয়া।

'চৌধুরী খুড়ার' সহিত ছুটিতে তাহারা আসিয়াছিল চিত্রিদারের

কুটুম্ব গৃহে। শহরে তাহারা ইংরেজী পড়ে। দেবপ্রসাদ শহরে তাহাদের বাটিতে থাকে, তাহাদের শিক্ষার তদারক করে সে-ই।

চিত্রিসারের গ্রামের লোকেরা দল বাঁধিয়া চিন্তাহরণ ও গিরীশকে দেখিতে আসে। একে নন্দীগ্রামের গাঙ্গুলী মহাশয়ের ছেলে—যে পীতাম্বর গাঙ্গুলী শহরে 'বিধবা-বিবাহের দলে' যোগ দিয়া গ্রামের সমাজে তুমুল সোরগোল বাধাইয়া দিয়াছেন। এখনো লোকে সেই সব ছড়া ভুলিয়া যায় নাই। তাহাতে আবার ইংরেজি স্কুলে পড়ে তাহারা। সকলে আশ্চর্য হয় তাহাদের সভ্যতায়, ভব্যতায়, সপ্রতিভ ব্যবহারে।

'বড় মা' পর্যন্ত বলেন: হইবে না। কোন্ বাড়ির ছেলে?—তাঁহার পিত্রালয়ের সঙ্গে যে গাঙ্গুলীদের কুটুম্বিতা নিকটতর, তাহাও তিনি বিস্মৃত হন না।—তাঁহারই এক মামাত বোন ছিলেন গাঙ্গুলী মহাশয়ের মাতা। অতএব, ইহারা সভ্য হইবে বৈ কি।

রাঘব বক্রদৃষ্টিতে ছেলে দুইটাকে দেখিয়া যায়—কাছেও ঘেঁসে না।

অনন্ত তাচ্ছিল্যভরে ছেলে দুইটাকে দেখিয়া বলে: নৌকা বাহিতে জানো? জানো না; তবে জানো কি? যাও, শিখো গিয়া রাজীবের নিকটে।—তিনি অবশ্য রাজীবেরও ওস্তাদ, তাহাও ইহারা বুঝুক।

রাজীবও ক্ষুণ্ণ বোধ করিতেছিল। সকলে উহাদেরই প্রশংসায় মুখর; রাজীব যেন বাড়িতে নাই। কিন্তু চিন্তাহরণ ও গিরীশ তাহাকে দূরে সরিয়া থাকিবার অবকাশ দিল না। বয়সেও তাহারা কাছাকাছি। তাহার সহিত আপনা হইতে ভাব করিয়া ফেলিল। এমন কি, রাজীবের অনুগত বলিয়া তাহার পাঁচ বৎসরের পিসতুত বোন শৈলীটা পর্যন্ত উহাদের সঙ্গ লাভ করিল। চিন্তাহরণ ও গিরীশেরও রাজীবের উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা—এমন বৈঠা বাহিতে, লগি ঠেলিতে তাহারা পারে না। রাজীবের এই বিষয়ে গুরু 'ভালো দাদা' অনন্ত। দুই ভাই তাই রাজীবকে সহায়

করিয়া নদীর ঘাটে নৌকা লইয়া বাহির হয়। কোমরে কাপড় বাঁধিয়া তাহারাও খালে লগি বাহে। এক-আধ দিন শৈলীও সঙ্গে থাকে।

মেয়েটার মুখে খৈ ফুটে। সঙ্গে না লইলে রাগ করিবে, চটিয়া হাত তালি দিয়া স্বর করিয়া ডাকিবে মেঘের দেবতাকে।

'দেওয়ার মালো মেঘরাণী,
খাড়া ধুইয়া ফেলা পানি।
মেঘের উপর পুন্নিমার চাঁদ,
ঝপ্ ঝপাইয়া বিষ্টি নাম।"

তারপর কাঁদিয়া ফেলিবে। চিন্তাহরণ ও গিরীশ বলিবে: লইয়া চলো, রাজীব।—শৈলীও নৌকায় উঠিয়া বসে ভরসা পাইতেই।

জোয়ারের টানে নৌকা সেদিন ভাসিয়া চলিল। রাজীবের কেমন একটু বেগ পাইতে হইতেছিল; শৈলী খুব খুশী। কিন্তু শৈলীই প্রথম ভয় পাইল: দাদাভাই, ফিরিয়া চলো। রাজীবও তাহাই ভাবিতেছিল। শৈলীর কথায় তাহার সেই সুযোগ হইল।

কিন্তু গিরীশ জোয়ারের জোর দেখিয়াই উল্লসিত। ব'লিল: যাউক না। শৈলীর খুব বুঝি ভয় করিতেছে? তুমিও ডরাইতেছ বুঝি, রাজীব?

ডর? রাজীবের অহঙ্কারে লাগিল। সে জোয়ারকে ডরায়?—নৌকাও দূরে চলিল। খানিক পরে চিন্তাহরণই জোর দিয়া বলিল: না, এবার নৌকা ফিরাও।—কিন্তু তখন আর ফিরা সহজ হয় না।

এদিকে সন্ধ্যা হইতেছে। চৌধুরী বাড়িতে খোঁজ পড়িল। দীঘির ধারে খেলার মাঠেও ছেলেরা নাই। শৈলীই বা কোথায়? ছোট চৌধুরীর সে কি ছুটাছুটি। প্রতিবেশীদের একটি ছেলে জানাইল— উহারা নৌকা লইয়া গাঙে বাহির হইয়াছে।

এবার অনন্তের ডাক পড়িল—খোঁজ কর।—কেন ? পড়াশুনায় আর কুলাইল না বুঝি ?—অনন্ত শুনাইল সকলকে। সে জেলেপাড়ায় চলিল। জেলেদের সঙ্গে ডিঙি লইয়া বাহির হইবে,—সে ছাড়া আর কে তাহা পারিত ? বুঝিবে এখন সকলে কথাটা।

রাত্রি বাড়ে। সবাই বাড়িতে উৎকণ্ঠিত। শেষে রাত্রি প্রায় তিন দণ্ডের পরে সকলকে লইয়া অনন্ত ফিরে। খালি গায়ে অত রাত্রি পর্যন্ত 'বৈশার ট্যাকের' আড়ালে নৌকা বাঁধিয়া কাটাইয়াছে তাহারা। শৈলী ভয়ে মৃতপ্রায়, ঠাণ্ডায় কাঁপিতেছিল, চিন্তাহরণ ধুতির খোঁটে জড়াইয়া তাহাকে ঘিরিয়া রাখে। ভাঁটা পড়িলে একটু একটু করিয়া তাহারা বৈঠা বাহিয়া ফিরিতে থাকে। কিন্তু বাতাসের প্রবল বেগ, ঢেউ-এরও তেমনি ক্রোধ। তথাপি প্রায় বামুনঘাটের ধারে যখন আসিয়া গিয়াছে, এমন সময় ভালো দাদার গলা শোনা গেল নদীর বক্ষে—'রা-জী-ব রে, রা-জীব।'

বাড়িতে সকলে রাজীবের উপর রাগিয়া গেল। বড় মা ত আগুন : তুমিই উহাদের তাল দিয়াছ। উহারা নন্দীগ্রামের গাঙুলী। এইরূপ জালিয়া-মালোর বুদ্ধি উহাদের না হইলে হইত না—নৌকা বাহিতে হইবে গাঙে।

শৈলীকে চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল তাহার মা। মেয়ে হইয়া এত সাহস কেন ?

রাজীবের মর্যাদায় লগিয়াছিল। গুম হইয়া গিয়া সে শুইয়া পড়িল। জানাইল, তাহার ক্ষুধা নাই, আজ সে খাইবে না।

গিরীশ আসিয়া বলিল : ওঠো রাজীব। খাইতে ডাকিতেছেন ছোট মা' (মহেশ্বরী)।—কিন্তু না, রাজীবের ক্ষুধা নাই।

চিন্তাহরণ বুঝিল, বলিল : আমাদের জন্যই তোমাকে মিছামিছি

এত তিরস্কার করিলেন সকলে। তোমার ত কোনো দোষ নাই।

রাজীব কথা বলিল না। মনে মনে ভাবিল—তখন কেন এই কথা মুখ ফুটিয়া কহিল না। খুব সভ্য সাজিয়া গেল দুই ভাই। এখন ভালো মানুষি করিতেছে।

ইহা বুঝিয়াই চিন্তাহরণ আবার বলিল: আমি চৌধুরী খুড়াকে সব বলিলাম। তিনি বলিলেন—'বড় মায়ের কথায় কি রাগ করিতে আছে? উহারা ভয় পাইয়াছিলেন, ঐ রকম একটু রাগ করিবেনইত।'

রাজীব কথা বলিল: তাই বলিয়া যত দোষ সব কেবল আমাকে দিবেন? আমি কি ফিরিতে চাহি নাই?

চিন্তাহরণ জানাইল: তোমার ত দোষ একটুও নাই, আমরাই জিদ করিযাছি—আগে চলো। আমাদের তুমি ক্ষমা করো, রাজীব।—বলিয়া রাজীবের হাত ধরিল চিন্তাহরণ।

কোথা দিয়া রাজীবের সমস্ত ক্ষোভ মিলাইয়া গেল। আরও একবার তবু বলিল - আমার ক্ষুধা নাই।—তারপর একসঙ্গে আহার চলিল তিনজনা।

পরদিনই আবার নৌকা লইয়া বাহির হইল এই দস্যুর দল! অবশ্য সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিল, আর সেইদিন কেহ তাহা জানিলও না।

এইরূপ গোপন অভিযানে এই ক'টি প্রাণী পরস্পর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

নৌকা বাহিতে, ডাংগুলিতে যতই হউক রাজীবের জয়, চিন্তাহরণ ও গিরীশ ইস্কুলের গল্প করে কথায় কথায়। তাহাদের ইস্কুল একটা 'অট্টালিকা'; সঙ্গেই কলেজ। সেখানে ইংরেজী পড়ায় সাহেবরা।

মধ্যমগ্রামের ভালো ছাত্র রাজীব এইবার স্বপ্ন দেখে। চোখে ভাসিয়া উঠে একটা নূতন অজানা অদ্ভুত পৃথিবী, সেই সব ইংরেজী স্কুল ও কলেজ, ছাত্র, মাষ্টার সাহেব।

সত্যই, চিন্তাহরণ ও গিরীশ জানেও কত! রাজীব জানিত—পুঁথি-পত্র সে-ই ভালো পড়িতে পারে। সত্য নারায়ণের পাঁচালি পড়িবার জন্য তাহারই ডাক পড়ে সমস্ত পাড়ায়। দেবপ্রসাদ যখনই শহর হইতে গৃহে ফিরে নূতন ছাপা বই দুই একখানা সঙ্গে আনায়ন করে। আর বাড়িতেই তোরঙ্গে কুলুঙ্গিতে তাহা তুলিয়া রাখিতে দেয় মহেশ্বরীকে। মহেশ্বরী তাহা ঝাড়ে, পোঁছে, রাজীবও তাহার সঙ্গে জোটে। দুইজনে আবার বাছিয়া সাজাইয়া রাখে। মাঝে মাঝে শ্রীরামপুরের মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত লইয়া মহেশ্বরী পড়িতেও বসে। সে বুড়োচার জ্যোতিরত্নদের কন্যা, বাড়িতে চতুষ্পাঠী আছে; সেই বাড়িতে মেয়েরা বউরাও জানেন লিখিতে পড়িতে। কখনো তাই মহেশ্বরী নাড়াচাড়া করে বাঙলা 'কাদম্বরী' লইয়া, 'শকুন্তলা' লইয়া। এইগুলিও তাহার অপরিচিত নাম নয়। গোপনে কখনো সে খুলিয়া বসে—রাজীবদের পঠিত 'বোধোদয়', 'চারুপাঠ', যেন পরীক্ষা ছলেই তারপর এক সময় রাজীবকে জিজ্ঞাসা করে: ও রাজীব বলো ত 'পরভুজ' কাহাকে বলে?

পরভুজ কাহাকে বলে?—রাজীব অমনি 'চারুপাঠ' মুখস্ত বলিতে শুরু করে; পরভুজের ব্যাখ্যায় মুখরিত হইয়া উঠে। মহেশ্বরী হাসিমুখে শোনে, শুনিতে শুনিতে আবার জমিয়া যায় রাজীবের কথায়। রাজীব 'ছোট মায়ের' আদরের। সেই সূত্রেই 'ছোট খুড়ার' বইপত্র সাজাইয়া গুছাইরা তুলিয়া রাখিবার দায়িত্ব লইত নিজেই। আর তুলিতে গিয়া পড়িতে বসিত, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি,' 'বাঙ্গালার ইতিহাস'; আবিষ্কার করিত

কখনো নূতন বই। বুঝিয়া না বুঝিয়া এক ডাকে পড়িয়া ফেলিত 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বা 'রাসেলাস'।

'পদ্মিনী উপাখ্যান ?'—চিন্তাহরণ আবৃত্তি করিত। কিন্তু আশ্চর্য ! রাজীব ত একা একা উহার মর্ম গ্রহণ ও করিতে পারে নাই।

চিন্তাহরণ বলে : চৌধুরী খুড়াই ত আমাদের ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। না হইলে আমরাই কি পারিতাম বুঝিতে ? তুমি বোঝ এই কথার অর্থ ?

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল পায় কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায় ?"

জানো কাহাদের কথা ইহা ? 'ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য।' রাজীব শোনে—কেমন করিয়া মনে পড়ে ক্ষত্রিয় রাজার নয়, ব্রাহ্মণ ওঝাজীর কণ্ঠ।

গিরীশ ততক্ষণে আর একটা বই টানিয়া বাহির করিয়াছে—'রাসেলাস'।

রাসেলাস ?—গিরিশ জানায়—ইংরেজী গল্প। মূল গল্প ইংরাজীতে। অবশ্য তাহারা ততটা ইংরেজী এখোনো শিখে নাই। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই তাহারাও পড়িবে রয়্যাল টেলস্ আর হয়ত তারপর ল্যাম্বস্ টেলস্ ফ্রম্ শেক্‌স্‌পীয়র।

শেক্‌স্‌পীয়র কে ? তাহার নাম শোনো নাই ? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখক—অবশ্যই ইংরেজ। ইংরেজ না হইলে কে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে আর ? তাই ত ইংরেজী না শিখিলে কিছুই শিখা হয় না।

মধ্যমগ্রামের ভালো ছাত্র রাজীবকে স্বপ্নে পাইয়া বসে।

রাজীবের মনের কথা চিন্তাহরণই বলে : তুমিও শহরে চলো না, রাজীব ? ইংরেজী পড়িবে ! গিরীশের বেশ লাগিল কথাটা। সোৎসাহে

বলিল : বেশ হয় কিন্তু তাহা হইলে।—অবশ্য তোমাদের এই মধ্যম গ্রামের পড়ায় সেখানে চলিবে না। তোমার প্রথম-প্রথম ক্লাসে কষ্ট হইবে।

রাজীবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নন্দীগ্রামে ফিরিবার মুখে চিন্তাহরণ দেবপ্রসাদকে ধরিল : রাজীবকে আপনার সঙ্গে শহরে লইয়া আসুন না? সে ইংরেজি পড়িতে এত ব্যগ্র।

দেবপ্রসাদের মনে হঠাৎ সপুলক আনন্দের এইটা চমক জাগে। দেখিল রাজীব দুয়ারের অন্তরালে উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছে।

সত্য নাকি রাজীব? এদিকে আয়। থাকিতে পারবি ত?

রাজীব মুখচোরা ছেলে নয়। ডাকিতেই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অবশ্য একটু লজ্জা বোধ করিতেছিল। কিন্তু মাথাটা নাড়িয়া বলিল : হঁা।

তারপর বাড়ি ছাড়িয়া থাকিলে সেখানে কাঁদিবি না ত?

রাজীব হাসিয়া ফেলিল : কাঁদিব কেন?

চিন্তাহরণ জানায় : ওখানেও ত 'মাসী মা' আছেন। ভয় কি?

দেবপ্রসাদ তাহা জানে। সত্য, চিন্তাহরণের মাসী মা গাঙ্গুলী মহাশয়ের ঢাকার বাসাবাড়িতে থাকেন—রাজীবের সেখানে সঙ্গীর অভাব হইবে না, স্নেহও পাইবে মাসীমায়ের কাছে।

সেদিন দেবপ্রসাদের বড় আনন্দের দিন। তবু সবিষাদ হৃদয়েই পুরাতন দিন সে স্মরণ করে। এইরূপ স্বপ্নই বক্ষে ধারণ করিয়া বৎসর পনের পূর্বে তাহার প্রথম জীবনে দেবপ্রসাদ এমনিতর আবেদন জানাইয়াছিল অগ্রজদের নিকট। কিন্তু কেহই তাহাকে উৎসাহ দেয় নাই

—দেবপ্রসাদ ইংরেজী শিখিতে পারে নাই। এখন সামান্য কিছু-কিছু শিখিয়াছে—এই কয় বৎসরে ঢাকার শিক্ষকদের সঙ্গে মিশিয়া ও নিজের চেষ্টায়।

কিন্তু সেবারেও রাজীবের সুযোগ হইল না;—বাড়ির কর্তাদেরও তাহার মাতুল ন্যায়রত্নের অনুমোদন প্রয়োজন।

মাস কয় পরে দেবপ্রসাদ গৃহে আসিল; দেবতার নিকট অনেক মানত করিয়া অবশেষে মহেশ্বরী প্রথম সন্তান-লাভ করিয়াছে। পুত্রমুখ সন্দর্শন করিতে দেবপ্রসাদ গৃহে আসিয়াছে। রাজীবকেও এবার নিজের সঙ্গে লইয়া যাইবে, কর্তাদের অনুমতি সে সংগ্রহ করিয়ছে। ইংরেজি না শিখিলে কেহ আর ভালো চাকরি পাইবে না, ন্যায়রত্নও তাহা বলিয়াছেন। অর্থার্জন প্রয়োজন।

মহেশ্বরীর তখন আনন্দের সীমা নাই। মাতৃ-ক্রোড়ে শায়িত সেই নবজাত পুত্রকে দেখিতে দেখিতে দেবপ্রসাদেরও অন্তর ভরিয়া উঠে। আবার মনে পড়িয়া যায় নিজের কথা, রাজীবের কথা, আরও দূরের আগামী দিনের স্বপ্ন। নিজে সে যাহা পারে নাই, তাহাই ইহারা সম্পূর্ণ করিবে;—নিশ্চয়ই করিবে।

বিদায়ের কাল আসিল। রাজীব সকলের আশীর্বাদ লইয়া প্রণাম করিয়া একটু অধীর ভাবেই অপেক্ষা করিতেছে। শিশুমুখ দেখিতে দেখিতে মুখচোরা দেবপ্রসাদও একবার বলিয়া ফেলে পত্নীকে: এবার রাজীবের দিন, তাহার পরেই ইহারও পালা। তখন রাজীবই লইয়া যাইবে ইহাকে স্কুলে ভরতি করিতে।—দেবপ্রসাদ রাজীবকে বলে: কেমন?

মুখ ফিরাইয়া তাকাইল সে রাজীবের দিকে। দেবপ্রসাদের মুখে এইরূপ কথা অপ্রত্যাশিত। রাজীব বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকে।

কিন্তু একবার ছিদ্রপথ পাইয়া আরও অপ্রত্যাশিত কথাও বাহির হইয়া আসে : দিন আসিতেছে। কত লোককে ইহারাও পড়াইবে, শুনাইবে, মানুষ করিবে। দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে—জাতির দুঃখ ঘুচিবে—

রাজীবের বিস্ময় কাটিয়া যাইতেছে। ইহা যে তাহারই মনের কথা! একটু লজ্জাবোধ করিতেছিল সে। কিন্তু একটা সগর্ব শিহরণ বুকের মধ্যে জাগিতেছে। যেন কোন্ একটা মহৎ পণ করিতেছে সেও—'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে, কে বাঁচিতে চায়?'

সত্যের সন্ধানে সাহসে ভর করিয়া স্বাধীন হৃদয়ে রাজীব আজ পাঁচ বৎসর পরে অজ্ঞাত পৃথিবীতে পা বাড়াইতেছে। প্রত্যূষের আভাস এখন বুড়ী গঙ্গার ওপারে। এত বৎসর পরেও আজ রাজীবের মনে পড়িল সেই পণ, দেবপ্রসাদের আকাঙ্ক্ষা, আর মনে পড়িল আর-এক দুর্জয় সাহসী ব্রাহ্মণকে। দীর্ঘপদে সেই বলিষ্ঠ মূর্তি যেন চলিয়াছে এখনো রাজীবের সম্মুখের সীমারেখাস্থিত উদয়সূর্যের দিকে, মুখে মন্ত্র 'শিবোহম্ শিবোহম্।'

৪

ওঝাজীকে ভুলিবার উপায় ছিল না।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ গৌরকান্তি ব্রাহ্মণ। শঙ্কর দীঘির ভাঙা পাড় দিয়া রাজীব তাহাকে আসিতে দেখিয়াছিল। একবারমাত্র চোখ পড়িয়াছিল। কিন্তু ডাংগুলিতে রাজীব তখন পিটিতেছে; অন্য দিকে তাকাইবার অবসর কোথায়?

চৌধুরীবাবুদের বাড়ি কোন্‌টা ?

রাজীবকেই জিজ্ঞাসা করিতেছিল হিন্দুস্থানী টানে সেই অপরিচিত মানুষটি। হয়ত রাজীবকেই সে ছেলেদের মধ্যে প্রধান বলিয়া বুঝিয়াছিল। সুস্থ শ্যামবর্ণ বালক, বালক হইলেও বৈশিষ্ট্য তাহার পরিস্ফুট। রাজীব মুখ তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ গৌরকান্তি পুরুষ; বক্ষে উপবীত লম্বমান; প্রকাণ্ড লাঠি কাঁধে, সামান্য একটি পুঁটলি তাহার অগ্রভাগে ঝুলিতেছে। পশ্চিমা ব্রাহ্মণ নিঃসন্দেহ।

রাজীব দেখাইয়া দিল: ওই যে সম্মুখে।

তাহার কৌতূহলও হইতেছিল। আষাঢ়ের শেষ; এই রৌদ্রে কোথা হইতে আসিলে এই বিদেশীয় ব্রাহ্মণ? সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জল গৌরবর্ণ তেজস্বী মূর্তি। কিন্তু বেশ-বাস ধূলি-ধূসরিত; পরিশ্রান্ত পথক্লান্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই! তেজোব্যঞ্জক মুখের উপর রৌদ্র-জল ধূলি-বাতাসের অবারিত আক্রমণে একটা কঠিন কর্কশতার ছাপও অঙ্কিত। উজ্জল দৃষ্টিতে একটা অস্থির দীপ্তি।

দেবপ্রসাদবাবু বাড়ি আসিয়াছেন না?

রাজীব তখনো তাহাকে দেখিতেছিল. খুল্লতাতের নাম শুনিয়া আরও আকৃষ্ট হইল। বলিল: হাঁ।

ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত বোধ করিলেন কি? যেন মনে-মনে কি স্থির করিলেন। মুখ ফিরাইয়া দৃঢ়পদে চৌধুরীগৃহের দিকে তিনি অগ্রসর হইয়া গেলেন।

ঋজু বলিষ্ঠ দেহ ইস্পাতের মত চলিয়াছে। পদক্ষেপ ত নয়, যেন পৃথিবীতে আপনার অস্তিত্ব-স্থাপনা, বিশ্বাস-ঘোষণা।

নীলমাধবের অঙ্গনে মহেশ্বরী আত্মবিস্মৃত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আসন পাতিয়াছে, সম্মুখে কালো কষ্টিপাথরে ফলমূলে সাজাইয়া

রাখিয়াছে। অন্য কোণে রন্ধনের আয়োজনও হইয়া আছে। কিন্তু উত্তরের নয়া অতিথিগৃহে দেবপ্রসাদ চৌধুরী সেই যে বিদেশীয় অতিথির সহিত কথা বলিতেছেন তাহা আর শেষ হয় না। মহেশ্বরী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শোনে সেই অপরিচিত সবল কণ্ঠ। কি বলিতেছেন লোকটি তাহা বুঝা যায় না—বিদেশীয় লোকের ভাষা ও উচ্চারণ রীতি অপরিচিত। ভাষা শুনিলেও সম্ভবত মহেশ্বরী কথার বিষয় কি বুঝিতে পারিত না,—কি জানে সে ইঁহাদের দেশ-বিদেশের বিষয়-ব্যাপার? কিন্তু কি প্রবল ও প্রদীপ্ত কণ্ঠস্বর! ঠিক যেন দেবপ্রসাদের বিপরীত। দেবপ্রসাদ মিতভাষী, কুণ্ঠায় সংকোচে বেশি কথা কহিতে চাহে না। একান্তে বসিয়া পড়িতে পারিলেই খুশী। আর এই অপরিচিত কণ্ঠে প্রত্যেক শব্দই যেন যুদ্ধ ঘোষণা। সত্যই, 'কথা নয় ত, যেন মরিতে আসে।' উগ্র, উত্তপ্ত হইয়া উঠেন কেন বক্তা এত বারেবারে? মহেশ্বরী কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়াছিল, উৎকর্ণ হইয়া কথা শুনিতে লাগিল। আপনারই অজ্ঞাতে তাহার দৃষ্টি ক্রমশ উদ্বিগ্ন, চিন্তাকুল হইয়া উঠিতেছে। এমনি সময় চমকিয়া দেখিল সম্মুখে রাজীব,—খেলা শেষ হইয়াছে বুঝি তাহাদের।

মহেশ্বরী সচেতন হইল, বলিল: অভুক্ত ব্রাহ্মণ! বিশ্রামও করেন নাই এখনো। –বলিয়া দেবপ্রসাদকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য রাজীবকে ঐদিকে পাঠাইল।

মন্দিরের দ্বারান্তরালে নিজে মহেশ্বরী অপেক্ষা করিতে লাগিল। কি বুঝিয়াছে, কি বুঝতে পারে নাই, তাহা সে জানে না। তেজস্বী ব্রাহ্মণকে একবার অন্তরাল হইতে দেখিয়াছে। স্নানান্তে ঘাট হইতে তিনি তখন উঠিতেছেন। বিস্ময় হয়, শ্রদ্ধা হয়, অথচ কেমন ভয়ও করে। কথায় যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, ক্রোধে ক্ষোভে যেন বুক জ্বলিতেছে। এত তেজ, এত দীপ্তি আর এত উগ্রতা—

লোকটা যেন কি জ্বালায় ফাটিয়া পড়িতেছেন! মহেশ্বরীর ভয় হয়।—মহেশ্বরীর ভয় বড় বেশি। বিশ বৎসরের জীবনে একটি মানুষকেই সহজভাবে সে চিনিয়াছে—তিনি স্বামী দেবপ্রসাদ, সেখানেই সে যেন নির্ভয়। অথচ তাহার জন্যই মহেশ্বরীর আবার যত ভয়।

রাজীবকে দেখিয়াও যেন দেখে না সেই ব্রাহ্মণ,—যদিও রাজীব তাহার মুখামুখি দাঁড়াইয়া আছে। ছোট কর্তাই অবশেষ দেখিলেন। অবস্থা বুঝিলেন। নিজেই তখন অতিথিকে ফলমূল গ্রহণের কথা বলিলেন।

ওঝাজীর কণ্ঠ শোনা গেল, একবার অনেকটা স্বাভাবিক কণ্ঠ। পরক্ষণেই আবার তাহা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে: চৌধুরীবাবু, আপনি বিদ্বান্ লোক, ধার্মিক লোক। হিন্দুস্থানে ম্লেচ্ছরা আর কয় শত বৎসর রাজত্ব করিবে আর আপনারা গোলামী করিবেন, তাহা বলিতে পারেন?

প্রশ্ন নয়, যেন একটা বিক্ষুব্ধ ধিক্কার। ভালো করিয়া না বুঝিলেও মহেশ্বরী উহার জ্বালা অনুভব করে। ঢাকায় কালায়-গোরায় যুদ্ধ বাধিয়াছে; সিপাহীদের মধ্যে অন্যত্রও ঐরূপ যুদ্ধ চলিতেছে। গ্রামে তাহার নানা জনরব পৌছে। মহেশ্বরীও তাহা কিছু কিছু শোনে। দেবপ্রসাদই বলে—যাহা কাগজে, বই পত্রে পড়ে। ঢাকার পশ্চিমা ও ভোজপুরী সিপাহীরা যখন ক্ষেপিয়া উঠিতেছিল, পীতাম্বর গাঙুলী তখনি নদীগ্রাম যাত্রা করেন। দেবপ্রসাদও কালেকটরির কার্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তাড়াতাড়ি চিত্রিসারে ফিরিয়া আসে। মহেশ্বরী শুনিয়াছিল—শহরে সেই গোলযোগ এখনো থামে নাই। কিন্তু এই তেজস্বী জ্বলন্ত-হৃদয় অগ্নিরূপী ব্রাহ্মণ দেবপ্রসাদের নিকটে এখানে কেন আসিয়াছেন, এই সময়ে? মহেশ্বরী স্বস্তিবোধ করে না। তাহার ছোট দেহখানার মধ্যে বুকটি যেন কাঁপিতে থাকে, সুশ্রী মুখখানা চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। তাহার মুখের সেই চিন্তার ছাপ বুঝি

রাজীবও দেখিতে পাইল। অন্তঃপুরে ফিরিয়া যাইতেই রাজীব তাহাকে বলিল ; কে এই ওঝাজী ?—এত তেজ মানুষটার।

তেজ ! হাঁ, তেজই।—মহেশ্বরী মনে মনে বলিল। তারপর মুখ না তুলিয়াই উত্তর দেয় : অতিথি।

অতিথি ? পশ্চিমা ব্রাহ্মণ মনে হইল।

মহেশ্বরী এবার জোর দিয়াই বলিল : হাঁ, অতিথি নারায়ণ। তারপর স্বরটা সহজ করিয়া আনে ;—দেশওয়ালী ব্রাহ্মণ, বাঙালী ব্রাহ্মণদিগকে মনে করেন—ম্লেচ্ছ।

মহেশ্বরীর সুন্দর ওষ্ঠাধরে জোর-করা হাসি। সুচিক্কণ নাসাগ্র তবু কম্পমান। শান্ত চোখে তখনো আশঙ্কায় ছায়া।

রাজীব কি বুঝিল, চুপ করিয়া গেল।

দেবপ্রসাদ চিরদিনই শান্ত, বাহিরের আচরণে বাক্যালাপে সংকুচিত। বিদ্যার্জনেই ছিল তাঁহার একান্ত স্পৃহা। সে স্থিরপ্রকৃতির মানুষ, বাহিরে দেখিয়া বুঝিবার সাধ্য নাই তাহার অন্তর কোনো চিন্তার উদ্বেগে আলোড়িত। অবশ্য মহেশ্বরীর তাহা চোখ এড়াইয়া যায় না। সে বুঝিয়া লইয়াছে স্বামী চিন্তাকুল—বড় বেশি স্থির, বেশি অস্বচ্ছ তাঁহার কথাবার্তা সকলের সঙ্গে। মহেশ্বরী আরও বুঝিয়াছে—অতিথি নারায়ণ, এই ভদ্রাসন হইতে তিনি ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না। এই বাড়ির গৃহকর্ত্রীরা কোনোকালে তাহা সহিতেন না ; আর দেবপ্রসাদও তেমন অধর্মের কথা চিন্তা করিতে পারেন না।

ওঝাজী চৌধুরীদের পঞ্চবটীতলায় অতিথি-গৃহে রহিলেন—কামরূপ কামাখ্যা-যাত্রী অতিথি ব্রাহ্মণ।

প্রত্যূষের আলোক রেখা আকাশে জাগিতে না জাগিতে মন্দিরের

ঘাটে শোনা যায় উদাত্ত কণ্ঠের সূর্য-বন্দনা। আবক্ষ জল-নিমগ্ন ব্রাহ্মণ যেন শুধু অভ্যাস-বশে নয় সবল অন্তরের দৃঢ়প্রত্যয় লইয়াই আহ্বান করিতেছেন তাঁহার উপাস্য সবিতৃ-দেবতাকে—ওঠো ওঠো, জ্বলো, জ্বলো, ধ্বান্তারি, সর্বপাপঘ্ন!—শত বৎসরের রাত্রিশেষেও কি তোমার উদয়-রেখা দেখিবে না এই অধঃপতিত ভারতভূমি?—সূর্যদেব উঠিয়া আসেন ওপারের হিজল গাছের উপর দিয়া। স্নানসিক্ত সুগৌর দেহ 'ব্যোম-ব্যোম' ধ্বনিতে সমস্ত প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া আসিয়া দাঁড়ায় ঘাটের বিল্ববৃক্ষের তলায়। সে ধ্বনি শুনিয়া সকলে সমবেত হয়। সিক্তবস্ত্রে শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণ স্তব্ধ স্থির আসনে পূজা করিতে বসেন। পূজা শেষে দাঁড়াইয়া আবার আবৃত্তি করিয়া চলেন উচ্চকণ্ঠে শিব স্তোত্র ··

ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্মপুরুষং নৃকসেরিবিগ্রহম্।
কৃষ্ণপিঙ্গলমূর্ধ্বরেতং বিরূপাক্ষং শংকরং নীললোহিতম্॥
উমাপতিং পশুপতিং পিণাকিনং হ্যমিতদ্যুতিম্।
ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাম্॥
শিবোঽহম্, শিবোঽহম্।

শঙ্কাভীতিহীন মন্ত্র যেন চরাচর পৃথিবীক আপন অপরাজেয় অস্তিত্ব জানাইয়া ফিরে: শিবোঽহম্ শিবোঽহম্।

ঘাটের প্রান্তে বসিয়া দেবপ্রসাদও সাবিত্রীমন্ত্র জপ করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়ায়: আমাদের ধী জাগ্রত হোক্, জাগ্রত হোক্! এস হে সবিতার বরণ্যে জ্যোতিঃ, আমাদের তুমি প্রবোধিত করো।—একহারা দেহ বলিষ্ঠ না হোক্, ঋজু। নাকে, মুখে, চোখে সাধারণ, কিন্তু স্থিরতা আছে। আছে সংকোচ নম্রতা।

দেবপ্রসাদ শান্ত হৃদয়ে ওঝাজীর নিকটে বসে। না, সে নিসংশয়—এখনো সময় হয় নাই।

ওঝাজীর পূজান্তের স্থির গম্ভীর ও নবায়িত আত্মপ্রত্যয় দেখিতে না দেখিতে আবার ক্ষোভে নৈরাশ্যে দুঃসহ জ্বালায় জ্বলিয়া উঠে।

'এখনো সময় হয় নাই'—এক শত বৎসরে হিন্দুস্থানের গলায় ফাঁসির রজ্জু আঁটিয়া গেল। এক একটি করিয়া নিবিয়া গেল হিন্দু-মুসলমানের প্রত্যেকটি রাজ্যের স্বাধীনতার প্রদীপ। নিবিয়া গেল রণজিৎ সিংহের শেষ দীপ শিখাও। মুলুক ছারখার হইল, লক্ষে লক্ষে মন্বন্তরে মরিল, হাজারে-হাজারে কুলি হইয়া সাগরপারে চালান গেল। আজ কোম্পানি ব্রাহ্মণ ও ছত্রীর পর্যন্ত জাত মরিয়া তাহাদের কালাপানির পারে পাঠায়। বন্দুকের টোটায় গরুর ও শূয়োরের চবি মিশাইয়া হিন্দু-মুসলমান সকলের ধর্ম বিনষ্ট করে।—আর আপনার মত বিদ্বান্ বাঙালীবাবুরা বলিবেন, 'এখনো সময় হয় নাই।'

দেবপ্রসাদ তর্ক করে না;—তর্ক এক আধটুকু সে করিতে পারে পরিচিতদের মধ্যে। কিন্তু এই মানুষের সহিত তর্ক সম্ভবই নয়। দেবপ্রসাদ স্থির ভাবে অপেক্ষা করে। আপন হৃদয়ের শান্ত স্পর্শে ব্রাহ্মণের ক্ষোভ প্রশমিত করিতে চাহে। ধীরে ধীরে আবার বুঝায়—এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে শুধু সাহসে ও বাহুবলে তো কুলায় না, ওঝাজী। দেখিতেছেন—রেলে, তারে ডাকের সাহায্যে ইংরেজেরা কত সৈন্য মজুত করিয়া ফেলে; কত তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র। দানবের বিরুদ্ধে লড়িতে হইলে তপস্যা প্রয়োজন—অর্থাৎ শিক্ষা চাই, শক্তি চাই, বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্র ও আয়োজন চাই। ইহাই এইকালের তপস্যা।

ওস্তাজীর কি মনে পড়ে—বুঝি গোরাদের তোপের কথা। সিপাহীদের একটা তোপও যদি থাকিত!—একবারের মত ভুলিয়া যান তিনি তখন কোথায়। চেঁচাইতে যান, খাড়া হো! হিন্দুস্থান কি সিপাহী!—ছিন্‌লাও উ তোপ। কিন্তু বলিতে গিয়াই চমকিত হন। দেবপ্রসাদের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন। তারপর হঠাৎ যেন অন্তর মথিত হইয়া উঠে রুদ্ধ ক্রন্দনে। উঠিয়া পড়েন পঞ্চবটী-তলা হইতে। দীর্ঘ পা ফেলিয়া দীঘির পাড় দিয়া চলিয়া যান কোথায়। শূন্য-দৃষ্টি, নিরুদ্দেশ চলিয়াছেন—চারিদিকের পৃথিবীর সঙ্গে যেন তাঁহার কোনো সম্পর্ক নাই।

চোর-চোর খেলিতেছে রাজীবেরা। সূত্রধরদের ছেলেটিকে চোর বলিয়া ধরিয়া আর একজন দারোগা সাজিয়া যথানিযমে প্রহার করিতেছে। ছেলেটাও আপনাকে বাঁচাইবার জন্য যথানিয়মে চীৎকার জুড়িয়াছে: দোহাই কোম্পানির, দোহাই! আমাকে মারিবেন না, আমি চোর নই, কোম্পানির দোহাই!

'কোম্পানির দোহাই!' বেইমান! বেইমান!

কোথা হইতে ওস্তাজী ছেলেটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়াছেন!

কৌন হ্যায় তেরা কোম্পানি? নেমকহারাম, দাগাবাজ—লুঠ লিয়া হিন্দুস্তান। ডাল দেয়েঙ্গে উস্‌কো দরিয়ামে হাম হিন্দুস্তানকা সিপাহী।

হিংস্র, ব্যাঘ্রের মত চোখ জ্বলিতেছে। ছেলেটাকে বুঝি গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবেন ওস্তাজী। ছেলেরা তাঁহার দুই হাত টানিয়া ছাড়াইতে চাহে। পারিতেছে না, আশঙ্কায় চীৎকার করিতেছে।

দ্রুতপদে দেবপ্রসাদ ছুটিয়া আসিল। দূর হইতেই ডাকিল: ওস্তাজী! ওস্তাজী

চৌধুরীদের ছোটকর্তা চিরদিনই নির্বিরোধ ও শান্ত প্রকৃতি। বিবাদ-বিসম্বাদে সে ক্লিষ্ট বিমূঢ় হইয়া পড়ে। কিন্তু এ কি করিতেছে? এই উন্মাদ হিংস্র-প্রকৃতির মানুষটাকে সে যাইতেছে বাধা দিতে! কে তাহার পথরোধ করিতে চাহিল।

দেবপ্রসাদ ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া গেল। ডাকিল: ওঝাজী!

ছিন্ ল্যায়েঙ্গে হাম হিন্দুস্তানকা সিপাহী হামারা হিন্দুস্তান!

ওঝাজী! ওঝাজী!

ডাক কানে গেল। চোখেও ওঝাজী দেখিলেন—সম্মুখে দেবপ্রসাদ, তাঁহার দুই বাহু ধরিয়া সে প্রাণপণে টানিতেছে। মুখের অর্ধোচ্চারিত চীৎকার তাই থামিয়া গেল—'হামারা হিন্দুস্তান'!

সূত্রধরদের অসহায় ছেলেটা কবলমুক্ত হইয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে ভীত, শঙ্কিত কণ্ঠে তখনো অস্ফুটস্বরে আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছে:—'কোম্পানির দোহাই!'

দেবপ্রসাদ ওঝাজীর দুই হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল। টানিয়া লইয়া চলিল।

বেইমান! বেইমান!

রাগে ফুঁসিতেছেন তখনো ওঝাজী। আরক্ত মুখ, চোখে আগুন ঠিকরাইতেছে।—বেইমান বেইমান।

বিজাতীয় ঘৃণা ও আক্রোশ ক্রমে দুই দশ পা অগ্রসর হইতে হইতে বিভ্রান্ত দৃষ্টি ও অসাড় অবসাদে পরিণত হইতে লাগিল।

চৌধুরীবাবু!—শ্রান্ত, অবসন্ন কণ্ঠ, দাঁড়াইয়াছেন ওঝাজী। চক্ষু অশ্রুভরা, দেহ যেন এবার ভগ্নতরঙ্গের মত আছড়াইয়া পড়িবে ক্ষীণকায় দেবপ্রসাদের সম্মুখে।

দেবপ্রসাদ শান্তস্বরে বলিল : চলুন! পঞ্চবটী-তলায় চলুন।

গ্রামে কথাটা ছড়াইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই ওঝাজী অন্তর্হিত হইলেন। কেহ জানিল না কোথায় গেল সেই ব্রাহ্মণ! প্রত্যূষে পূজার ফুল তুলিতে গিয়া মহেশ্বরী তাঁহাকে এই গৃহে শেষ দেখিয়াছে। রাজীব দেখিয়াছে তারপর—নদীর দিকে দীর্ঘপদে অগ্রসর হইতেছে সেই দীর্ঘ মূর্তি—সম্মুখে উষার রক্তাভাস।

সব শান্ত হইলে সদরে ফিরিয়া দেবপ্রসাদ শুনিল,—তখন ঢাকার লালবাগের কেল্লার সিপাহীরা আর অবশিষ্ট নাই,—পলায়িত সিপাহীরা কেহ বা শ্রীহট্টে, কেহ বা ভাওয়ালে, মৈমনসিংহে বনে-জঙ্গলে, পথের ধারে ঝোপে-ঝাড়ে গুলিবিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। হাবিলদার দেবনন্দন উপাধ্যায়কেও জীবিত ধরা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার দেহটাকেই শুধু পথিপার্শ্বে রাজমহলের নিকট টাঙাইয়া রাখিয়াছিল ইংরেজ ক্যাপটেন জন্ মর্টিন। দেবপ্রসাদ বুঝিয়াছে—ওঝাজী শাহাবাদ কিম্বা অযোধ্যা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারেন নাই।

কালেক্টরির তৌজিতে দেবপ্রসাদের চাকরি আর রহিল না।

ম্যাজিস্ট্রেট ক্রসক্রফট্ সাহেব দেবপ্রসাদকে ডাকাইয়া বলিলেন : তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে। তুমি দেবনন্দন উপাধ্যায়ের বন্ধু ছিলে। প্রমাণ দিতে পারে- শহরের অনেক লোক আছে। তোমার কাছে সে আসিত, গল্প করিত। তুমিও তাহাকে সংবাদপত্র পড়িয়া শুনাইতে।—বলো, ঠিক কিনা?

হাঁ সাহেব। আমি তাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম—বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত।

সাহেব তখন বলিতেছেন : ড্যাম ইওর উইডো রিম্যারেজ অ্যাক্ট! তোমাদের সব মেয়ে চিরদিন বিধবা থাকুক—তাহা লইয়া কোম্পানি আর নিজের হাত পোড়াইবে না। কিন্তু হাবিলদার তবে এমন বেইমানী করিল কেন?

'বেইমানী!' দেবপ্রসাদ এই কথাটি শ্রবণ মাত্র কেমন চমকিত হইল—কে বেইমানী করিল? —হাবিলদার? না, তোমরা? না, আমরা?—কিন্তু দেবপ্রসাদ উত্তর দিতে পারিলেন না।

সাহেব বলিল : হাঁ, শাস্তি তোমাকে দিতে পারি। মিলিটারির হাতে দিলেই হয়—এখনি টাঙাইয়া দিবে। সাক্ষী প্রমাণের দরকার হইবে না। কিন্তু তুমি শিবপ্রসাদ চৌধুরীর ভাই। সে আচ্ছা আদমি! সে সঙ্গে থাকিলে মফঃস্বলে গেলে আমার কোনদিন মদ ও মুর্গীর অভাব হয় নাই। আচ্ছা, কেন তখন তোমরা ট্রেজারির টাকা লুঠ করিয়া দেশে পালাইয়া গেলে?

দেবপ্রসাদ আপত্তি করিল। 'তেরজুম্বির' টাকা সে কখনো লুঠ করে নাই। বিদ্রোহ আসন্ন বুঝিয়া তেরজুরির টাকা প্রথম লুঠ করিল খাতাঞ্জি ও কর্মচারীরা;—দেবপ্রসাদ তৎপূর্বেই বিদায় গ্রহণ করিয়া দেশে প্রস্থান করিয়াছে। তাহার পরে তেরজুরি দ্বিতীয় দফা লুঠ করিল সিপাহীরা। ভাগ যোগ করিয়া দুই এক শত টাকা যে যাহা পায় তাহা লইয়া পশ্চিমে নিজেদের মুলুকে তাহারা রওয়ানা হয়। কিন্তু কেহ দেশে পৌছিতে পারে নাই—পথেই ধরা পড়িয়াছে। তথাপি পরে ওঝাজীর পরিবারের মত তাহাদের অসহায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যাও সরকারের অত্যাচারে উৎপীড়নে নিঃম্বল হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। দেবনন্দন উপাধ্যায় এই বিশৃঙ্খল সিপাহীদের সংহত করিয়া তবু কেল্লা দখলে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সিপাহীরা তখন পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে

ব্যগ্র। সেখানে কুমার সিং, তাত্তিয়া তোপী ইংরেজকে বিতাড়িত করিবে। তথাপি শেষ পর্যন্ত কেহ কেহ ওঝাজীর সঙ্গে ছিল। তোপের মুখে যখন কেল্লার প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িল তখন যে যেদিকে পারে দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া ইতস্তত ছড়াইয়া পড়ে। একে একে তাহারা নিহত হয়, কিম্বা ধরা পড়ে, ফাঁসি যায়। দেবনন্দন ওঝাও আর শাহাবাদ মৃজাপুরে পৌঁছিতে পারেন নাই। এদিকে ইতিমধ্যে দুর্গ দখল করিয়া ফিরিঙ্গী সিপাহী ও তাহাদের ক্যাপ্টেনে মিলিয়া তৃতীয়বার তেরজুরি লুঠ কবিয়াছে ;—মুখে বলিল, তাহারা 'শান্তি স্থাপন' করিতেছে। ক্রশ্‌কফটের মত পাকা সাহেব এই ব্যাপারের সবই জানিত। আসলে ক্যাপটেন ও গোরাদের সৌভাগ্যে তাঁহারা সিবিলিয়ানরা ঈর্ষান্বিতও ছিলেন। ইহারা লুঠও করিল আবার কোম্পানির রাজ্যের উদ্ধার-কর্তা বলিয়া নামও করিল। তাই দেবপ্রসাদ যখন বলিল :—'বিদ্রোহের পূর্বেই আমি সেরাস্তাদার মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গ্রামে যাই, একথা সাহেব জানেন সত্য। আর কাহারা যে তেরজুরি লুঠ করিয়াছে, তাহাও সাহেব ইচ্ছা করিলেই জানিতে পারেন।'—সাহেব মনে মনে তখন খুশী হইলেন। এই দেশের হাওয়ায় তিনি ঢিলে-ঢালা জীবন পসন্দ করেন—খাও দাও, ফুর্তিতে থাকো। এইসব উৎপাত কেন? শিবপ্রসাদ চৌধুরীর ভাই লোকটা বেকুফ, বজ্জাত নয়।

সাহেব বলিলেন : সব আমি জানি। তোমরা বিদ্যাসাগরের দলে। আর তুমি ঝুট বাত্‌ বলিবে না, তাহাও আমি জানি। অথচ তুমি শিবপ্রসাদের ভাই,—আর শিবপ্রসাদ একটা ডিয়ার রাস্‌কেল—না বলিতে পারে এমন মিথ্যা নাই। তাই আমি তাহাকে পছন্দ করি—সে কাজের লোক! তুমি হইলে গুড়ি-গুড়ি টাইপের মানুষ। না পার টাকা লুঠিতে, না পার সিপাহীদের ধরাইয়া দিতে। তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম,

কিন্তু চাকরীতে রাখা চলিবে না। যাও, তুমি কাছা খুলিয়া নবদ্বীপ চলিয়া যাও।—বলিয়া সাহেব হাসিয়া উঠিলেন। ফর্সিতে টান দিলেন।

দেবপ্রসাদ সেলাম করিয়া চলিয়া আসিল। তখনো জ্যেষ্ঠ শিবপ্রসাদ চৌধুরী বাঁচিয়া আছেন। সংবাদ পাইয়া মৈমেনসিংহ হইতে আসিলেন। ক্রশক্রফট সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট থাকিতে দেবপ্রসাদের চাকরি যায়—ইহাও একটা কথা? খাঁটি ব্রাণ্ডি সংগ্রহ করিতে তিনি ভুলিলেন না। কিন্তু দেবপ্রসাদের যেন কি হইয়াছে। সে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবে না। দেখা করিলেই চাকরি হইবে—শিবপ্রসাদ সে ব্যবস্থা করিতেছেন। ব্রাণ্ডি-শুদ্ধ সাহেবের ডালি ইতিপূর্বে চলিয়া গিয়াছে।

দেবপ্রসাদ বলিল: আমি আর কোম্পানির চাকরি করিব না।

শিবপ্রসাদ কহিলেন: শুনিতেছি কোম্পানি থাকিবে না। ইংলণ্ডেশ্বরীই রাজ্যভার গ্রহণ করবেন।

আমি তাঁহার চাকরিও চাই না।

শিবপ্রসাদ অবাক হইয়া যান। দেবপ্রসাদের হইল কি? বিষয়বিত্ত হারাইয়া চিত্রিসারের প্রাচীন চৌধুরী-বংশ সবে আবার তাহাদের তিন ভাইয়ের উপার্জনে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। গত দুই বৎসর শিবপ্রসাদ পুরাতন আড়ম্বরে দুর্গাপূজা নির্বাহ করিয়াছেন। নাট-মন্দিরে নূতন চালা উঠিয়াছে। অতিথিগৃহ তিনি পুন নির্মাণ করিয়াছেন। এইবার পুরাতন ভদ্রাসনেও নূতন করিয়া প্রসারিত করিবেন। ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী শুদ্ধ পরিবার তো বাড়িয়াই গিয়াছে, ঘর দুয়ারে কুলায় না। আরও কুলাইত না—তাহারা বিদেশে জীবিকার্জনে না বাহির হইলে। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা হরপ্রসাদ চিরদিনই আত্মস্বার্থ লইয়া ব্যস্ত;—মেজবধূর জন্যই এইরূপ হইয়াছে। শিবপ্রসাদ চৌধুরীর তাই

প্রধান ভরসা—দেবপ্রসাদ। সে বিদ্বান্‌, বিদ্যার্জনেই তাহার বিশেষ আগ্রহ। সংসারের উন্নতি সাধন করিতেও তাহার মনোযোগ যথেষ্ট। কিন্তু সেই দেবপ্রসাদ বলে কি? সে চাকরি করিবে না; সে দাসত্ব করিতে চাহে না। শিবপ্রসাদ চৌধুরী অবাক হইয়া থাকেন।

কিন্তু দেবপ্রসাদ শান্ত প্রকৃতি হইলেও দৃঢ় সংকল্প। শিবপ্রসাদ বুঝিলেন—সে মত পরিবর্তন করিবে না। দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করিয়া তিনি তাহা মানিয়া লইলেন। মনে মনে ভাবিলেন—ইহাই ভালো। বরং বাড়িতে যাও, বধূমাতাও আছেন।

দেবপ্রসাদ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। চিরদিনই সে একটু স্বাস্থ্যে দুর্বল। শিবপ্রসাদের বড় স্নেহভাজন সে। সে রোজগার করিতে বিদেশে যাইবে,—শিবপ্রসাদের তো প্রথম দিকে তাহাতেও আপত্তি ছিল। দেবপ্রসাদই জোর করিয়া শহরে আসিয়াছে, চাকরী গ্রহণ করিয়াছে। আজ যদি দেবপ্রসাদ গৃহে ফিরিতে চাহে তাহা হইলে একদিকে ভালোই হয়। চৌধুরীদের কর্তৃস্থানীয় কেহ এখন বাড়িতে নাই। অবশ্য দেবপ্রসাদ চাকরি না করিলে পারিবারিক আয় হ্রাস পাইবে। তাহাতে ভয় কি? শিবপ্রসাদ চৌধুরী জানেন—তিনি আমিন হইলেন বলিয়া। তাহা ছাড়া, এখনো হিসাব করিয়া খরচ করিলে তিনি কি না করিতে পারেন তাঁহার নিজের উপার্জনেই? শিবপ্রসাদ তাঁহাকে বাড়ি যাইতে বলিয়া কর্মস্থলে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু দেবপ্রসাদ গৃহেও প্রত্যাবর্তন করিল না। কি করিবে, শহরেই বসিয়া ভাবিতে লাগিল। একদিন প্রথম যৌবনে সে 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'কৌমুদী' পড়িয়া ইংরাজী শিক্ষার স্বপ্ন দেখিয়াছিল। তাহার সে স্বপ্ন সফল হয় নাই। তাহার পর 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পড়িতে পড়িতে আর একটা নূতন চেতনাও তাহাকে পাইয়াছে—

জ্ঞানই পরম আনন্দের কারণ; জ্ঞানলাভেই এই প্রাচীন জাতির মুক্তি। তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল—ইংরাজ রাজত্ব ও ইংরেজী শিক্ষা সেই মুক্তির পথই এই দেশে এইবার উন্মুক্ত করিতেছে। দেবনন্দন ওঝার মূঢ় বিদ্রোহে তাহার সেই বিশ্বাস এখনো টলে নাই, টলিবার কারণও নাই। কেবল দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছে। দেবনন্দন সদাচারী, সাহসী, বীর, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ভ্রান্ত। বড় ভ্রান্ত এই সিপাহীরা। পৃথিবীর কোন সংবাদই তাহারা রাখে না। রেল, তার, ডাক, ইহার মূল্যও বুঝে না, গুরুত্বও বুঝে নাই। অজ্ঞানতার বশেই ইহারা কল্পনা করিয়াছে এইভাবে ইংরেজ রাজত্ব উচ্ছেদ করা সম্ভব। তৎপর দিল্লীর বাদশাহ আবার রাজতক্তে বসিবেন। মূঢ় ধর্মোন্মাদনায় নিজেদেরই শুধু আহুতি দিল এই উন্মাদ সাহসী সৈনিকেরা। দিল্লীর বাদশাহ রাজতক্তে বসিলে কি হইত? না, দেবপ্রসাদের ইহাতেও সন্দেহ নাই—নানা সাহেব ও বাহাদুর শাহের মত সেই রাজা-রাজড়াদের হস্তে ভারতবর্ষ আবার নিপতিত হইলে দেশে আবার ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারই ঘনাইয়া আসিত, —সম্ভবত অরাজকতাও আবার দেখা দিত, শান্তি-স্বস্তি বিলুপ্ত হইত।

কিন্তু দেবপ্রসাদ বিস্মৃত হইতে পারে না দেববন্দন ওঝার সেই হতাশা। তাঁহার অভিমানক্ষুব্ধ শেষ অভিযোগ -'বেইমানী, বেইমানী।'

বিদ্রোহীদের পরাজয় অনিবার্য। তাহাদের চারিদিকে ইংরেজের লৌহ কঠিন যুদ্ধ-জাল গুটাইয়া আসিতেছে। -আসিবেই তো; সাহস থাকিলে কি হইবে? তেজ থাকিলে কি হইবে? ধর্মোন্মাদনায় কি হইবে? সিপাহীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণা নাই। যুদ্ধবিদ্যার জ্ঞান নাই। তাহাদের শৃঙ্খলা সংহতি কোথায়?—চৌধুরীবাবুর মুখে এই সব শুনিয়া হতাশ ওঝাজীর চোখ ক্ষোভে অভিমানে জ্বালায় জ্বলিতে থাকে।

'এক শত বৎসরে এই দেশের মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার কী আয়োজন

সরকার করিয়াছে, চৌধুরী বাবু? তুমি তো নিজেই তাহা বলিয়াছ। তোমাদেরই বা কি শিখাইয়াছে ইংরেজ তাহার ইস্কুলে? ঐ 'কোম্পানির দোহাই।' বেইমানী, বেইমানী। তোমরা তো স্কুলে পড়িলে, কলেজে পড়িলে; কত শিখিলে,কত বুঝিলে;—জাত দিলে, ধর্ম দিলে কত জনা;—কি জন্য? নোকরি মিলিল, খেতাব মিলিল। মুলুকের মানুষের কি হইল? যাও তবে এখন ধরাইয়া দাও সিপাহীদের,—নোকরি মিলিবে, খেলাত পাইবে, দারোগা হইবে!'

দেবনন্দন ওঝা শহরে প্রথম তাঁহার নিকট বসিয়া শুনিতেন সংবাদপত্র পাঠ। বারাণসীতে শাস্ত্র পড়িতে পড়িতে তিনি যোগদান করেন ফৌজে। কণৌজীয়া ব্রাহ্মণ, সংস্কৃত জানিতেন, হিন্দী পড়িতেন, বাঙলাও বুঝিতেন। সদাচারী, তেজস্বী প্রকৃতি, কিন্তু নূতন কথা জানিতে বুঝিতেও আগ্রহবান্। বিধবা বিবাহের বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সুযুক্তি তাঁহাকে দেবপ্রসাদ পড়িয়া শুনাইয়াছে। সংস্কারে বাধিলেও ওঝাজী তাহার যুক্তিবত্তা শেষ অবধি মানিয়া লইয়াছিলেন। দেবপ্রসাদকে তিনি মান্যও করিতেন। কিন্তু বিদ্রোহ যখন ঘনাইয়া উঠিতেছে তখন কিছুতেই তাঁহাকে দেবপ্রসাদ নিরস্ত করিতে পারিল না। সে কি বেইমানী করিবে জাতির সঙ্গে?—প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মুখে দেবনন্দন উপাধ্যায় অগ্রসর হইয়া গেলেন, ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—সে কি চৌধুরী বাবুর মুখেই শোনে নাই স্বাধীন মুলুকের কথা—আমেরিকার, ফ্রান্সের? 'ছিন লায়েঙ্গে হিন্দুস্থান হামারা।'

সবাই জানে দেবপ্রসাদ চৌধুরীর চাকরি গিয়াছে সেবার সিপাহীদের বিদ্রোহের সময় সদর ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিয়া আসায়। দেবপ্রসাদ আর তাই সরকারি চাকরি পায় নাই। জীবিকার্জনে

তাঁহারা বাহির হইয়াছেন,—জীবিকা ভিন্ন আর গতি কি তাঁহাদের মত বিত্তহীন ভদ্রলোকদের? কিন্তু 'নকরি করিবে, খেলাত পাইবে, দারোগা হইবে';—চাকরি-সর্বস্ব জীবন-যাত্রার প্রতি এই ধিক্কারও তাহার মর্মস্থলে বিদ্ধ হইয়া রহিল। কি করিবে দেবপ্রসাদ? স্বাধীন কোনো জীবিকা আছে কি? মুলুকের লোকের কিছু করা হয় কিরূপে?

সরকারি চাকরি খোয়াইয়া তাই দেবপ্রসাদ বাঙলা ইস্কুলে শিক্ষকের পদগ্রহণ করে। তাহা পীতাম্বর গাঙুলীই তাহাকে জোগাড় করিয়া দিলেন। দেবপ্রসাদের অবশ্য শিক্ষা কার্য বরাবরই অভিপ্রেত ছিল। এখন ইহাকেই আপনার দায়িত্ব বলিয়া বোধ করিল। দেবনন্দন ওঝা যাহাই বলুক—জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়া মুক্তির পথ নাই ভারতবর্ষের।

৫

বেচারামের দেউড়িতে পীতাম্বর গাঙুলীর বাসাবাটি। বৈষয়িক কর্মে গাঙুলী মহাশয়কে প্রায়ই শহরে আসিতে হয়। কাছারিতে একজন ব্রাহ্মণ মুহুরি মামলা মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য বরাবর থাকে, একজন পিয়াদা পরিচারকও আছে। পীতাম্বর গাঙুলী শহরে আসিলে আহারাদির ব্যবস্থা ইহারাই করে। বহির্বাটিতে অনেকটা খালি জমি, আর ছোটবড় খান কয় কাঁচা ঘর; আশ্রিত, অনুগত, আত্মীয় পরিজন থাকে, শহরে তাহারা কাজকর্ম করে, কেহ বা লেখে-পড়ে।

দেবপ্রসাদকে এই বাসায় জোর করিয়া ধরিয়া আনিলেন পীতাম্বর গাঙুলী—প্রথক দিকেই যখন চাকরির সন্ধানে সে শহরে আসিয়াছে। মধ্যমগ্রামের গুপ্তরা একজন তখন সদরালা। জ্যেষ্ঠ শিবপ্রসাদ তাঁহারই

কথা মত চাকরি পাইয়া চলিয়া যান ময়মনসিংহে। দেবপ্রসাদ থাকিয়া যায় গুপ্তদের বহির্বাটিতে; কলেকটরির তৌজিতে তখন সে মোহরের কাজ পাইয়াছে। খবর পাইতেই পীতাম্বর গাঙুলী সে বাড়িতে গিয়া উপস্থিত। দেবপ্রসাদের কথা কে শোনে? তিনি পীতাম্বর গাঙুলী, তাঁহার নাম না হয় না শুনিয়াছে চিত্রিসারের চৌধুরী বাড়ির দেবপ্রসাদ চৌধুরী। কিন্তু নন্দীগ্রামের গাঙুলীদের নাম ত শুনিয়াছে। চৌধুরীদের বৃদ্ধা কর্ত্রী তাঁহারই মাতুলবাড়ির কন্যা। গাঙুলী বাড়িতেই বিবাহ হইয়াছিল দেবপ্রসাদের এক পিসির। তিনি কুলীনের কন্যা, চৌধুরী বাড়িতেই মানুষ হইয়াছিলেন তিনিও। তিনি ছিলেন পীতাম্বরের খুল্লতাতের প্রথম সংসার। দেবপ্রসাদ না জানিলেও পীতাম্বর ত না জানিয়া পারেন না এই সব। গত হইয়াছেন তাঁহারা বহুকাল। খুড়ার দ্বিতীয় সংসারের দৌহিত্ররা আছে। কুলীনের কুপুত্র। মাতুলালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল—'হ্যানো দাও, ত্যানো দাও,।' পীতাম্বর গাঙুলী অশিক্ষা কুশিক্ষার প্রশ্রয় দেন নাই। হাঁ, নন্দীগ্রামের সেই ঘর-জামাইর ঝাড়ও তিনি সমূলে উপড়াইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি 'উন্নতিশীল দলের' মানুষ, কৌলীন্যের বিরোধী,—বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের প্রধান সমর্থক এই অঞ্চলে, তাহা দেবপ্রসাদও শুনিয়া থাকিবে। ভাগিনেয় কুটুম্ব আত্মীয় স্বজন সকলকে তিনি স্পষ্ট বলেন,—'ও সব হইবে না। উপার্জন করো, খাও। স্বাবলম্বী হও। কিম্বা, লেখাপড়া শিখিতে চাও? আস, পীতাম্বর গাঙুলী তোমাকে সকল রকমে সাহায্য করিবেন, যত খরচ হয় জোগাড় করিয়া দিবেন। কিন্তু শিক্ষিত হও, স্বাবলম্বী হও।'

পীতাম্বর গাঙুলী 'উন্নতির দলে'। গুপ্তরাও তাহাই। তবে,—পীতাম্বর গাঙুলী দেবপ্রসাদকে তত্ত্বটা বুঝাইয়া দেন,—তাহারা বৈদ্য, দেশে থাকেও না। আর তিনি ব্রাহ্মণ, সমাজের কর্তা চিরদিনই তাঁহারা।

এখনো তাঁহাদেরই সমাজ পরিচালনা করিতে হইবে। আর, শহরে আত্মীয় কুটুম্ব থাকিতে, পীতাম্বর গাঙুলীর বাসাবাটি থাকিতে, দেবপ্রসাদ চৌধুরী থাকিবে বৈদ্যের আশ্রয়ে ?—দেখিবে দেবপ্রসাদ গাঙুলীদের বহির্বাটিতে কত লোকের জন্য ব্যবস্থা রহিয়াছে। অন্দরে ছোট পাকা বাড়ি—কেহ ত থাকে না এখানে; পীতাম্বর একাই থাকেন যখন শহরে আসেন। বহিরাঙ্গনের চৌচালা ঘরে তাঁহার কাছারি বাড়ি। যখন শহরে থাকেন তিনি নিজে বসেন সম্মুখাংশে। পাটিপাতা, তাকিয়া সাজানো। পার্শ্বের খুপরিতে হুঁকা-বরদার থাকে। পিছনে বেড়ার আড়ালে বড় খোপ, বিশিষ্ট অতিথি কেহ আসিলে তাঁহার জন্য ব্যবস্থা হয়। ওদিকের লম্বা চৌচালা ঘরে থাকে তাঁহার সদরের মুহুরী, আর দেশের সমাজের লোক—আপিসে আদালতে তাহারা কাজ করিয়া খায়। তৎপার্শ্ববর্তী লম্বা আটচালায় ছাত্রদের স্থান। জন সাত আট ছেলেকে তিনি থাকিবার স্থান করিয়া দিয়াছেন; তাহারা কেহ ইস্কুলে পড়ে, কেহ টোলে পড়ে, লেখাপড়া করে। —লেখাপড়া না শিখাইলে জাতির উন্নতি হইবে কিরূপে?—প্রাঙ্গণে এদিকে সেদিকে ছোট ছোট ঘর। বুঝা যায় পৃথক পৃথক্ রন্ধনশালা। যাহার যেমন সম্ভব ব্যবস্থা করিয়া লও, গাঙুলী মহাশয়ের বারণ নাই।

দেবপ্রসাদকে এই বাড়িতে এক রকম টানিয়া লইয়া আসিলেন পীতাম্বর গাঙুলী। চৌচালা ঘরের বাসিন্দাদের সঙ্গে সে স্থান করিয়া লইল।

মুখ চোরা মানুষ দেবপ্রসাদ, সর্বদাই কেমন সঙ্কোচ মনে-মনে। গাঙুলী মহাশয়কে মরুব্বি রূপে গ্রহণে তাহার পক্ষে কোনো বাধাই ছিল না, অধিকন্তু তাহার উপকারই হইল। পীতাম্বর গাঙুলীও মুরুব্বি হইবার মতই মানুষ। মুখে সর্বদা ডাক-হাঁক, কাহারও পিছনে থাকা তাঁহার অসহ্য। দেবপ্রসাদ উৎফুল্লও হয় মনে মনে—'তত্ত্ব বোধিনীর' পাঠক সে; পীতাম্বর গাঙুলী আবার উন্নতিশীলদের নেতা, 'বিধবা বিবাহের

দলে'। তাঁহার গৃহেও পুস্তক পুস্তিকার অভাব নাই। একজন পণ্ডিতও রহিয়াছেন—বিদ্যারত্ন 'প্রেসের পণ্ডিত।' গাঙ্গুলী মহাশয়ের বিচার বিতর্কেও তিনি সাহায্য করেন। ইংরেজী গাঙ্গুলী মহাশয় কতটা জানেন, বলা শক্ত। কিন্তু হিন্দু পেট্রিয়ট তাঁহার ডেস্কের উপর থাকা চাই। কলিকাতার বড় বড় লোকদের নিকট সর্বদাই তিনি চিঠি-পত্র লেখেন, কাগজে পত্র প্রেরণ করেন নানা বিষয়ে,—দেশে কাহার সহিত তাহার পরিচয় নাই? পীতাম্বর গাঙ্গুলীকে কে না চিনে?

দেবপ্রসাদকে আপনার বাসাবাটিতে তুলিয়া আনিয়া তিনিও দেখিলেন—মুখচোরা হইলে কি হয়, দেবপ্রসাদ লোকটা 'তত্ত্বাবোধিনী' পড়ে', সব খবর রাখে। পীতাম্বর গাঙ্গুলীর তখন আবিষ্কার করিতে বিলম্ব হইল না—বাঃ, চিঠিপত্র বেশ মুশাবিদা করে ত এই মুখচোরা যুবক। কলিকাতার সংবাদপত্র তখন পীতাম্বর গাঙ্গুলীর চিঠিপত্রর সংখ্যা বাড়িয়া গেল—তাহা যে আর বিদ্যারত্নের রচিত নয়, তাহাও লোকে পড়িয়া বুঝিল। কিন্তু মুখচোরা দেবপ্রসাদের কথা বিশেষ কেহ জানে নাই।

কথাটা জানিল তাহার ঘরের বাসিন্দারা। জানিয়া তাহারা চুপ করিয়া গেল। তামাক ভিন্ন অন্য নেশা সে ছোঁয় না। কিন্তু ঘরের বাসিন্দাদের নেশারও অন্ত নাই, উৎপাতেরও শেষ নাই। গাঙ্গুলী মহাশয় নিজেও জানেন—শনিবার হইলে সন্ধ্যায় একটা হুল্লোড় পড়িয়া যায়। কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ মদের নেশায় বমি করে, কেহ কোনো বেশ্যালয়ে পড়িয়া থাকে। বাসার স্কুল কলেজের ছাত্ররা ও ইহাদের সহিত জুটিয়া যায়—'লায়েক হইতে হইবে'.—দেবপ্রসাদের ইহা দেখিয়া শুনিয়া দম বন্ধ হইয়া আসে। ঘরের বাসিন্দারা তাহাকে সঙ্গে না পাইয়া বিরক্ত হইত। ইতর ইঙ্গিতে তাহাকে গাল পাড়িত। কিন্তু তাহারা যখন বুঝিল লোকটা গাঙ্গুলী মহাশয়ের পেয়ারের তখন আর তাঁহাকে

উৎপীড়ন করে নাই। একটু একটু দূরে রাখিয়া চলে। ক্রমে তাহারাও বুঝিতে পারে—ছোট চৌধুরী মানুষ মন্দ নয়, তবে ঐ– ফূর্তি, আনন্দ বোঝে না।

দেবপ্রসাদের সরকারী চাকুরী গেলে গাঙুলী মহাশয় তাহাকে নিজেই শিক্ষকতা জোগাড় করিয়া দিলেন। পীতাম্বর গাঙুলী এখন আর শুধু চিঠি পত্র লেখাইয়া লইয়াও দেবপ্রসাদকে ছাড়িয়া দেন না। তিনি মুরুব্বি মানুষ, লোকটার যাহাতে উন্নতি হয়, তাহা তিনি দেখিবেন না ত কে দেখিবে? 'শহরে আসিয়াছ। লোক জনের সঙ্গে মিল, মিশ,। তুমি কাজের মানুষ, দশজনের মধ্যে একজন হইবে না কেন?' পীতাম্বর গাঙুলী মুরুব্বিরূপে আপনার সঙ্গে দেবপ্রসাদকে শহরের গণ্যমান্য সমাজেও টানিয়া লইয়া যাইতে ব্যস্ত।

জিরতলীর দেওয়ান আসিয়াছেন—গাঙুলী মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ আছে। বৈঠকখানার বাহিরে পাল্কী বেহারা, জমিদারদের বরকন্দাজ দণ্ডায়মান। গাঙুলী মহাশয় ডাকাইয়া পাঠান ছোট-চৌধুরীকে। দেবপ্রসাদ সংকোচে প্রায় পালাইয়া থাকে। ভয়টা কি দেবপ্রসাদের?—গাঙুলী মহাশয় ভাবিয়াই পান না। তাহারা চিত্রিসারের চৌধুরী, নন্দীগ্রামের গাঙুলীদের কুটুম্ব। বসন্ত সরকার আজ 'সরকার' হইয়াছে। সেদিনও ছিল 'দাস'। নীলকর ওয়ালেস সাহেবের গোমস্তার ছেলে সে। কায়স্থ সমাজে ছোট তাহারা; এখন 'উন্নতিশীল' হইয়া ব্রাহ্মণদের কৃপায় জাতে উঠিতে চায়,—বলিয়া পীতাম্বর গাঙুলী হাসেন। জানান—এক কালে বসন্ত সরকার চৌধুরীদের পায়ের ধুলি জিহ্বাগ্রে না লইয়া কথা বলিতে সাহস করিত না। অবশ্য এখন সে যুগ নাই। বসন্ত সরকারও ইংরেজী শিক্ষিত মানুষ, হাত জোড় করিয়াই নমস্কার করিবেন, দেবপ্রসাদও প্রতি-নমস্কার করিবে।—ভয় কিসের তাহাকে তবে?

সত্যই বসন্ত সরকার আলাপ করেন মুরুব্বি মানুষের মত সস্নেহে। অন্যদিকে ব্রাণ্ডি আসে, ইংরেজ শিক্ষিত মানুষ তাঁহারা। বন্ধু বান্ধবের সমাদর করিবেন না? দেবপ্রসাদকে গাঙুলী মহাশয় পাত্র আগাইয়া দেন। দেবপ্রসাদ জিভ্ কাটিল—গাঙুলী মহাশয় কি কাণ্ড করেন?

কাণ্ড আবার কি? তুমি শিবপ্রসাদ চৌধুরীর ভাই—এক বোতলে যার কিছু হয় না। দেখিয়াছি ত কতবার।

দেবপ্রসাদ তাহা জানে। দাদা বিদেশে থাকিয়া অর্থোপার্জনের সঙ্গে মদের মাত্রা এত বাড়াইয়া দিয়াছেন যে, এক এক সময়ে দিন রাত টং হইয়া থাকেন। ভৃত্যরা আসিয়া বাড়িতে ভয়ে ভয়ে এই সব জানাইয়াছে। তাঁহার টাকা পয়সা ও নানা ভূতে খাইতেছে। শিবপ্রসাদের প্রকৃতিই এইরূপ। বলিষ্ঠ-দেহ পুরুষ, মদ ও মাংস তাঁহার গৃহে লাগিয়াই আছে। প্রাণটাও তেমনি বড়। দুই হাতে টাকা বিলাইয়া দেন।

দেবপ্রসাদ সসঙ্কোচে পাত্র গ্রহণ করে। কর্তাদের এদিকে ক্রমশ প্রাণ খুলিয়া যায়।

দেওয়ান সাহেব বলেন: কুমারদের সঙ্গে দেখা কারো নাই কেন এখানে? দেখা করিও। দরবারে যাইবে না ত শহরে আসিলে কেন?

গাঙুলী মহাশয় বলেন: আসিয়াছে ত উকিল হইয়া বসিতে হইবে। ছোট চৌধুরী, আর এক পাত্র লও। আরে লও, লও। তোমাকে আমি মানুষ করিয়া ছাড়িব। দেখিবে এক বোতলেও কিছু হইবে না।—দেবপ্রসাদ কিন্তু আর পান করে না। কেমন ভয় ভয় করে। তাহা ছাড়া আধ বোতলেই ততক্ষণ গাঙুলী মহাশয় ভুল বকিতেছেন। বসন্ত সরকারও উঠিয়া পড়েন, শুধু মদে তাঁহার চলে না। গাঙুলী ত এখন বেসামাল হইবে।

পীতাম্বর গাঙ্গুলী দেবপ্রসাদকে লইয়া চলিলেন শিক্ষকদের নিকটে। শিক্ষা পরিদর্শক বনমালী চ্যাটুজ্যের সঙ্গেও পরিচয় করাইবার জন্য লইয়া যাইবেন।

বাঙাল বলিবে তোমাকে? তাহাতে হইয়াছে কি? বরং পরিচয় করিয়া রাখো, সময় মত কাজেও উন্নতি করিতে পারিবে।

বনমালী চট্টোপাধ্যায় হুগলি-শ্রীরামপুরের লোক—ইংরেজী-পড়া মানুষ। গঙ্গার ওপারই তাহার নিকট 'পাণ্ডব-বর্জিত' দেশ। অথচ কার্যসূত্রে তাঁহাকে আসিতে হইল কিনা পদ্মাপারে এই পূর্ববঙ্গে। শহরের লোকগুলিকে দেখিয়া তিনি বিরক্ত হন—কুট্টি, আর বসাক শাঁখারীর রাজ্য। আরও বিরক্ত হন তিনি শিক্ষিত লোকদের দেখিয়া। ইহারা কলিকাতার বাবুও নয়, নূতন শিক্ষিত মধ্যবিত্তও নয়। শিক্ষাদীক্ষা ভদ্রতা, সবই যেন স্থূল, মোটা; উহার উপরই আবার 'শিক্ষিত' বলিয়া গর্ব। পশ্চিম বঙ্গের দুই-একজন অধ্যাপক, বাঙলা লেখক ও শিক্ষকের সঙ্গে মাত্র কথাবার্তা বলা যায়; তাহাও কতক্ষণ বলা যায়? দীনবন্ধু মিত্র শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন। অন্য সরকারী কর্মচারীরা কি মানুষ? কাহারও সাহত বসিয়া "প্রভাকর" লইয়া আলোচনা করিবেন, 'পদ্মিনী উপাখ্যান' লইয়া তর্ক করিবেন, 'কুলীন কুল সর্বস্ব' লইয়া পরিহাস করিবেন—'নাটক' বলে ইহাকে?—'নাটক' কি তাহা বুঝাইবেন,—এমন ইংরেজী সাহিত্য-জানা লোক বড় কেহ নাই। কৃষ্ণচন্দ্র সেন ও হরিশ্চন্দ্র মিত্র অবশ্য আছেন। অন্যেরা কেবল কলিকাতার অনুকরণে মাতামাতি করে। চাটুজ্জে মহাশয় মফঃস্বলে ঘুরিয়া বেড়ান—তাঁহার আদর্শ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রায় অজ্ঞ। তবু তাহারাই ভালো। দুই একজন সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক পণ্ডিতের দেখা গ্রামে পান, চতুষ্পাঠীতে তাঁহারা ন্যায় স্মৃতি, অলঙ্কার পড়াইতেছেন।

আলাপে শ্রদ্ধা পোষণ করেন তাঁহাদের প্রতি। কিন্তু বুঝিতে পারেন—সাহিত্যের যথার্থ অর্থ তাঁহারা জানেন না। মনে হয়, এই বাঙাল দেশে অরসিক সমাজে সরস্বতী তাঁহাকে নির্বাসন দিয়াছেন। কি করিবেন? কদাচিৎ মনের মত দুই একটি মানুষ পাইলে শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেন, বাঙলা সাহিত্য লইয়া পাঠ করেন। সামান্য একটু সুরাপান করিয়া নিজেই তখন আবৃত্তি করিতে থাকেন—আবৃত্তি করিতে তাঁহার ভালো লাগে। আবৃত্তি করিতে করিতে কেমন নেশা লাগিয়া যায়, ইচ্ছা হয় না থামেন। কিন্তু তেমন সহৃদয় শ্রোতা কোথায় পান করে? তাই সুরাই পান করেন।

দেবপ্রসাদ তাঁহার সম্পর্কে আসিয়া চমৎকৃত হইল। বনমালী চাটুজ্জেও আবিষ্কার করিলেন—লোকটা তাঁহার আবৃত্তি শুনিতে চায়। হয়ত সে সাহিত্যও বোঝে। বনমালীবাবু তাঁহাকে বাঙাল বলিয়া ঠাট্টা করিলেও তাই উপেক্ষা করিলেন না। দেবপ্রসাদও তাঁহার সান্নিধ্যে একটা নূতন চেতনা লাভ করিল। গভীর মর্মদাহ ও অপরাজেয় প্রশ্ন দেবপ্রসাদের অন্তরতলে থাকিয়া বাহিরের এই শান্ত প্রকৃতির মানুষটিকে অন্তরে অন্তরে বিমথিত করিয়া তুলিতেছিল। শীঘ্রই নূতন দিকে হইতে নূতনরূপে এখন দেবপ্রসাদের সম্মুখে সেই বেদনা প্রকাশিত হইল। সে দেখিল বিমূঢ়, নিষ্ক্রিয় বাঙালী-চেতনা হঠাৎ আত্ম-আবিষ্কারে বাহির হইয়াছে—সাহিত্যে। দেবপ্রসাদ আপনার গভীর দীর্ঘশ্বাসই শুনিতে পাইল বনমালী চাটুজ্জের পাঠ শুনিতে শুনিতে:

শুন গো ভারতভূমি! কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুম-ঘোর হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।

কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস কোথা তব কালিদাস,
কোথা তব ভবভূতি মহোদয়।...
মধু কহে, জাগো জাগো, বিভুস্থানে এই মাগো
সুরসে প্রবৃত্ত হ'ক তব তনয়-নিচয়।

ভারতভূমি সত্যই কি জাগিতেছে তবে ?

এই নবীন অনুভূতি স্থিরাকার হইয়া জমিতে না জমিতেই কিন্তু দেবপ্রসাদ এই শহরে শুনিতে পায় নীল-বিদ্রোহের প্রতিধ্বনি। কাশীশ্বর বিদ্যারত্ন বাঙাল 'প্রেসের পণ্ডিত'। দেবপ্রসাদ ছাপাখানায় গ্রন্থ মুদ্রণের কার্যে বিদ্যারত্নের সহকারিতা করে। সেই ছাপাখানাতে মুদ্রিত হইয়াছিল 'নীলদর্পণ'—'নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর প্রজানিকর ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম।' পথিক দেবপ্রসাদেরও অপরিচিত নহেন,—বনমালীবাবুর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতাও সে জানে। অবশ্য তিনি 'উন্নতিশীলদের' দলে নহেন। বরং এই 'বাঙাল' ও 'শিক্ষিতদের' ব্যঙ্গ করিতে তিনি অদ্বিতীয়। তাহাতে কি ? জিরতলীর কুমারদের চেষ্টায় 'নীলদর্পণের' অভিনয় হইল। দেবপ্রসাদ তাহা দেখিবে। দেখিতে গিয়া দেবপ্রসাদ আত্মবিস্মৃত হয়। মনে আর স্বস্তি পায় না। 'বেইমান, বেইমান!'—নাট্যকার যেন ইহাই বলিতেছেন। তাহার শান্ত অন্তর জ্বলিতে থাকে মর্ম পীড়ায়, সে ভাবিয়া পায় না—কি করিবে সে নিজে ? কি করিবে ?

আবার ওঝাজীকে দেবপ্রসাদের মনে পড়িতে থাকে।

ঘটনার চাকাও দ্রুত ঘুরিতে লাগিল। পীতাম্বর গাঙ্গুলী উহার সহিত পাল্লা দিয়া চলিবেন। আপনারই প্রয়োজনে দেবপ্রসাদকেও তাহার একান্ত আবেষ্টনী হইতে তিনি এই আলোড়নে টানিয়া বাহির করিতে

থাকেন। হুগলী-কলেজে পড়া ছাত্র ডিপুটি বাবু বলেন: 'আপনাদের এখানে মানুষ কোথায়? একটা ভালো সংবাদ পত্র নাই সমস্ত দেশে।' উন্নতি উন্নতি বলেন, উন্নতি হইবে কিসে?'

পীতাম্বর গাঙুলী উদ্যোগী হইলেন। বসন্ত সরকার আছেন, জিরতলীর কুমার বাহাদুর তাঁহাদের উন্নতিশীলদের মুরুব্বি। তাঁহাকে দুই জনে ধরিলেন, একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা না হইলে আর আমাদের মুখ থাকে না এই অঞ্চলে। হরিশ্চন্দ্রের 'কবিতা কুসুমাবলী' বাজে জিনিস।

কুমার বাহাদুর বসন্ত সরকারকে বলিলেন: ছাপার টাকা আমার দায়িত্ব। কিন্তু কাগজ যেন ঠিক বাহির হয়। কলিকাতার লোকেরা দুয়ো দিতে না পারে 'বাঙাল' বলিয়া। বনমালী চাটুজ্জে বুঝিবে।

বসন্ত সরকার বলেন সে তো লেখার ব্যাপার—বিদ্যারত্ন দেখিবে, দেবপ্রসাদ দেখিবে।

'বঙ্গ প্রকাশ' বাহির হইল—পীতাম্বর গাঙুলী সম্পাদক। সমস্ত উন্নতিশীলদের উপর তিনি এইবার টেক্কা দিয়া চলিলেন। ইহা কি আর কাহারও সাধ্য ছিল? দেবপ্রসাদ এই সংবাদপত্রে লেখার কার্যে নিযুক্ত হইয়া আপনার অভাবনীয় সৌভাগ্যে প্রায় বিহ্বল হইয়া পড়িল। এতদিন সে শিক্ষকতা করিতেছিল, তাহা তাহার মনঃপূত কাজ। উহার সঙ্গে এইবার পাইল এই সংবাদপত্রে লেখার কাজ। আর নকরি নয়, খেলাত নয়, খেতাব নয়, মুলুকের মানুষের কাজ। এদিকে নীলের গোলমালও প্রায় বাধিয়া গিয়াছে। আন্দোলন দানা বাঁধিতেছে। 'নীলদর্পণের' অভিনয় এখানে দেবপ্রসাদের মত অনেককেই অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। বসন্ত সরকারের বাপকে এখানকার নীলকর সাহেবেরা একদিন কান ধরিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল, ইংরেজি জানা বসন্ত সরকার এইবার তাহার প্রতিশোধ তুলিবেন। আর সেই ওঝাজীর সঙ্গে শেষ

সাক্ষাতের পর হইতে দেবপ্রসাদের কলম বলিবার মত একটা কথা পাইয়াছিল, সেও এইবার তাহা বলিবার মত সুযোগ লাভ করিল।

ইংরেজী শিক্ষিত বাবুরা 'বঙ্গ প্রকাশের' লেখা পড়িয়া খুশী হইয়া উঠিলেন। কুমার বাহাদুর সেই লেখা শুনিতে শুনিতে বলিলেন: আরে, এইদিকে তো 'দেব পণ্ডিত' রোগা মুখচোরা মানুষ, কিন্তু সাহস তো কম নয়। উহাকে পাইলে যে সাহেবেরা জ্যান্ত ছিঁড়িয়া ফেলিবে।

কুমার বাহাদুর দেবপ্রসাদকে ডাকিয়া পাঠান, সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান। নাম দেন 'পত্রিকার পণ্ডিত।'

পীতাম্বর গাঙুলী উৎফুল্লচিত্তে বলিলেন: ছোট চৌধুরী, চালাও।

কিন্তু শীঘ্রই কলম সংযত করিতে হইল। কলিকাতায় লং সাহেবের যখন অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড হইল, তখন অনেকের চৈতন্য হইল। তৎপূর্বেই অসময়ে হরিশ মরিয়াছে, তাহার হিন্দু পেট্রিয়টকে জব্দ করিবার জন্য নীলকর সাহেবরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ইংরেজীওয়ালা সরকারী চাকুরেরা সঙ্গে সঙ্গে বলিল—'নীলদর্পণের' লেখক বড় বেশী বাহাদুর হইয়াছিলেন! পীতাম্বর গাঙুলীরও বড় সাহস বাড়িয়াছে। তাহাদেরই একজন বলিল—ম্যাজিস্ট্রেট্ নাকি গাঙুলী মহাশয়কে ডাকাইবেন। সাতাশটা বড় বড় নীলকর সাহেবের এই জিলায় জমিদারী; তাহারা ক্ষেপিয়াছে। শুনিয়া কুমার বাহাদুর ভরসা দিলেন—কুছ পরোয়া নাই। আমরা আছি, গনি মিঞা সাহেবকেও ধরিব। আসুক ব্যাটারা।

উকিলবাবুরা পীতাম্বর গাঙুলীকে পরামর্শ দিলেন, তাঁহার শহর ত্যাগ করিয়া আপাততঃ নন্দীগ্রাম যাওয়া উচিত। তাই সেখান হইতে শহরে সংবাদ আসিল—গৃহিণীর হঠাৎ রোগবৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহার সন্তান সম্ভাবনা ছিল; রোগবৃদ্ধি আশঙ্কার কারণ। গাঙুলী মহাশয় শহরে

'উন্নতি-উন্নতি' করিয়া বিষয়-সম্পত্তি দেখেন না, এখন পত্নীর মৃত্যু ঘটাইবেন নাকি?

বিদ্যারত্নের নিকট সংবাদপত্রের ভারার্পণ করিয়া গাঙুলী মহাশয় সেই সন্ধ্যাতেই তাই নৌকায় উঠিলেন—তাঁহার চোখে মুখে শশব্যস্তভাব।

কাশীশ্বর বিদ্যারত্ন 'বঙ্গ প্রকাশে' লিখিলেন: "ভারতবর্ষীয়গণের প্রতি পরম কৃপাময় পরমেশ্বর সদয় বলিয়াই ভারতজননী ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতীয় প্রজাগণের দুঃখদূরীকরণ মানসে স্বয়ং আপনকার হস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা অস্মদাদির সম্যক অবগতি আছে যে, ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্যে অবিচার নাই, অত্যাচার অশ্রুত ব্যাপার। বস্তুতঃ, এই ভারত-ভূখণ্ডে অধুনা ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। যদ্যপি দুর্বুদ্ধিবশতঃ কোনো দুরাচার দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে চাহে, মহামান্যা ভারতেশ্বরী সর্বদা সতর্ক দৃষ্টিতে অবহিত রহিয়াছেন, তাঁহার কর্মচারীবর্গ জাগ্রত আছেন। ইংলণ্ডীয় কর্মচারীগণও রহিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি না যে, কোনো ইংরেজজাতীয় সুসভ্যদেশের নীলকর প্রভৃতি জমিদার মহাশয়েরা জ্ঞাতসারে অন্যায় অবিচার করিবেন। বস্তুতঃ, তাঁহাদের সরকার গোমস্তারাই নানা অসৎকর্মের আকর। অত্র জিলার সাহেব জমিদারবর্গ সাতিশয় উদার মহানুভব, পুত্রজ্ঞানে প্রজাদিগের পালন করেন। ইত্যাদি।"

দেবপ্রসাদ পড়িল, চুপ করিয়া রহিল। ভাবিল, উপায় কি? সে মাত্রাতিরিক্ত সাহস দেখাইতে গিয়া গাঙুলী মহাশয়কে বিপন্ন করিয়াছে। সেইজন্য সে নিজেও চিন্তিত ও অনুতপ্তবোধ করিতেছিল। হয়ত এইরূপ কৌশল ছাড়া আর গাঙুলী মহাশয়ের রক্ষার উপায় ছিল না।

কিন্তু সত্য বলিবার উপায়ই বা তবে সংবাদপত্রে কোথায়? দেবপ্রসাদ যেন পথ খুঁজিয়া পায় না।

মাস তিনেক পরে পীতাম্বর গাঙুলী শহরে ফিরিয়া আসিলেন। তখন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। যেন কিছুই হয় নাই, এমন ভাবেই তিনি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, সহযোগী কর্মীদের সঙ্গে আবার সকল কাজে জুটিলেন; সকলের অগ্রে অগ্রে গিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই সাদরে তাহাকে স্থান করিয়া দেয়—পীতাম্বর গাঙুলী বেশ চতুরতার সহিত আত্মরক্ষা করিয়াছেন।—বাহাদুর বটে!

দেবপ্রসাদকে হাসিয়া আত্মীয়ের মত সস্নেহে গাঙুলী মহাশয় কহিলেন: ছোট চৌধুরী খুব চিন্তায় পড়িয়াছিলে, না?—কি লিখিয়া কি বিপদে পড়িলে। একটু হঠকারিতা করিয়াছ, তাহা ঠিক। কিন্তু জানোই ত, আমি তোমাকে ঠিক বাঁচাইয়া লইব।—তবে একটা কথা এবার বুঝিয়া রাখিও, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের সঙ্গে অযথা বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। তাহা ছাড়া, এখন স্বয়ং মহারাণী রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহার প্রথম দিককার কথা শুনিয়া দেবপ্রসাদ মনে মনে কৌতুকবোধ করিতেছিল—গাঙুলী মহাশয়ের রীতিই এইরূপ, নিজের দুর্বলতাকে না মানা। কিন্তু শেষ কথাটায় সে নিস্তব্ধ হইল। ইহাও গাঙুলী মহাশয়ের রীতি-সম্মত, হাওয়া বুঝিয়া পাল তুলিয়া দেওয়া। কিন্তু তাহা আর দেবপ্রসাদের পক্ষে কৌতুকবোধ করিবার মত নয়। সে প্রতিবাদও করিতে পারিল না। গাঙুলী মহাশয়কে কিছু বলা তাহার পক্ষে অশোভন। তিনি তাহার মুরুব্বি।

দেবপ্রসাদ বলিল : এই সব জটিল বিষয়ে আমার পক্ষে সংবাদপত্রে লেখা বিপজ্জনক। আমি আর লিখিব না।

গাঙ্গুলী মহাশয় যেন প্রস্তুতই হইয়া ছিলেন, বলিলেন : লিখিবে না কেন? তুমি বরং এই সব বিষয়ে না লিখিলে। তুমি শিক্ষক মানুষ। শিক্ষা বিষয়ে লিখো। শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, ধর্ম-সংস্কার,—ইহাতেই তো দেশের উন্নতি সম্ভবপর। তাহা ছাড়া, ত্যাখো, এখন কলিকাতায় বাঙলা কাব্য রচনার ধুম পড়িয়াছে। এখানে আমরা পিছনে পড়িয়া যাইতেছি। দেওয়ান সাহেব কুমারদের এইদিকে বুদ্ধি দিতেছেন। কিন্তু লেখক কোথায়? তোমরা শিক্ষকেরা উৎসাহী হও। বনমালী চাটুজ্জের সঙ্গে তো তোমার সাহিত্য লইয়া কত কথা হয়। এখন লাগো তো একবার লেখায়। পারিবে না কি? তোমাকেই লাগিতে হইবে। হরিশ পারে, তুমি পারিবে না কেন?

দেবপ্রসাদ ভীত হইয়া পড়ে—সাহিত্য লিখিবে কিরূপে সে? তাহার সে শক্তি কোথায়। সে ইংরেজী পর্যন্ত জানে না। ইংরেজী না জানিলে কি তাহা লেখা সম্ভব?

তথাপি শেষ পর্যন্ত দেবপ্রসাদ কৃতজ্ঞ বোধ করে। শিক্ষা বিষয়ে লিখিতে তাহার আগ্রহ আছে। 'বঙ্গ প্রকাশে' লিখিতে লিখিতে লিখিবার একটা গোপন সাধও তাহার মনে বাসা বাধিয়াছিল।

৬

কলিকাতার রাজা মহারাজারা নাটক লেখান, অভিনয় করান। এখানেই 'নীলদর্পণ' অভিনীত হইল প্রথম। বসন্ত সরকারেরই কথায়

কুমার বাহাদুররা বলেন: আমরা ষ্টেজ বাঁধিয়া এখানে অভিনয় করিব।

শুনিয়া মিত্রজা দেওয়ান সাহেবকে বলেন: এখানে নাটক! কুমার বাহাদুরদের যে তাহা হইলে কলিকাতা হইতে পুরুষ মেয়ে সকলকে মুজরা আনাইতে হইবে।

বসন্ত সরকার বলিলেন: এখানে যাত্রার দল অগণ্য। এত যাত্রাগান আর কোথায় হয়? আমরা নাটক অভিনয় করিতে পারিব না কেন তবে?

মিত্রজা বলিলেন: আর যাহাই করুন, আপনাদের বাঙাল ভাষা তো লুকাইতে পারিবেন না।

কথায় কথায় পশ্চিম বঙ্গীয়দিগের মুখে এই অবজ্ঞা প্রায়ই শুনিতে হয়। বসন্ত সরকারও কিন্তু বলিতে ছাড়িলেন না: আপনার শ্বশুরে ভাষাও তো আপনি নাটকে লুকান নাই।

মিত্রজা একটু হাল্কা করিয়া বলেন: কিন্তু আপদাদের ঢাকাই বাঙালদের কথা শুনিলে যে মা সরস্বতীর প্রাণ ত্রাসে উড়িয়া যাইবে। আপনারা তো কথা বলেন না—মারিতে আসেন।

বাঙালদের লইয়া যতই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করুন বনমালী চাটুজ্জের সঙ্গে, নিজের নাটকের অভিনয় দেখিবার সাধ তাঁহারও প্রবল ছিল। বিশেষত বনমালী চাটুজ্জে 'নীলদর্পণকে' বিশেষ প্রশংসা করে না। মিত্রজা তাহাতেও ক্ষুণ্ণ ছিলেন। এক পাতা লিখিবে না, বনমালী, কেবল খুঁত ধরিবে। 'নীলদর্পণের অভিনয়ও হইল। পশ্চিম বঙ্গীয়রা বিদ্রূপ করিতে ছাড়িল না। বনমালী চাটুজ্জে দেবপ্রসাদকে বলিলেন, বাঙাল দেশে বাঙলা ভাষা শ্রবণ—শিরসি মা লিখ। মা লিখ, মা লিখ, তাহার পরে আর নাটকের অভিনয় হয় নাই—ওই পশ্চিমবঙ্গীয় হাকিম কর্মচারীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভয়ে। নাটকের অভাব ছিল না। কুমার বাহাদুরদের

বৈঠকখানায় তাই তখন স্থাপিত হয় 'সাহিত্য-বোধিনী সভা'। ডাক পড়িল—পদ্য লেখো, প্রবন্ধ রচনা করো, অনুবাদ করো। আসর জাঁকাইয়া কুমারেরা বসিতেন, সাধ্য কি কেহ বলিবে পূর্ববঙ্গীয়রা বঙ্গভাষা জানে না, কিংবা জিরতলীর কুমারেরা বিদ্যোৎসাহী নয়? সভাশেষে তাঁহারা পারিতোষিক দিতেন, বৃত্তি-বিতরণ করিতেন। বনমালী চাটুজ্জে নিমন্ত্রিত হইতেন সাদরে, উৎসাহ লইয়া যাইতেন, কিন্তু তৃপ্ত হইতেন না। তখনো কিন্তু দেবপ্রসাদের কথা কেহ স্মরণ করে নাই। তাহার পরে 'বঙ্গ-প্রকাশ' লইয়া কিছুদিন জমিদার ও কর্তৃস্থানীয়দের উৎসাহ অন্যদিকে বৃদ্ধি পায়। এখন আবার পীতাম্বর গাঙুলী ও দেওয়ান সাহেব কুমারদের অভিমান ও আঞ্চলিক গর্বকে জ্বালাইয়া তুলিতেছেন—নাটক অভিনয় করিতে হইবে।

কলিকাতার রাজা-মহারাজাদের মত নাটক লিখাইবেন কুমার বাহাদুররাও এখানে। অভিনয়ে উচ্চারণের বিভ্রাট ঘটিবে না। আমাদের যাত্রার দলের ছেলেরা আছে, আর ভাটপাড়া নবদ্বীপের ছাত্র পণ্ডিতেরা আছে, কিছুই ভাবনা নাই। লেখাও নাটক।

দেবপ্রসাদকে পীতাম্বর গাঙুলী বলেন; এত তো তুমি 'শর্মিষ্ঠা', 'কৃষ্ণকুমারী' মুখস্থ করিতে বনমালী চাটুজ্জের কাছে। এবার লেখো।

আমি নাটক লিখিব?—বিস্ময়ে বিমূঢ় হয় দেবপ্রসাদ। 'নীলদর্পনের' প্রসঙ্গেই সেবার বনমালী চাটুজ্জে নাটকের রূপ বুঝাইয়া বলিয়াছেন —ইংরেজী নাটকের স্বরূপ কি। তাহার পরে যার দেবপ্রসাদ সাহস করিতে পারে নাটক লিখিবে? পীতাম্বর গাঙুলী বলিলেন: রাখো বনমালী চাটুজ্জের কথা। রামনারায়ণ, উমেশ মিত্র কি ইংরেজী পড়িয়াছে? না, কালিদাস, ভবভূতি ইংরেজী জানিতেন? তাঁহারা নাটক লেখেন নাই? হরিশ মিত্র লিখিতেছে কিরূপে?

দেবপ্রসাদকে কুমার বাহাদুরেরা ডাকাইয়া বলেন : পত্রিকার পণ্ডিত, নাটক লেখো। আমরা অভিনয় করিব, পুরস্কার দিব।

বসন্ত সরকার বুঝাইয়া বলেন : তুমি না লিখিলে লিখিতেছে, দেখো, হরিশ মিত্র। লিখিবে বিধবা বিবাহের বিরোধী-পক্ষ।

দেবপ্রসাদ সত্যই গোপনে গোপনে লিখিতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করিয়া হতাশ হয়। 'শর্মিষ্ঠা' থাকুক, 'একেই কি বলে সভ্যতা' বা 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁবা, মত একটা প্রহসনও লিখিয়া উঠিতে সে পারে না। পারিলে সে লিখিত ওঝাজীর কথা—'বিদ্রোহী-চরিত'।

কিন্তু নাটকের দল গঠনের তোড়-জোড় চলিতেছে। যাত্রার দল ছাঁকিয়া নট সংগ্রহ চলিতে থাকে। এদিক-ওদিক হইতে পেশাদার নাচওয়ালীদেরও যাচাই করা হয়। কুমার বাহাদুরদের জলসা-ঘরে উহার আসর বসে। দেবপ্রসাদের নাটক লিখিতে হইবে ; অতএব তাহাকেও উপস্থিত থাকিতে হয় সেই সব দিনে—কুমার বাহাদুরের হুকুম।

জলসা ঘর অদ্ভুত কাণ্ড! নাচ-গান, আর ব্রাণ্ডির জলসত্র। এক-আধটুকু মদ্যপানে দেবপ্রসাদের আপত্তি নাই। কিন্তু সহজেই তাহার দেহ কেমন অস্বস্তি বোধ করে। অথচ আসরে কেহ ছাড়িবেও না। এক-একদিন কুমার বাহাদুরদের এই মজলিস জমিয়া উঠে। সদল বলে তাঁহারা জলসা-ঘরে বসেন। গান-বাজনা চলে। পুরুষানুক্রমে রাজাদের সঙ্গীতে বিশেষ আকর্ষণ। লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়র হইতে মুসলমান ওস্তাদেরা আসে ঢাকায়। কুমার বাহাদুর স্বয়ং বাঁয়া-তবলা লইয়া বসেন কখনো কখনো। তাঁহাদের গর্ব কলিকাতার বাবুরা খেয়ালের কি বোঝে? ঠুংরির কি জানে? তাহারা নিধু বাবুর টপ্পাতেই খুশী। গানের আসল দেশ বিষ্ণুপুরের পরেই ঢাকা। এখানে কখনো বাহির হইতে আসে

হিন্দুস্থানী বাইজী। কখনো স্থানীয় বাজার হইতেও নাচওয়ালী সংগ্রহ হয়। কুমারদেরই এক খানসামা একটা নটের বউকে বাহির করিয়া আনিয়াছিল, তাহার মেয়েটা এখন বৎসর পনেরর। হাসি, ঢঙ, চাহনি, কথার ধরণ, দেহের ভঙ্গি মেয়েটা যাহা শিখিয়াছে, কোথায় লাগে তাহার অশিক্ষিত পটুত্বের নিকট বাজারের নাচওয়ালী ? অভাবে তাহারও ডাক পড়ে। হৈ চৈ পড়ে তাহাকে লইয়া। দেবপ্রসাদ কেমন লজ্জিত বোধ করে বাবুদের কাণ্ড দেখিয়া। কুমারেরা বলেন ঃ বিন্দি, তোকে কলিকাতা পাঠাইব। দেখিবে কলিকাতার বাবুরা 'বাঙাল' মেয়ে-মানুষ কেমন পারে না নাটক করিতে।—

মাত্র দুই একদিন দেবপ্রসাদ পীতাম্বর গাঙুলীর তাড়নায় এই জলসা ঘরে গিয়াছে। 'সাহিত্য বোধিনী সভায়ও' সে শুনিয়াছে—ইংরেজি জানা শিক্ষা-গর্বিতদের ব্রাণ্ডির মুখের বক্তৃতা। ইহাদের পানাসক্তি, বক্তৃতা-বিলাস আর জমিদারদের জলসা-ঘরের উচ্ছৃঙ্খল কাণ্ড,—কোনোটাই তাহার অকল্পিত নয়। তথাপি চাক্ষুষ এই দৃশ্য দেখিয়া, এই মত্ততা, পানোল্লসিত কণ্ঠের হৈ-চৈ শুনিয়া এই নাতিবলিষ্ঠ, স্বল্পভাষী, আত্মমুখী মানুষের দেহ ও মন যেন ঘৃণায় সংকুচিত হইয়া উঠিতে চাহে। তাহার বারে বারে মনে পড়ে—প্রশ্নটা বারে বারে মনে ফিরিয়া আসে—'একেই কি বলে সভ্যতা' ? ইহাই কি ইংরেজী সভ্যতা ?—যে ইংরেজী শিক্ষা তাহার আবাল্য স্বপ্ন ?

দেবপ্রসাদ পালাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে বনমালী চট্টোপাধ্যায়কে পাইলে।

'বাঙাল' দেবপ্রসাদকে পাইলে বনমালী বাবুও এখন সত্যই প্রীত হন। পীতাম্বর গাঙুলী বনমালী বাবুকে বলিয়াছিলেন ঃ দেবপ্রসাদ নাটক

লিখিবে, জিরতলীর কুমারদের এইরূপ আদেশ। ইহাকে মাইকেলের কথা বলুন ত কিছু। বলুন, ঠিক কিনা—এদিকে তো তিনি লিখেন 'একেই কি বলে সভ্যতা'। ওদিকে ত নিজে মদের নেশায় চুর।

শুনিয়া সহাস্য কণ্ঠে বনমালী চট্টোপাধ্যায় একটু স্থির হন: নেশা করিলেও তিনি মাইকেল; অন্য মাতালেরা মাইকেল নয়, মাতাল।— একটু জোর দেন তিনি 'মাতাল' কথাটির উপর। মদ্য বনমালীবাবুও পান করেন; কিন্তু তিনি মাতাল নহেন, পীতাম্বর গাঙুলী নহেন। তাহাই ইঙ্গিতে বুঝাইয়া আবার জানান—তবে অমিতাচারী না হইলে মধুসূদন বুঝি আরও বড় হইতেন—ভূদেব বাবু তাহাই বলিতেন আমাদের।

কিন্তু নাটক লেখা কি সহজ কথা? মাইকেল পড়িলেই কি তাহা কেহ শিখিতে পারিবে? মাইকেল ত আসলে কবি—মহাকবি।

বনমালী চাটুজ্জে জানান: এখন কিন্তু কবিতা লিখিতেছেন মাইকেল। 'শর্মিষ্ঠা' ত পড়িয়াছেন। 'তিলত্তমা-সম্ভব কাব্য' পড়িয়াছেন কি? আর পয়ার ত্রিপদী নয়, অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

দেবপ্রসাদও তাহা শুনিয়াছিল। বাংলা পণ্ডিত হিসাবে সে ভাবিয়া পায় নাই—তাহা কি করিয়া সম্ভব। অবশ্য সংস্কৃতে অন্ত্য যমক ছিল না। কিন্তু সে স্বতন্ত্র ভাষা। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' তিলোত্তমার কতকটা যখন প্রকাশিত হয় উহা পাঠ করিয়া দেবপ্রসাদ বরং তখন হতাশ হইয়াছে। পড়িতেই পারা যায় না যে এই কাব্য।

বনমালীবাবু বলেন: বলেন কি? শুনুন—

> ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরাল গামিনী
> চলিলা কানন পথে। কত স্বর্ণলতা
> মুকুলিতা সাধিল ধরিয়া পা দুখানি
> থাকিতে তাদের সাথে।

পড়িতে পারা যায়—বনমালী স্নিগ্ধ হাস্যে হাসিয়া বুঝান—ইংরেজী অমিত্রাক্ষর ছন্দ অদ্ভুত জিনিস। মধুসূদনও বাঙলায় তাহা সৃষ্টি করিলেন। বাঙলায় অসম্ভব সম্ভব করিলেন।

বনমালী আশায় উৎফুল্ল। নাটকের কথা ভুলিয়া দেবপ্রসাদও শুনিতে বসে তাঁহার নিকট কাব্যের কথা। বনমালী চাটুজ্জে শ্রোতা পান।

আসিল 'মেঘনাদবধ কাব্যই প্রথম খণ্ড। বনমালী মাতিয়া গেলেন। দেবপ্রসাদকে ডাকিয়া পাঠান, বারে বারে পড়েন বনমালী চট্টোপাধ্যায়। শব্দের, ছন্দের, কল্পনার মধ্য দিয়া তিনি নিজেও যেন একটা নূতন জগতের দ্বারে গিয়া পৌঁছিতেছেন। দেবপ্রসাদের পক্ষে সে দ্বার এখনো অর্গলবদ্ধ। কিন্তু এই সহাস্য স্থির-চরিত্র, পুরুষ তাহাকে উহার দুয়ারে পৌঁছিয়া দিতেছেন, তাহা দেবপ্রসাদ অনুভব করে। ইহাই বুঝি সেই মহাসমুদ্রের উদাত্ত গম্ভীর বাণী, সহস্র-দ্বার মন্দিরের মহান্ তোরণ—ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়া এই মন্দিরেই, এই বাণী-চরণেই বুঝি উত্তীর্ণ হইবার স্বপ্ন সে দেখিত। ইহাকেই বুঝি বলে ইংরেজী সভ্যতা!

বনমালী চাটুজ্জে স্থির হইয়া বসেন; সুদূরে তাকাইয়া থাকেন। বলেন: জানি না। কিন্তু ভূদেববাবুকে দেখিয়াছি—সদাচারী, স্বধর্ম-নিরত, সংযত-চরিত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া কি বলিব তাঁহাকে? তিনি হয়ত বলিতেন—ইহা বিজাতীয়তা। 'ইংরেজ অনেক শিখিয়াছে, অনেক কিছু আয়ত্ত করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যাহা আমাদের তাহা খোয়াইব কেন? পরিবার, সমাজ, ধর্ম—ইহাই আমাদের আশ্রয়। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।'

বনমালী চট্টোপাধ্যায় যেন নিজেও একবারের মত সম্বিত হারান। তারপর বলেন,—আমরা ভূদেব নই। ইংরেজী শিক্ষা সভ্যতাই আমিও চাই, কিন্তু জাতীয় নিয়মে—নিজের ভাষায়, নিজের সাহিত্যে।

ঘোর লাগে। দেবপ্রসাদ বিদ্যাসাগরকে চিনে কি? চটি-চাদর, আর সেই ঋজু মনুষ্যত্ব—মাইকেলেরও তিনিই সহায়।

মাইকেল, হাঁ মাইকেল। —পড়িতে পড়িতে মাতিয়া উঠেন বনমালী চাটুজ্জে আবার। সুরাপাত্র পড়িয়া থাকে।

দেবপ্রসাদের মন সহজে আন্দোলিত হইত 'ব্রজাঙ্গনার' সুরে। কিন্তু বনমালী চাটুজ্জের মুখে অদ্ভুত শোনাইল সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ 'তিলোত্তমার'। এইবার শুনিল 'মেঘনাদবধ'। না শুনিলে সে 'মেঘনাদবধ' বুঝি পড়িতেও পারিতনা। এইত কল্পনার 'বিদ্রোহীচরিত'।

কিন্তু হায়, কোথায় বনমালীবাবু? দেবপ্রসাই বা কতটুকু পায় সময়? যাহা পায় তাহাতে আশা মিটে না।

বনমালী চট্টোপাধ্যায় তাহার সাহিত্য প্রীতি জাগাইয়া তুলিল; নিজেও এই শ্রোতা পাইয়া বাঁচিলেন।

গাঙুলী মহাশয় উন্নতিশীল লোক। শহরের বাসাবাড়িতে এই সময়ে তিনি আনাইয়াছেন তাঁহার দুই পুত্রকে—শহরে ইংরেজি স্কুলে তাহাদের শিক্ষা না দিলে হয়? গ্রামে যতটুকু পড়িবার তাহারা পড়িয়াছে। এখন তাহারা আর বালক নয়। চিন্তাহরণ তো বড়ই হইয়াছে —প্রায় দশ বৎসর বয়স, পিতামহী তাহার বিবাহের কথা বলিতেছেন। গিরীশ আট ছাড়াইয়া নয়ে পড়িবে। অবশ্য সে মাসীমাকে ছাড়া কোথাও থাকে না। মাসী মা সঙ্গে না আসিলে এখানেও আসিবে না, জিদ ধরিয়াছিল। তাঁহাকে শুদ্ধ পড়িতে আসিয়াছে দুই ভাই।

গৃহিণীর এই বিধবা অগ্রজা এতদিন নন্দীগ্রামে বোনের নিকটই থাকিতেন। নিঃসন্তানা, বাল বিধবা। গিরি ঠাকুরাণী শহরে

আসিয়াছেন, ছেলেদের তিনিই দেখিবেন শুনিবেন। শহরের বাসার ব্যবস্থা এবার পাকাপাকি হইল। গাঙুলী মহাশয়ও তাই এখন শহরেই থাকেন সাধারণতঃ। মাঝে মাঝে বাড়ি যান ছেলেদের লইয়া তাহাদের ছুটি হইলে।

বিধবা এই শ্যালিকাটির যত্নে, সুব্যবস্থায় গাঙুলী মহাশয়ের নিজে দেহ-মনে বেশ স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিলেন। কেহ-কেহ অবশ্য বক্রোক্তি না করিল তাহা নয়, একা একজন বিধবা রমণী একটা দাসী মাত্র লইয়া আগলাইতে আসিয়াছেন ভগ্নীপতির এই বাসাবাড়ি। কে জানাইল—'লোকে বলে পীতাম্বর গাঙুলী বিধবা বিবাহের দলে কেন জুটিলেন, তাহা বোঝা গেল।'

গাঙুলী মহাশয় চটিয়া বলেন: উহাদের এইসব কথার আমি তোয়াক্কা রাখি নাকি? আমি পীতাম্বর গাঙুলী!

দেবপ্রসাদ খুশী হয়, মনে মনে স্বীকার করে—সাহস আছে গাঙুলী মহাশয়ের। তিনি শুধু বাকপটু নন।

গিরি-ঠাকুরাণীও দুই দিনেই গুছাইয়া ফেলিলেন সব। একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা আসিয়াছে ঘরে দুয়ারে। মাঝে-মাঝে একটু ব্যতিক্রম ঘটিলেও গাঙুলী মহাশয়েরও জীবনে সঙ্গে সঙ্গে এবার শৃঙ্খলা আসে। অন্দরে গিরি-ঠাকুরাণী আছেন,—তাঁহাকে গাঙুলী মহাশয়ও মানিয়া চলেন—বেশি মদ খাওয়া চলিবে না। নাচগান যাহা বাহিরে চলুক, সাবধান হইতে হইবে। মাসখানেকের মধ্যেই বহির্বাটির আশ্রিত অনুগৃহীতেরা ইহা বুঝিল। গিরিঠাকুরাণী সব খবর রাখেন। সকলের জন্য প্রয়োজন মত সুব্যবস্থাও করিয়া ফেলেন। কাঠ নাই রাজীব চৌধুরীর—উহুন ধরাইতে গিয়া সে দেখিয়াছে। কিন্তু কেমন করিয়া জানিয়া ফেলিয়াছেন তাহা 'মাসী মা'। হয়ত গিরীশই সংবাদটা পৌছাইয়াছে,—'চৌধুরী খুড়ার

রান্নার কাঠ নাই। আমাদের পড়া শেষ হইলেই ছুটিবেন বাজারে।' পড়া শেষ হইবার পূর্বেই দেবপ্রসাদ দেখে কাঠ আসিয়া গিয়াছে। ব্রত-নিয়মে ভোজ্য আসে অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের। আত্মীয় কুটুম্বকে গাঙ্গুলী মহাশয়ও এখন প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান। বাড়িটা জম-জমাট। ছোট চৌধুরীর দিকে মাসীমায়ের দৃষ্টি স্বভবতই একটু বেশি সজাগ। কুটুম্ব মানুষ, বহির্বাটিতে রাঁধিয়া বাড়িয়া খান, ইস্কুলে পড়ান, গাঙ্গুলী মহাশয়ের লেখা-পড়ায় সকল কাজেও তাঁহাকে চাই। বিদ্বান মানুষ! চিন্তাহরণ গিরীশ পড়িতে আসিলে পীতাম্বর গাঙ্গুলী তাহারই উপর উহাদের পড়াশুনা দেখার ভার দিয়াছেন—'ইংরাজী তুমি নাই বা জানিলে। আর, জানো না কি? স্কুলে পড়ো নাই। না হইলে অনেকের অপেক্ষা বেশী শিখিয়াছ। তোমার উপর এদিকে উহাদের পড়াইবার ভার, আর গিরি ঠাকুরাণীর উপর ওদিকে সকলের খাওয়া পরার ভার—আমি নিশ্চিন্ত। তাহা না হইলে দশটা কাজ লইয়া আর দেখিতে পারিব সংসারের কিছু?'

গিরি ঠাকুরাণী দেবপ্রসাদকে উঠাইয়া আনিয়া বসাইলেন কর্তার কাছারি বাড়িতে—যেখানে বিশিষ্ট অতিথিদের বাসের ব্যবস্থা হয়। এখন ছেলেরা সেখানে বসিয়া পড়িবে, সেখানে দেবপ্রসাদ তাহাদের লেখাপড়া দেখিবেন। আসলে মাসী মা বুঝাইয়া দিলেন—দেবপ্রসাদ ওই বহির্বাটির নানা মানুষের মত নয়, তাহাদের অপেক্ষা বড়, বিদ্বান গুণী আর গাঙ্গুলীদের আপনার লোক।

দেবপ্রসাদের জীবনে এইবার আর একটি পাতা খুলিয়া যায় এই বালকদের সাহচর্যে।

চিন্তাহরণ ও গিরীশকে দেবপ্রসাদ আদর করিত নিশ্চয়ই—

এ বাড়িতে ছোট ছেলে বলিতে একমাত্র তাহারাই। প্রবাসে এই বালকদের সঙ্গ সকল পুরুষের মনকেই স্নিগ্ধ করে। কিন্তু দেবপ্রসাদ তাহাদের প্রতি সত্যই স্নেহাসক্ত হইয়াও পড়িল। তীক্ষ্ণ তাহাদের বুদ্ধি, আর বয়সের অনুপাতে বিদ্যাও কম নয়। কোথা হইতে পাইল তাহারা পড়াশুনায় এই আগ্রহ? চিন্তাহরণ জ্যেষ্ঠ, মেধাবী, স্থির প্রকৃতির। দেবপ্রসাদ দেখিল—সে একটু কল্পনা-প্রিয়ও। গিরীশ কিন্তু আরও তীক্ষ্ণ, আরও প্রখর বুদ্ধি। কথায়ও সে পটু, আর ছোট বলিয়াই একটু আদর বেশি পাইয়াছে ; জিদও তাহার বেশি। সবাই বলে, ছেলেটা নাম রাখিবে গাঙ্গুলী মহাশয়ের। তাহার জিদে আব্দারে, চঞ্চলতায়, এমন কি, অস্থিরতার জন্যও তাহাকে সকলেরই ভালোবাসিতে হয়।

কিন্তু চিন্তাহরণই অধিক আকৃষ্ট করিল দেবপ্রসাদকে আর এক অপূর্ব কারণে। বাঙলা সাহিত্যে তাহার অনুরাগ যেন জন্মগত। সে পড়ে, মুখস্ত করে 'গুপ্ত কবির' পদ্য। আবৃত্তি শিখিল বিশুদ্ধ উচ্চারণে। পিতাকে ধরিয়া আনাইয়া ফেলিল 'ব্রজাঙ্গনা', তারপর 'তিলোত্তমা', 'মেঘনাদবধ, 'বীরাঙ্গনা' ;—এই কাব্য নূতন বাহির হইয়াছে। এখানে দুই একজন মাত্র চোখে দেখিয়াছে। শিক্ষিতদের গোষ্ঠী ছাড়াইয়া তবু এই সবের গল্প, মাইকেলের নাম—এখন অন্য বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছে। একটা সোরগোল পড়িয়াছে বাঙলা জানা পণ্ডিতদের মধ্যে ও ইংরাজী জানা শিক্ষিত সমাজে। এতদিন বনমালী চট্টোপাধ্যায়ের গৃহেই এইসব আলোচনা হইত। কিন্তু এখন সে আলোচনা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরাও করেন। সেখানেও তর্ক হয় অমিত্রাক্ষর ছন্দ লইয়া, ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কি তুলনা হয়?

বালক চিন্তাহরণ দেবপ্রসাদের সেই কাব্যানুরাগের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। চিন্তাহরণ তাহার স্নেহের শূন্য স্থানটিতে আসিল এই সূত্রে।

দেবপ্রসাদের বিস্ময়—কোথায় চিন্তাহরণ পাইল এমন বোধশক্তি? ব্রজাঙ্গনা কাব্যে সেও মুগ্ধ, তিলোত্তমা কাব্যও সে পড়ে। তাহা শেষ করিয়া লইয়া বসে 'মেঘনাদবধ' কাব্য। দেবপ্রসাদকে সসংকোচে ধরে—গাঙ্গুলী মহাশয় বলিয়াছেন, 'ওসবের অর্থ করিবে দেবপ্রসাদ':

বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি। ডাকি আবার তোমায় শ্বেতভুজে
ভারতি। যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া
বাল্মীকির রসনায়, (পদ্মবনে যেন),
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চ-বধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা;
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর সতি।
তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা। কবির চিত্ত-ফুলবন মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

ইহার কি অর্থ করিবে দেবপ্রসাদ? অর্থ সে করে। কিন্তু বনমালী চট্টোপাধ্যায় তাহাকে নূতনতর ভাবরাজ্যের বার্তাও দিয়াছিলেন। তাই শব্দার্থের বাহিরের আরও একটা অদ্ভুত ভাব-মণ্ডিত অর্থ দেবপ্রসাদের অন্তর মধ্যে উথলিয়া উঠে। এ কোন্ রাজ্যে সে প্রবেশ করিল,—এ কোন্ দেশ? দেবপ্রসাদ রসানুভূতিতে, নূতন চেতনায় চমকিত হয়। কে যেন তাহার জন্য নূতন এক স্বপ্নস্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিতেছে। আর শুধু তাহারই নয় এই মোহ, রসতন্ময়তা। না, বনমালী চট্টোপাধ্যায়েরও শুধু একান্ত অধিকার নাই এই কাব্যজগতে। আরও অনেককে তাহা আজ স্পর্শ করিতেছে। এই চিন্তাহরণ,—বালক

এখনো সে,—কেমন করিয়া সে বুঝে এই নূতন বাগ্বাণীর গাম্ভীর্য-মাধুর্য—পাণ্ডিত্য যদি বা সে না বুঝুক মধুসূদনের। দেবপ্রসাদ চমৎকৃত-চিত্ত। কি শুনিতেছে সে? কলিকাতায় 'মেঘনাদবধ কাব্যকে' পারিতোষিক দিয়াছেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভার' কালীপ্রসন্ন সিংহ—যিনি পণ্ডিতদের টিকি টাকায় কিনিয়া দামের টিকিট মারিযা রাখেন দেয়ালে কাগজের বোর্ডে,—হাসিয়া খুন এখানেও তাই 'উন্নতিশীল' দলেব বৈদ্য কায়স্থরা।—কিন্তু সেই কালী প্রসন্ন সিংহই মহাভারত অনুবাদ করান আবাব পণ্ডিতদেব দিয়া। ওদিকে কেশব সেনকে ঘিরিয়া আবার ধর্মের কী উন্মাদনা। এখানে পর্যন্ত সকলকে মাতাইযা গেল সেদিন ব্রাহ্ম বিজযকৃষ্ণ! দেশে বুঝি একটা অদ্ভুত জোয়াব আসিতেছে। এত বিদ্রোহ, এত উগ্রতা, আবার তাহারই পার্শ্বে এত আবেগ প্রবণতা,—সমাজে ধর্মে এত জিজ্ঞাসা, পিপাসা, সংস্কারের প্রবল আগ্রহ; আবাব ইহারই পার্শ্বে নাটকে কবিতায, ভাষায-ভাবে, বীব-রসের, করুণ-বসের একি গঙ্গোত্রী-প্রবাহ! ইহাবই সঙ্গে দেবপ্রসাদ মিশাইয়া দেয় শ্বেতাঙ্গ নীলকরের বিরুদ্ধে মুখ ফুটিযা দেশেব অভিযোগ ঘোষণা, পল্লীব নিরীহ কৃষক ও ভদ্র গৃহস্থের সাহসী প্রতিবোধ প্রয়াস, আর সাবধানী কুশলী পা ফেলিয়া ইহারই মধ্যে সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় স্বাধীনতার মন্ত্রপ্রচার। এই স্বাধীনতার সতর্ক প্রয়াসের মধ্যে বুঝি সেই দুঃসাহসী ব্রাহ্মণ দেবনন্দন ওঝার বিস্মৃত কণ্ঠেব প্রতিধ্বনিও আসিয়া সঙ্গোপনে মিলিয়াছে। 'বঙ্গপ্রকাশে' লিখিতে লিখিতে সেই মন্ত্রপাঠও দেবপ্রসাদ শুনিতেছে।

সাহিত্যের এই নূতন আয়োজনেই বনমালী চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহ; তাঁহার দুঃখ এই পূর্ববঙ্গে নির্বাসনের জন্য। দেবপ্রসাদের মনেও সংশয় জাগিয়া উঠিত। তাহারা বড দূরে,—বহু দূরে—সেই ভাগীরথীর স্রোত হইতে; এই পূর্ববঙ্গে পদ্মাপারে তাহারা বড় দূরে।

কিন্তু শান্ত ভাবুক হৃদয় চিন্তাহরণ তাহার গ্রন্থ লইয়া, আগ্রহ লইয়া আসিয়া ঠিক এই সংশয় ছেদন করিয়াই দেবপ্রসাদের চিত্তের উপকূলে দাঁড়াইল নূতন আশ্বাসের মত।দেবপ্রসাদেরও মনের মধ্যে একটি দুয়ার সে খুলিয়া দেয়। সে বুঝি ভবিষ্যৎ দেখিতেছে।

দেবপ্রসাদ পুলকিত হয়, পীতাম্বর গাঙ্গুলী গর্বিত হইয়া উঠেন।—চিন্তাহরণ নিজেও পদ্য রচনা করিতেছে। সে হয়ত দেখাইত না, কিন্তু গিরীশ সগৌরবে দাদার সেই কীর্ত্তি চৌধুরী খুড়ার সামনে আনিয়া ধরিয়াছে।

"শতদল"

তোমারে দেখিয়া ফুল ব্যাকুল মরাল কূল
সরসিনী জলরাশি টল-টল-টল।
আকাশে মেলিয়া বুক দেখিলে কাহার মুখ
ভারতীর পদতলে তুমি টল-মল॥
আমার অবোধ মন পুলকেতে নিমগন,
সরস হরষ রাশি ফুল তব হেরি।
এমনি হৃদয় দল খুলিয়া এ শতদল
ভারতীর পদতলে দিতে যেন পারি।"

দেবপ্রসাদ মুগ্ধ—স্নেহাবেশে, স্বপ্নাবেশে। বনমালী চাটুজ্যের নিকট সে চিন্তাহরণকে ধরিয়া লইয়া যায়। এই কূলেও জোয়ার আসিতেছে।

এক নূতন উদ্দীপনায় বনমালী চট্টোপাধ্যায়েরও মন এরবার দুলিয়া উঠে। এইখানে—এই সুদূর পূর্ব বাঙলায়—তিনি নিজেকে নির্বাসিত প্রায় না ভাবিয়া পারেন না। তাঁহায় জন্মভূমি ভাগীরথীর দুইকূলে সৃষ্টির চাঞ্চল্য তিনি অনুভব করিতেন, সেখানে এখন তাহা দুকূল ছাপাইয়া উঠিতেছে।

ভাবিতেন—এখানে তাহা কোথায়? ইহাঁরাও সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন; নাটক লিখেন; কাব্য রচনা করেন। কিন্তু সবই যেন মোটা সুরে বাঁধা, অক্ষমের ব্যর্থ প্রয়াস। অথচ নীতি-বায়ুগ্রস্ত শিক্ষিত ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিশিতেও বনমালী বাধা পাইতেন। তাহারা যেন সবাই রসলেশ-শূন্য; দেশের সভ্যতা, আদর্শও চিনে না। তাঁহার দিন কাটে গ্রামে গ্রামে—শিক্ষা পর্যবেক্ষণ। দেবপ্রসাদকে তিনি প্রথম স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতেন। ভাবিতেন —ইংরেজি সামান্য জানায় লোকটি সাহিত্যের অন্তস্থলে এতদিন প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা আছে, শক্তিও সে সঞ্চায় করিতেছে। বনমালী তাহাকে পাইলে একটু তৃপ্তি বোধ করেন। নির্বাসনের দুঃখভার যেন লঘু হয়। মনে করিতেন—লোকটা বাঙালদের মধ্যে একটু ব্যতিক্রম। চিন্তাহরণের রচনা শুনিয়া তিনি আজ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সত্যই কি এই দেশেও সাহিত্য তৃষ্ণা দেখা দিতেছে?

অথবা, কোথাও বুঝি বাধা নাই—ভাবের এই নবগঙ্গা একালে বুঝি সকল খাতেই বহিয়া যাইবে—সহস্র-ধারায় পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে;—সকল বাঙালীকেই উদ্ধার করিতে আসিতেছে বাঙালীর বিধাতা। নূতন সভ্যতার শঙ্খধ্বনিতে জাগিতেছে নূতন গঙ্গা।

দেবপ্রসাদের হৃদয় দুলিয়া উঠে। আনন্দ এক সুদূর আশ্বাসে রূপগ্রহণ করে—নবগঙ্গা! এই ত বাঙালীর নবগঙ্গা আজ নামিতেছে মহেশ্বরের জটাজাল ছাড়াইয়া। তাহাদের পরিণত জীবনেই শুধু নয়—আগামী দিনের কিশোর মনেও আজ যখন সেই পুণ্যধারার জন্য এমন পিপাসা, তখন বুঝি কাহারও আর সাধ্য নাই রোধ করিতে পারে—নব ভাবের এই ভাগীরথী স্রোতঃ।

নামিল বুঝি বাঙালীর জীবনে নবগঙ্গা! শক্তি নাই, না হইলে দেবপ্রসাদ আজ রচনা করিত এই নব 'গঙ্গা-স্তোত্র'।

৮

পীতাম্বর গাঙ্গুলী গর্বিত মনে পুত্রদের তাঁহার ব্রহ্মোপাসনার সভায়ও ডাকিয়া লন। সুশিক্ষা দিতে হইবে তাঁহার পুত্রদের, তিনি 'উন্নতিশীল' মানুষ। 'ইহাদের মনেও উন্নত চিন্তার বীজ বপন করিতে হইবে', এই কথা ঠিকই বলিয়াছে দেবপ্রসাদ। তাহারা নূতন কথা শোনে দেবপ্রসাদের মুখে; সংবাদ পত্র পড়িয়া তাহাদের তাহা না বলিলে যেন দেবপ্রসাদেরও চলে না। এদিকে প্রভাতে উঠিয়া প্রার্থনা করিতে বসেন পীতাম্বর গাঙ্গুলী—ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্। পুত্রদের ডাকিয়া সঙ্গে লন;—তারপর হইলেই হইল এক সময় সন্ধ্যা, গায়ত্রী জপ। উহা গতানুগতিক ব্যাপার, পীতাম্বর গাঙ্গুলীর নিজেরও তাহাতে বিশেষ আস্থা নাই। তিনি শিক্ষিত মানুষ, এক ব্রহ্মে বিশ্বাসী।

চিত্রিসার হইতে এই বায়ুমণ্ডলেই আসিয়া পড়িয়াছিল রাজীবও। চিন্তাহরণ, গিরীশের মত সে তত মেধাবী নয়, কিন্তু তাহাদেরই সহযোগী, বন্ধু; তাহাদেরই প্রয়াসে আগ্রহে আগ্রহান্বিত। বরং দৈহিক সাহসের কার্যে সে-ই আগাইয়া যায় সর্ব্বাগ্রে। সে দেহে সবল, নৌকা বাহিতে, দাঁড়িয়াবান্ধা খেলিতে, সমবয়স্কদের সমাজে তাহার জুড়ি নাই। কিন্তু আচরণে, চিন্তায় সে গিরীশ ও চিন্তাহরণের অনুগামী। তাহাদের মতে চলে, খেলে, ভাবে; তাহাদেরই মত মাসীমা তাহারও মাসী মা। দেবপ্রসাদ তাই নির্ভাবনা, রাজীবকে মানুষ করিতে আর অসুবিধা কোথায়? সে চিন্তাহরণের মত পদ্য লিখিতে না পারুক, গিরীশের

মত ইংরেজি বক্তৃতায় উৎসাহী না হউক, আছে সে তাহাদের সঙ্গে শিক্ষায় দীক্ষায় সর্ববিষয়ে উদ্যোগী। এই গৃহে সুসংসর্গে সে মানুষ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন আসিবেন, শহরের ব্রাহ্মরা ব্যস্ত। পীতাম্বর গাঙ্গুলী ও বসন্ত সরকার 'উন্নতিশীল' মানুষ, কিন্তু কেশবের অনুরাগী নন্। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষে কি না ব্রহ্মোপসানায় কেশবকে আচার্যের পদও দান করিলেন? ব্রাহ্মণ ছাড়া ব্রহ্মোপসনায় আচার্য? পীতাম্বর গাঙ্গুলী এইরূপ ব্রাহ্মধর্ম মানিবেন না। বসন্ত সরকারেরও উৎসাহ কম। ইংরাজীতে বাগ্মী কেশব সেন মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্যারী চাঁদ মিত্রের সঙ্গে জুটিতেছেন নাকি? কেন? দেবতারা সুরা পান করিত বলিয়াই না তাহারা সুর। বসন্ত সরকার ইংরেজি লিখিয়া পড়িয়া ঐরূপ অ-সুর হইতে চাহেন না। কিন্তু কেশব সেন যখন সত্যই এখানে আসিতেছেন তখন এই শহরে তাঁহারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবেন না, অভ্যর্থনা করিবে কে? ওই কয়েকটা উকিল, মাষ্টার, চাকুরে আর খৃষ্টান ফিরিঙ্গি? উহারা কি জানে অভ্যর্থনার? তাঁহারাই ত এখনকার শিক্ষিত মানুষ, নেতা; তাঁহারাই সম্বর্ধনা করিবেন।

পীতাম্বর গাঙ্গুলী উৎসাহ দেন চিন্তাহরণকে—ব্রহ্মানন্দকে স্বাগত করিয়া পদ্য লিখিতে হইবে। পীতাম্বর গিরীশকে আরও বেশি উৎসাহ দেন, না হইলে গিরীশ অভিমান করিয়া গোল বাধাইবে,—'তোমাকে আবৃত্তি শিখাইয়া দিবেন ইংরেজি পদ্য—কলেজের প্রফেসররা।'

"Tell me not in mournful numbers.
Life is but an empty dream."

বনমালী চট্টোপাধ্যায় কেশব সেনের সম্বর্ধনায় মোটেই উৎসাহ বোধ করেন না। ইংরাজী সাহিত্যে তিনি মুগ্ধ; কিন্তু তিনি চান বাঙলা সাহিত্যের জাগরণ। কেশব বাবুরা সে বিষয়ে আগ্রহ-হীন। দেবপ্রসাদ চিন্তাহরণের কবিতা তাঁহাকে শুনাইতে যায়। ভয়ে ভয়ে চিন্তাহরণ পড়ে—'আহ্বান।'

পূরব আকাশ আজ পরিছে নূতন সাজ
নূতন আশার বাণী লিখিল তপন।
পদ্মাবতী মেঘনাদে আনিলে কে শঙ্খনাদে
মহেশ্বর-জটামুক্ত জাহ্নবী জীবন?
এসো,এসো ব্রহ্মানন্দ পূর্বদেশ ছিল অন্ধ,
খোলো খোলো, খোলো তার বদ্ধ চক্ষুদ্বয়।
অন্ধকারে দেহ আলো মৃত্যুতে অমৃত ঢালো,
ব্রহ্ম নাম দেহ বাঁটি,—জয় জয় জয়।

পীতাম্বর গাঙ্গুলী গর্বিত। তাঁহার ছেলেরাই কেশব সেনের অভিনন্দনে পদ্য পাঠ করিবে, ইংরেজি পদ্য আবৃত্তি করিবে। আর কাহার ছেলের সাধ্য লিখে এমন 'আহ্বান'?

ব্রাহ্ম কর্তারা কিন্তু বলিলেন, ওই শঙ্খ, মহেশ্বর, জটা, জাহ্নবী ওসব পৌত্তলিক শব্দ চলিবে না।

ভাবিয়া চিন্তিয়া চিন্তাহরণ কাটিয়া লিখিল—

পদ্মাবতী মেঘনাদে ডাকিল কে ব্রহ্মনাদে
বঙ্গভূমে জাগাইল একের সাধন।

বনমালী চট্টোপাধ্যায় শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন তাই ত খাশা অ-পৌত্তলিক পদ্য হইয়াছে। বাইবেলের মত হইলে আরও ভাল হইত। বঙ্গদেশটাকে ব্রহ্মদেশ করিয়া ফেল না? এইভাবে মিল দাও।

গঙ্গা জল অপবিত্র, পূত শুধু ব্রহ্মপুত্র,
বঙ্গদেশ নাম কাটি 'ব্রহ্মদেশ হন।

কিন্তু পীতাম্বর গাঙ্গুলী তাহাতে কর্ণপাত করেন না। আসল কথা, তাঁহার ছেলেরাই পদ্য লিখিতে পারে, ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে। উৎসাহভরে তিনি কেশবের সম্বর্ধনায় অগ্রবর্তী হন। তাহাকে ছাড়া কোন্ কাজ হইতে পারে এই শহরে ?

এই বন্ধু গোষ্ঠীতে রাজীবই একটু পিছনে পড়িবার মত। দুই বন্ধুর সঙ্গে সেও সব কিছুতেই আছে। তাহা ছাড়া পীতাম্বর গাঙ্গুলী তাহাকে রাখিলেন অন্য কাজের জন্য। দেবপ্রসাদের ছিল লেখাপড়ার দিক; সে সংবাদপত্রে লিখিবে। রাজীব ছুটিবে, দেখিবে, 'গাঙ্গুলী জ্যেঠা মহাশয়ের' হুকুম মত যেমন হয় কাজ করিবে।

সপুত্রক পীতাম্বর গাঙ্গুলী ব্রহ্মানন্দের সভা-সমিতি, উপদেশ প্রার্থনায় জমিয়া যান। দেবপ্রসাদকে বলেন: না হে, মানুষটার মধ্যে জিনিস আছে। দেবেন ঠাকুর লোক চিনেন।

শহর টল-মল। শিক্ষিত মানুষেরা অমন বক্তৃতায় ভাসিয়া না গিয়া পারে ? যাহাই বলুন বনমালীবাবু দেবপ্রসাদও ইহা স্বীকার করে। অদ্ভুত ইংরেজী, অদ্ভুত বাঙালা! অদ্ভুততর বক্তার ভাবৈশ্বর্যও আন্তরিক আবেগ। ইহার উপরে কেশবচন্দ্র যেদিন শহরের পথে কীর্তন লইয়া বাহির হইলেন—সেদিন সেই রূপ, সেই উৎসাহ, সেই আবেগ, অভাবনীয়! —পীতাম্বর গাঙ্গুলী ত জীবনে এমন কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

দেবপ্রসাদও নীরবে সসংকোচে, সব ব্যাপারে যোগদান করিতেছে। তাহার হৃদয়ও মথিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মুখে সে নির্বাক। সে ভাবিয়াছে এ কালে—চৈতন্যের পরে—বুঝি বাঙালীর হৃদয় গঙ্গায় আবার ভক্তিধর্মের বান ডাকিতেছে।

ধর্মের ও ভক্তির প্লাবনও বুঝি এখন বহিবে। অবশ্য বনমালীবাবু তাহা মানিবেন না। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তিনি বিরূপ। উহারা নিজের সমাজ সভ্যতায় আস্থাহীন, এমন কি জাতীয় অভিমানও তাহাদের নাই। কিন্তু দেবপ্রসাদ তাহা যথার্থ মনে করে না। একটা নূতন স্রোতেই দেশ ভাসিতেছে, শিক্ষা সাহিত্য ধর্মও সবই আসিয়া পড়িবে এই জীবন গঙ্গায়। ব্যাকুল হইবার মত হৃদয়ের শক্তি, ভক্তির আবেগ, দেবপ্রসাদের নাই। ধর্ম বলিতে সে বুঝে সহজ ভক্তি, যুক্তি, সদাচার। তথাপি সে মানে ধর্মই জীবনে সর্বাপেক্ষা মহৎ অবলম্বন। নিজে সে তত্ত্ববোধনী ও অক্ষয়কুমারের শিক্ষা বিষয়ক লেখা পাঠ করিয়া প্রথম জ্ঞান লাভ করিযাছে। এখন বনমালী চাটুজ্যের সাহচর্যে আর এক রসলোকের সন্ধান সে পাইতেছে; সেখানে ধর্মের এই উন্মাদনা নাই। কাব্যও ও সাহিত্য দেবপ্রসাদকে টানিয়া লইতেছে, ধর্মের গৌরব তথাপি সে মানে। তাই সে আশ্বাস পায় এই নব ধর্মান্দোলনের শক্তি ও পবিত্রাতেও। জাতীয় জাগরণেরই তাহাও একটা রূপ: সৈনিক বিদ্রোহ নয়, নৈতিক বিদ্রোহ।

কিন্তু ব্রাহ্ম কর্তারা বলেন—ব্রিটিশ শাসন বিধাতার বিধান। বিধাতার উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে ব্রিটিশ শাসনের শুভ প্রসারে। ভিক্টোরিয়ার রাজ্যভার গ্রহণ—ভারতবর্ষীয়দের পরম সৌভাগ্য। কেশবচন্দ্রেরও নাকি ইহাই অভিমত।

দেবপ্রসাদ ইহাতে বাধা পায়, ইহা ত সেই 'কোম্পানির দোহাই!' কোম্পানির স্থলে শুধু এখন আসিতেছে ভিক্টোরিয়া।

বনমালী চট্টোপাধ্যায় বিমর্ষ হাস্যে বলেন: দাসত্ব আমাদের মেদে-মজ্জায়, দেবপ্রসাদ।—তারপর আবার বলেন: বহু দেরী আছে, চৌধুরী, এ জাতির জাগরণের। ততদিন প্রাণটুকু বাঁচাইয়া রাখিতে

হইবে। সাহিত্যে তাহা একটু-একটু ধুক্‌ধুক্‌ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাকী অঙ্গ অসাড়। আগে প্রাণ ত বাঁচুক, তারপর স্বাধীনতা।

দেবপ্রসাদ ইহাও অস্বীকার করিতে সাহস পায় না। কিন্তু নিজের অন্তরে চমকিয়া উঠে। কোথায় একটা প্রশ্ন জাগিয়া থাকে। 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে ?' মনে পড়ে দেবনন্দন ওঝার কথা—কতকাল এই কালনিশা অক্ষুণ্ণ রহিবে ?

৯

পীতাম্বর গাঙ্গুলীর গৃহে ব্রহ্মোপসানা খুব জমিতেছিল। উপাসনার পূর্বে বা পরে মদ্য-পান পূর্বে তাঁহার নিয়ম ছিল। কেশবচন্দ্রের আগমনের পরে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিযা তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। মদ খাইতে হয় অন্য সময় খাইবেন। আব তাহাও অত বেশি খাওয়া কেন ? এই নূতন নিয়ম ভঙ্গ হইল না ; কারণ পুত্ররা ক্ষুব্ধ হইত। হয়ত গিরি ঠাকুরাণীর সুশাসনেই মাত্রা কমিতেছিল, তাহা আর বাড়িতে পারিল না। কিন্তু উপাসনায়ও ক্রমশঃ ভাটা পড়িল।

দেবপ্রসাদের হৃদয়ে তখনকার ভাব-প্লাবনে যে আলোড়ন উঠিয়াছিল তাহা ক্রমে কমিল। কিন্তু একেবারে থামিল না। সেই জোয়ার কিন্তু উজান বাহিতে লাগিল যুবকদের মনে। বিশেষ করিয়া আবার তাহাদেরই মধ্যে অগ্রগণ্য যাহারা বিদ্যায, বুদ্ধিতে, এবং চরিত্রে তাহাদেরই প্রাণে ;—চিন্তাহরণের, গিরীশের, রাজীবেরও। কেশব সেনের আগমনে তাহারা এক নবীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইল ; জীবনে একটা লক্ষ্যের সন্ধান তাহারা লাভ করিয়াছে। চিন্তাহরণ ভক্তি-মূলক গ্রন্থ পাঠ করিয়া বেশি

তন্ময় হইতে চাহে। গিরীশ ইংরেজি লেখা ও বক্তৃতা করার উৎসাহে মুখর। আর রাজীব তাহার সঙ্গে সঙ্গে আছে—উপাসনাও করে, বক্তৃতাও শোনে, দশজনের সঙ্গে আগাইয়া গিয়া একটা সুনীতি সমিতি ও কর্মীমণ্ডলীও গড়ে, আবার খেলায়ও সে তেমনি উৎসাহী। দেবপ্রসাদ তাহাতে কিছুই আপত্তি দেখিল না।

স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও নীতিগত শিথিলতার এতদিন অভাব ছিল না। অশ্লীল গান, ইয়ার্কিতে তাহারা পাকিয়া উঠে—গণিকালয়ের সহিত পরিচয় না থাকাটাই যুবকদের পক্ষে অস্বাভাবিক; তাহা হাসির ব্যাপারও। কিন্তু গিরীশ চিন্তাহরণ ও রাজীবের বিকাশোন্মুখ মন ঠিক এই যৌবনের সন্ধিক্ষণেই পাইল জীবনে এক নূতন আদর্শ,—ধর্ম, পবিত্রতা, সুনীতি। সমস্ত ছাত্র-সমাজের জীবন-যাত্রাই যেন তখন এই আদর্শের দিক মোড় ঘুরিতে লাগিল। গিরীশের ও রাজীবের মনে প্রচারকের উগ্র উদ্দীপনা, চিন্তাহরণও তাহাতে উৎসাহী: ছাত্র-সমাজকে তাহারা কেশবের পবিত্র আদর্শে গড়িয়া তুলিবে। দেবপ্রসাদ সর্বান্তঃকরণে তাহাদের মনে মনে আশীর্বাদ করে। স্বল্প কথায় এক আধবার মনে করাইয়া দেয় দেশের কথা, সমাজের কথা।—কত আশা জাতির তাহাদের নিকটে;—তাহারা সাহিত্য রচনা করিবে, সমাজ গঠন করিবে, দেশের দাসত্ব মোচন করিবে।—বালকেরা বিজ্ঞের মত গম্ভীর হইয়া উঠে শুনিয়া।

রাজীব অসুখে পড়িল। অসুখও আর কিছু নয়, একেবারে বসন্ত। নৌকা করিয়া তাহাকে চিত্রিসারে লইয়া যাইবার জন্য দেবপ্রসাদ যখন পীতাম্বর গাঙ্গুলীর সহায়ে ব্যবস্থা করিতেছে তখন চাকর পাঠাইয়া, দাসী পাঠাইয়া গিরি ঠাকুরাণী রাজীবকে সরাসরি একেবারে অন্দরে

লইয়া আসিলেন!—মায়ের দয়া হইয়াছে। তাই বলিয়া ছেলেটাকে বাড়ির বাহিরে করিয়া দেওয়া যায়?

পীতাম্বর গাঙ্গুলী দুই একবার দ্বিধাভরে বলিতে গেলেন: একেবারে বাড়ির ভেতরে লইয়া যাইবে? ভয়ে তাড়াতাড়ি আবার বলেন: এখানে বহির্বাটিতে থাকিলে দেবপ্রসাদও দেখিত শুনিত কিনা—

গিরিঠাকুরাণী রাগিয়া বলিলেন: ওখানেও তিনি দেখিবেন, বাধা কি? বরং আমরাও দেখিব, শুনিব, শুশ্রূষা করিব।

কাহারও আপত্তি তাঁহার নিকট টিকিবে না। গাঙ্গুলী মহাশয় খুশী হইলেন না,--কাহার রোগ কাহাকে ধরিয়া বসে ঠিক কি? কিন্তু বেশি বলিতে আর সাহস করেন না; চুপ করিয়া যান।

এই প্রথম দেবপ্রসাদ দেখিল গিরিঠাকুরাণীকে। আড়ালেই তিনি থাকেন। কিন্তু একই রোগীর শুশ্রূষায় দুই জন মানুষ কতটা আর পরস্পরের একেবারে অদৃশ্য হইয়া থাকিতে পারে? অবশ্য অমন কঠিন রোগের সেবাকালে কোনো শুশ্রূষাকারী রোগীর অপেক্ষা বেশি করিয়া ভাবিতে পারে না শয্যাপার্শ্বের অন্য সহকারীর কথা। দেবপ্রসাদ দেখিল অল্প, ভাবিল কিন্তু বেশী, এবং বুঝিল আরও অনেক বেশী। গিরিঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর, বুদ্ধি, ব্যবস্থা, কর্ত্রী সুলভ ব্যক্তিত্ব, আত্মীয়তার যত্ন স্পর্শ,—সব কিছু দেখিবার, লক্ষ্য করিবার আর শেষে ভাবিবার মতই। দেবপ্রসাদ ইহাও লক্ষ্য করিল—গাঙ্গুলী মহাশয়ের নাতি-গোপন ঈর্ষা এবং বিরক্তি ক্রমশঃ এই উপলক্ষে তাহার প্রতি জাগিতেছে। গিরিঠাকুরাণী রাজীবকে মায়ের মত প্রায় কোলে করিয়া বসিয়া থাকেন,—ইহাই ত একটা বাড়াবাড়ি। কিন্তু 'ছোট চৌধুরীর' সম্মুখেও তিনি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যান না—এমন কি, নিকট কুটুম্ব দেবপ্রসাদ? কথাগুলি দেবপ্রসাদের

কানে যায়। এ কি বলেন গাঙ্গুলী মহাশয়! লজ্জায় সংকোচে দেবপ্রসাদ মাটিতে মিশাইয়া যাইত। কিন্তু দেবপ্রসাদ একটু পরেই বুঝিল পীতাম্বর গাঙ্গুলীর কেন এই ক্ষোভ।

সহজভাবেই গিরি ঠাকুরাণী গাঙ্গুলী মহাশয়ের শহরের বাসাবাড়ির ভার গ্রহণ করিয়াছেন—যেন ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই সুবিদিত কথা; তিনি ছাড়া কে গিরীশকে দেখিবে, চিন্তাহরণকে দেখিবে? আর গিরীশ ও চিন্তাহরণের দায়িত্ব লইয়া তিনি যখন এখানে আসিয়াছেন, তখন গাঙ্গুলী মহাশয়ের এই প্রবাস-জীবনের দায়িত্ব তিনিই যে গ্রহণ করিবেন, তাহাতেও কোনো সন্দেহ নাই।

দশ বৎসর পূর্বে গিরীশ চিন্তাহরণের 'মাসী মা' রূপে গিরিবালা নন্দীগ্রামে প্রথম আসিয়া তাহাদের পালন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আসলে গিরীশ তখনো জন্মে নাই। দুর্গা তাহার জন্মের পূর্ব হইতেই পীড়িতা, চিন্তাহরণের ভার গ্রহণ করিবার জন্য সে-ই দিদিকে আনায় নন্দীগ্রামে। নিঃসন্তনা গিরিবালা নয় বৎসর বয়সে 'গৌরী' হইয়াছিলেন; এগারো বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে ফিরিয়াছিলেন—আর স্বামীগৃহে যান নাই। বৎসরখানেক পূর্বে দুর্গারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে; অতএব, কপাল যখন ভাঙিল গিরিবালাকে আর মা কাছছাড়া করিতে চাহেন নাই। তাঁহার সংসারে অভাব নাই। পুত্ররা বহু সমাদরে তাহাদের ভগ্নীকে কর্ত্রীত্ব ভার অর্পণ করিয়া রাখিবে। শীঘ্রই বধূরা সংসারে আসিবে; গিরিবালার পরিচালনায় স্বামী-পুত্র লইয়া বরাবরের মত সংসার করিবে। ক্ষেত হইতে ফসল আসিবে, বাগান হইতে শাক-সব্জী ফলমূল আসিবে, পুকুর হইতে আসিবে মাছ;—প্রজা-রায়তেরা খাজনা দিবে, 'বাবু বাড়ির' কাজ করিবে, পূজা-পার্বণ সবশুদ্ধ ঘোষালদের সংসার চিরন্তন নিয়মে

চলিবে,—গিরিবালা রহিবে সেই পিতৃগোষ্ঠীর সংসারে কর্ত্রী। কর্ত্রী হইবার মতই তাঁহার কর্মকুশলতা ও বুদ্ধিবিচার।

সব ঠিক চলিয়াছিল। জমিজমা খাজনা-বাজনা সব ঠিক চলিয়াছে। ভাইদেরও বিবাহ হইল, বউরা ঘরে আসিল, সন্তানও হইল একজনার। কিন্তু তারপর গিরিবালার মাতৃ-বিয়োগ হইল, আর গিরিবালা যাহা বুঝিতেছিলেন তাহাই ঘটিল।—ভ্রাতার সংসারে কর্ত্রীত্ব করা আর তাহার সম্ভব হইবে না। কোনো কালে কর্ত্রীত্ব না করিলে গিরি ঠাকুরাণীর পক্ষে এই অবস্থা পিতৃগৃহে অসহনীয় হইত না। কিন্তু যেখানে কর্ত্রী বলিয়াই তাঁহার পরিচয়, সেখানে আশ্রিতরূপে নিজেকে স্বীকার করিতে গিরি ঠাকুরাণী কিছুতেই পারিবেন না।—সে অমর্যাদা তাঁহার অসহ্য। অবস্থাটা দুর্গা জানিত; দিদির হইয়া বউ ঠাকুরাণীদের বিরুদ্ধে দুই-একবার সে ভাইদের নিকট নন্দীগ্রাম হইতে শর নিক্ষেপও করিল। প্রথম দিকে তাহাতে ফলোদয় হইল। কিন্তু পরে আসিল রূঢ় ভর্ৎসনা।—'তুমি এই সংসারের কিছুই অবগত নহ। কেন অযথা কথা বলিতে আইল? কোনো দিন ত জানো নাই গিরিবালারও ঔদ্ধত্য।' দুর্গা ক্ষুব্ধ হইল, তাহার অপমান বোধ হইল। শুনিয়া গাঙ্গুলী মহাশয়েরও অহঙ্কারে লাগিল। তিনিও রুষ্ট হইলেন। যৌবনের প্রবল কর্মপ্রেরণায় তিনি তখন সর্বদা ব্যস্ত। ইংরেজী শিক্ষার এক-আধটুকু আস্বাদন লাভ করিয়া তিনি কৌলীন্য ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। গিরি ঠাকুরাণীকে তিনি একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন—একেবারে ভুলিয়া যান নাই। এখন তাই মনে-মনে ক্লেশ বোধ করিলেন, সেই রূপেগুণে শ্রীময়ী কিশোরী সংসারে এমন অবজ্ঞাত হইবেন? আহা, হিন্দু অবলার কি দুর্ভাগ্য! তিনি পুরুষ হইয়া—তাহার ভগ্নীপতি হইয়া—তাহার এই অপমান দূর

হইতে শুধু সহিয়া যাইবেন ? তবে তিনি কি জন্য ইংরেজী বিদ্যালাভ করিয়াছেন ?

দিদিকে দুর্গা সসম্মানে লইয়া আসিল আপনার সংসারে ! চিরদিন সে বাড়ির কনিষ্ঠা ; তাহার এত বড় সংসারে, কন্যা, দিদির মত একজন যোগ্য গৃহকর্মীর আশ্রয় লাভ করিয়া সে আশ্বস্তবোধ করিতে পারিবে। দিদিই হইবেন চিন্তাহরণের বড় মা।

কিন্তু সেই পরিচয় দুই বৎসর মধ্যে মুছিয়া গেল নন্দীগ্রামের গাঙুলী বাড়িতে। গিরি ঠাকুরাণী চিন্তাহরণের 'বড় মা' হইতে গিরীশের 'মাসী মা' হইয়াছিলেন যথানিয়মে, যথাকালে। তারপর হইলেন চিন্তাহরণেরও 'মাসীমা।' আর শেষে বাড়ির সকলের 'মাসী মা' ;—কেবল দুর্গার নিকট 'দিদি', গাঙুলী মহাশয়ের নিকট 'গিরিঠাকুরাণী'।

গিরি ঠাকুরাণী দেখিলেন,—গাঙুলী মহাশয় উদার হৃদয় পুরুষ। আপন সংসারে তিনি গিরিবালাকে সুমুচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে কোথাও ক্রটী রাখেন নাই। এই সদাব্যস্ত পুরুষ নানাভাবে খোঁজ করেন—গিরি ঠাকুরাণীর কোথাও কোনো অসুবিধা হইল কিনা। নানা উপলক্ষে জানান : ঢেঁকি স্বর্গ গেলেও ধান ভানে, বুঝিলেন ত গিরি ঠাকুরাণী। আসিলেন বোনের বাড়িতে একটু স্বস্তি পাইবেন। কিন্তু স্বস্তি থাকুক, সমস্ত সংসারটা ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া বোন্ নিশ্চিন্ত হইয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন, দেখুন।

গিরিবালাও বাক্‌পটু। তবে প্রথম প্রথম রসনা সংযত করিয়া অবগুণ্ঠন-মধ্যে নীরবে হাসিতেন। ভগ্নীর সাহায্যে কিম্বা কোনো দূর কুটুম্বনীর সাহায্যে অনুচ্চ কণ্ঠে পরিহাসের উত্তর দিতেন পরিহাস করিয়া। বলিতেন :

বোন্ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভগ্নীপতি বোধহয় নিশ্চিন্ত

হইতে পারিতেছেন না—সংসারটা অযোগ্য হস্তে পড়িতেছে, সব যাইবে।

অবগুণ্ঠন অবশ্য ক্রমে হ্রস্ব হইয়া আসিয়াছে; মধ্যস্থের ও অভাবে উত্তর-প্রত্যুত্তর বন্ধ হইয়া থাকে না। সসম্মানে গাঙুলী মহাশয় পরিহাস করেন: গিরি ঠাকুরাণী, বড় বিপদেই পড়িয়াছেন।

গিরি ঠাকুরাণীও উত্তর করেন: তাহাই মনে হয় বুঝি? দেখুন, গাঙুলী মহাশয়, শেষ পর্যন্ত কি গিয়া কি থাকে।

যাহা খুশী যাউক, আপনি ত রহিয়াছেন। তাহা হইলে আমার ভাবনা নাই। খাই-দাই, হৈ-রৈ করি এখন শহরে,—না হইলে এক পা বাহির হইতে পারিতাম! সর্বদা মন পড়িয়া থাকিত এইখানে—কি হইল, কি হইল।

পীতাম্বর গাঙুলী মিথ্যা কথা বলেন নাই। কিন্তু গৃহ সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে তিনি পারেন না। গৃহিণী পীড়িতা। আজ একটু সুস্থ, কাল আবার শয্যাশায়িনী; কবিরাজ বৈদ্যের তাই ব্যবস্থা করিতে হয়। দুইটি অপপোগু শিশু সংসারে। অন্যদিকে তিনি শিক্ষা প্রসারে উৎসাহী, সমাজের উন্নতিবিধান করিতে চাহেন। তাঁহার কি এক মুহূর্তও সময় মিলিত সেই সব কাজে যদি এমন কর্মকুশলা গিরি ঠাকুরাণী আসিয়া দুর্গার পরিচর্যার ও শিশুদের পালনের ভারগ্রহণ না করিতেন? তিনি মুগ্ধ হইয়া দেখেন—গিরি ঠাকুরাণীকে। আশ্চর্য তাঁহার রূপ ও গুণ। অনুভব করেন তাঁহার সেবা-কুশল হস্তের সযত্ন স্পর্শ নিজের চারিদিকে—বসনে-ভূষণে, আহারে-বিশ্রামে। তাঁহার আপন গৃহে-সংসারে সকল কর্মে একটা শ্রী ও ছন্দ দান করিয়াছেন এই রমণী। তাঁহাকে না হইলে কাহারও চলে না।

গিরি ঠাকুরাণী, সেই কাগজের তাড়াটা কোথায় রাখিয়া

গিয়াছি বলিতে পার?—নিরামিষ রন্ধন গৃহের দ্বারে দাঁড়ান পীতাম্বর।

উনুনের সম্মুখস্থ রক্তাভ মুখ তুলিয়া গিরি ঠাকুরাণী বলেন: কোন্‌টা?

'সংবাদ প্রভাকর' গো।

ওঃ! তাহাতে কাগজের নৌকা তৈরী করিয়া দিয়াছি চিন্তাহরণকে।

সংবাদ প্রভাকর দিয়া?

হাঁ। কেন? ক্ষতি হইয়াছে? —গোপনে হাসিতে গিরি ঠাকুরাণীর মুখখানা আরও উজ্জ্বল হয়।

না। না। কিন্তু,—কি বলিতে আসিয়াছিলেন পীতাম্বর গাঙ্গুলী ভুলিয়া যান। ফিরিয়া যাইতে-যাইতে তাহা মনে পড়ে। আবার তাই ফিরিয়া আসেন।

গিরি ঠাকুরাণী!

কে? ওমা! তুমি যাও নাই, গাঙ্গুলী মহাশয়?

গিয়াছিলাম।—এবার পীতাম্বর গাঙ্গুলীর চোখে ধরা পড়িয়াছে গিরিঠাকুরাণীর চোখের হাস্যচ্ছটা। অমনি তিনি বলেন: গিয়াছিলাম। কিন্তু শুনিলাম তুমি ডাকিতেছ।

আমি ডাকিতেছি?

হাঁ।

কখনো না।

'না' বলিলে হইবে কেন? আমি শুনিয়াছি।

তোমার কান খারাপ হইয়াছে, গাঙ্গুলী মহাশয়।

সম্ভবত। তাই এখন চোখ দিয়া শুনি—মন দিয়া শুান।

চটুল গিরি ঠাকুরাণী বলিয়া ফেলেন: সে ত শুনিতে হয় মনের কথা — শুনিতে পাও কি তাহা?

পাই না? প্রমাণ চাও।—দৃষ্টিটা চটুলতায় উছলিয়া পড়িতেছে।

কিন্তু গিরি ঠাকুরাণী আর দাঁড়াইলেন না—মুখ উনুনের দিকে ফিরাইয়া লইলেন। দৃঢ় কণ্ঠ বলিলেন: না।

পীতাম্বর গাঙ্গুলীও হতবুদ্ধি হন। কেমন বিমূঢ় হইয়া ক্রমে গাঙ্গুলী মহাশয় চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যায় দুর্গা বলিল: 'সংবাদ প্রভাকরে' তোমার যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে দুপুর বেলা দিদি তাহা পড়িয়া শুনাইলেন।—তাহার চক্ষে উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতা। স্বামীর পাণ্ডিত্যে প্রতিষ্ঠায় সে গর্বিত।

পড়িয়াছ? কেমন লাগিল? গিরিঠাকুরাণী কি বলিলেন?—পীতাম্বর গাঙ্গুলী জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। পরে বলিলেন: আরও একটা চিঠি লিখিতেছি—বলিও গিরি ঠাকুরাণীকে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সমর্থন করিব। কিন্তু উহারা ছাপিতে চাহে না।

বিধবা বিবাহ? দুর্গা উত্তর দেয় না, চুপ করিয়া শোনে।

তাহার পরে?—গিরি ঠাকুরাণী স্পষ্ট করিয়া সব ভাবিতে পারেন না। অস্পষ্টতার কুয়াসায় আপনাকে তিনি অনেকদিন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুর্গা একটু রোগমুক্ত হইল, কিন্তু কিছুতেই ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় না। তাই ত গাঙ্গুলী বাড়ির বৃহৎ সংসারের কর্ত্রীত্ব গিরি ঠাকুরাণীর হাতে রহিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীও তাহা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তিনি জপতপ করিতে চাহেন, তীর্থধর্ম করিতেই তাঁহার বাসনা—শুধু বধূমাতা সারিয়া উঠিবার অপেক্ষা। ততদিন গিরি সংসার দেখিবে; কর্ত্রী হইবার জন্যই জন্মিয়াছিলেন গিরি ঠাকুরাণী, যেখানেই যান তাঁহার যোগ্যতার জন্য আপনা হইতেই কর্ত্রীত্বভার তাঁহার হাতে আসিয়া পড়ে। কেহ তুলিয়া দেয় না,—আসিয়া যায়। যেমন, চিন্তাহরণের বড় মা হইতে লিয়া আপনা হইতেই

তিনি গিরিশের মাসী মা হইয়া পড়িয়াছেন—ইহাও তেমনি। চিন্তাহরণই বরং সে তুলনায় তাঁহার দূর হইয়া পড়িয়াছে, গিরীশ দাদাকে 'মাসী মায়ের', স্নেহ-ক্রোড হইতে চ্যুত করিং। আপনি সেই ক্রোড় দখল করিয়া ব সয়াছে—আর চিন্তাহরণ তাহা আপনা হইতেই মানিয়া লইয়াছে। এইরূপই আপনা হইতেই এই গাঙুলী বাড়ির আত্মীয়, পরিজন, কুটম্ব গিরি ঠাকুরাণীকেই কর্ত্রী বলিয়া মানিয়া লইয়াছে—অবশ্য যতদিন স্বয়ং দুর্গা স্বাস্থ্যলাভ করিয়া নিজের সংসার ভার নিজে গ্রহণ না করে। কিন্তু দুর্গাও যেন আপনা হইতেই মানিয়া লইয়াছে—এই ঝক্কি তাহার নয়; দিদিই কর্ত্রী।

গিরি ঠাকুরাণী বুঝিতে চাহিলেন—আপনা হইতেই ইহা ঘটিয়াছে। অন্তত তাহাই তিনি ভাবিতে চাহেন। না হইলে সবই যেন তাঁহার নিকট কেমন গুলাইয়া যায়,—কেমন অসহনীয় হইয়া উঠে। এই পৃথিবীতে এমন অভাবনীয়, অসম্ভব জটিলতা তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহা কে কবে কল্পনা করিতে পারিত? গিরিঠাকুরাণী তাই ভাবিতে চাহেন—সবই আপনা হইতে ঘটিতেছে।

দুর্গা আর সারিয়া উঠে না। চিন্তাহরণ যদি বা বড় হইয়াছে, গিরীশ যে মাসীমাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও থাকিতে চাহে না। মাসীমায়ের শয্যাপার্শ্বে না শুইলে সে ঘুমাইবে না। ঐভাবে না ঘুমাইতে কাহার সাধ্য তাহাকে দুর্গার পার্শ্বে আপন শয্যায় শোয়াইয়া রাখে? গিরি ঠাকুরাণী তাই গাঙুলী বাড়ি ত্যাগ করিয়া যাইবার কথা ভাবিলেও যাইতে পারেন না। আপনা হইতেই থাকিয়া যান।

কোথায় যাইবে আবার?—রোগশয্যা হইতে দুর্গা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

বাড়ি যাইব না?—গিরি ঠাকুরাণী সহজভাবে বলেন।

বাড়ি! সে ত মায়ের সঙ্গে শেষ হইয়াছে। এখন ত বড় বউএর বাড়ি। তুমি কোথায় যাইবে সেখানে?

তবে কি চিরদিন থাকিব নাকি—এইখানে?—গিরিঠাকুরাণী অশ্রুগোপন করিয়া হাসিয়া বলিতে চাহেন।

কেন থাকিবে না? উহা ভাই-এর বাড়ি। ইহাও বোনের বাড়ি।

গিরি ঠাকুরাণী দুর্গার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়েন, বলেন: সবই ঠিক। কিন্তু যাইতে ত হইবেই—একদিন।

না।—দুর্গা দৃঢ়ভাবে বলিল।—অন্তত আমি থাকিতে বলিব না। তুমি বড় বউএর গঞ্জনা সহিতে সেখানে যাইবে, ইহা আমি থাকিতে হইবে না।

গিরিবালা মাটির দিকে তাকাইয়া থাকেন। তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। সত্যই কি করিয়া সেই গৃহে তিনি আবার গিয়া দাঁড়াইবেন, বলিবেন: 'আমি তোনাদের আশ্রিতা, তোমাদের গলগ্রহ। দুই মুঠি অন্নের জন্য এই অপমান গ্লানি মাথায় বহিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাই।"

গিরিবালা তাহা পারিবে না। কিন্তু এইখানেই বা তিনি ভগ্নীর সংসারে থাকিবেন কোন্ দাবিতে? গিরিবালা জানেন—লোক-সমাজে সেই দাবি বড় তুচ্ছ। কিন্তু ইহাও তিনি অনুভব করেন—ইহার মধ্যে যথার্থই গঞ্জনা নাই। দুর্গা দিদিকে ছাড়িতে চাহে না,—গিরীশ চিন্তাহরণও মাসী মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না। সেই স্নেহের দাবী অসামান্য, মমতার বন্ধন ছেদন করা অসম্ভব। অথচ লোকে তাহা বুঝিবে না, গিরিবালা তাহা জানেন।

তবু গিরিবালা দিনে শতবার স্থির করেন—তিনি এই গাঙুলী সংসার হইতে ভ্রাতৃগৃহে ফিরিয়া যাইবেন। তিনি এই গৃহে সংসারে শুধু

জড়াইয়া পড়িতেছেন তাহা নয়। আপনার উপরও বিশ্বাস হারাইতেছেন। ভ্রাতৃবধূর গঞ্জনা থাকিলেও সেখানে ভ্রাতৃগৃহে লোক-গঞ্জনা স্পর্শ করিবে না, অপমান সহিত হইলেও সেখানে আত্ম-অবমাননার কারণ থাকিবে না। গিরিবালা না হয় সেখানে আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে নীরব মর্যাদায় একপার্শ্বে সরিয়া থাকিবেন, ভ্রাতৃবধূকে সংসারের কর্ত্রী বলিয়াই মানিয়া লইবেন। তাহাই শ্রেয়ঃ, তাহাই কর্তব্য।—রাত্রির অন্ধকারে গিরিবালা এই সংকল্পকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহেন।

শয্যাপার্শ্বে একদিকে চিন্তাহরণ—গিরিবালা তাহার মুখের দিকে তাকাইবেন না, তাকাইলে বুঝি এই সংকল্প শিথিল হইয়া যাইবে। অন্য পার্শ্বে গিরীশ, তাহার ক্ষুদ্র হাতটিতে মাসীমায়ের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিয়াছে—ক্রমে শিথিল হইবে। তবু ছাড়াইতে হইবে। কিন্তু ছাড়াইতে গিয়া গিরিবালা আর তাহা ছাড়াইতে পারেন না। বড় ভালো লাগে এই কচি হাত দুইটির স্পর্শ; বড় কোমল, বড় মধুর। গিরিবালা হাত দুইটি নিজের হাতে লইয়া অশ্রুমুখী হইয়া উঠেন। বুকের কাছে টানিয়া আনেন ঘুমন্ত সেই শিশু-দেহ, চাপিয়া ধরেন তাহা দুই বাহু দিয়া—আবার ছাড়িয়া দেন। এখনি নিদ্রাভঙ্গ হইবে বুঝি শিশু গিরীশের। সে কাঁদিয়া উঠিবে। গিরিবালা উপুড় হইয়া পড়েন শয্যায়, বালিশে মুখ গুজিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে থাকেন: "হে বিধাতা! আমাকে এইটুকু হইতে বঞ্চিত করিও না। বঞ্চিত করিও না। পৃথিবীর সব কিছু হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু এই শিশু-দেহের স্পর্শ,—এই মমতাটুকু—না পাইলে আমি বাঁচিব না। বাঁচিব না।"

গিরিবালার সংকল্প ভাসিয়া যায়। যাহা ঘটিবার ঘটুক।

প্রভাত হইতেই গিরি ঠাকুরাণী সংসার পর্যবেক্ষণে লাগেন।

চিরদিনের অভ্যাস মত কর্মে প্রবৃত্ত হন। তখন আর ভাবিবার অবকাশ পান না—ইহা নিষ্প্রয়োজন; এই সংসার, এই ঘর-দুয়ার, ইহার জন্য তাঁহার দায়িত্ব নাই, এই সবই নিরর্থক। আবার মনে হয় সবই তাঁহার প্রয়োজন—দুর্গার পথ্য-পাচন নিজ হস্তে তিনি না করিলে চলিবে না; গিরীশ ও চিন্তাহরণকে নিজ হস্তে স্নানাহার না করাইলে তাঁহার শান্তি নাই; গোয়ালে কোথায় গরুগুলির কি অবস্থা, ঢেঁকিশালে কি করিতেছে দাসীরা, প্রজাদের জোগানো মাছ-তরকারী ফলমূল কোথায় চাকর বাকরেরা কি ফেলিতেছে, কি না ফেলিতেছে—এই সব জিনিসই তাঁহার না দেখিলে নয়। আপনা হইতে গিরিবালা কাজে জড়াইয়া যান। আপনা হইতেই সব ঘটে।

তবু গিরিবালা অস্পষ্টভাবে বুঝিল—একদিন সে শুধু কর্ত্রীত্বের গৌরব দিয়া আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। ভাবিয়াছিল—ভাগ্য তাঁহাকে যতই বঞ্চনা করুক, এই গৌরব ও ক্ষমতার লৌহবর্মে আচ্ছাদিত হইয়া তিনি তাহা সহিয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু তিনি বুঝিতেছেন—গৃহকর্ত্রীত্বই যথেষ্ট নয়। বঞ্চিত মাতৃত্বের স্নেহ পিপাসাও তাঁহার অন্তরে কম দুর্নিবার্য নয়। গিরীশকে, চিন্তাহরণকে ফেলিয়া তিনি কোথায় যাইবেন—গিরিবালা তাহা ভাবিতে পারেন না। —কিন্তু ভয়ে ভয়ে তিনি ইহাও বুঝিতেছেন এই মমতা এখনই না কাটাইতে পারিলে হয়ত কাহাকেও ফেলিয়া আর তিনি যাইতে পারিবেন না—গিরীশ চিন্তাহরণ তাঁহাকে মায়াজালে আরও ঘিরিয়া ধরিবে, তিনি দুর্গাকেও ফেলিয়া যাইতে পারিবেন না;—এবং পীতাম্বর গাঙ্গুলীকেও ভুলিয়া যাইতে পারিবেন না।

ভাবিতেই কোথা দিয়া আর একটা ভয়, একটা ভাবনা, আরও গভীরতর কোন এক মোহ-আসক্তি তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আসিতে

চাহে। এই পৃথিবীতে পুরুষ-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা-যাত্রায় কি তাঁহার কোনো অধিকার নাই? কোনো পথ নাই তাঁহার এই নারী হৃদয়ের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা পূরণের—পুরুষের উপর অধিকার বিস্তারের? মোহে, লোভে, ভয়ে, ভাবনায়, ক্ষোভে—গিরিবালা আপনার অন্তরে কাঁপিতে থাকেন। শুধু শিশু প্রাণের অনন্ত সুধাধারা নয়, এই পৃথিবীতে পুরুষের হৃদয় জয়ে যে কত বড় উন্মাদনা, গিরিবালা আজ তাহাও প্রথম অনুভব করিতে পারে, আনন্দে শিহরিয়া উঠে।

আপনা হইতেই তারপর সব ঘটিয়া যায়।

গিরীশের সেই ক্ষুদ্র হাত দুইটি ছাড়াইতে না পারিয়াই ক্রমে জটিলতর বন্ধনে গিরিবালা বাঁধা পড়িয়া যান। সেই অশান্তি, সেই আশঙ্কা, গিরিবালার সেই কঠিন আত্ম-গঞ্জনা ও আত্ম-প্রকাশ, তারপরে আত্মদান ও আত্ম আবিষ্কারের কথা কে বুঝিবে সংসারে?

দুর্গা আরও দুর্বল, আরও স্বাস্থ্যহীনা হইয়া পড়িল। সংসারের মধ্যখানে থাকিয়াও যেন আর সে সংসারে নাই। গিরিবালা সবই বুঝিলেন, কিন্তু আপনাকে আর ছাড়াইয়া লইবার মত সাধ্য তাঁহার নাই। দুর্গার আর একটি সন্তান হইবে—মধুমালা। আবার সে শয্যাশায়িনী হইল।

গিরি ঠাকুরাণী আর পীতাম্বর গাঙ্গুলীর সংসার ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সেই বাড়ি, সেই গৃহ, তাঁহার সন্তান-সন্ততি, সকলকে লইয়া গিরি ঠাকুরাণী আপন সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিলেন দুর্গাকেও আচ্ছন্ন করিয়া। ক্রমে দিনে দিনে সেই সত্তা মর্যাদায় আত্মবিশ্বাসে সেই গৃহে স্বচ্ছন্দ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। লোকদৃষ্টি তাহা সহ্য করে নাই তত সহজে। কিন্তু আত্মীয়-পরিজন সকলে শুদ্ধ গ্রামের

মানুষ মানিয়া লইয়াছে গিরি ঠাককুরাণী কর্ত্রী হইবার মতই ; দয়া-মায়া, দশজনের উপকার—সব জিনিসেই তিনি অসামান্য। তারপর—স্বচ্ছন্দ আনন্দে সর্ব দায়িত্ব লইয়াছেন গিরি ঠাকুরাণীও।

যেই আত্ম-গঞ্জনাটুকু গিরি ঠাকুরাণী আপনার মনে অনুভব করিতেন তাহা হইতেও আপনাকে তিনি রক্ষা করিবার একটা পথ আবিষ্কার করিলেন—সবই জন্মজন্মার্জিত বিধান। দায়িত্ব গ্রহণেও তিনি বিমুখ নন তাঁহাকে ছাড়িয়া গিরীশ ঢাকায় পড়িতেও যাইবে না। দুর্গা ব্যাধি মুক্তা না হউক একেবারে অশক্তা ত নহে। নন্দীগ্রামের সংসারের ভার দুর্গার স্বহস্তে এইবার গ্রহণ করিতেই হইবে। গিরি ঠাকুরাণী ছেলেদের মানুষ করিবার ভার লইবেন, শহরে এই প্রবাসের জীবনও স্বীকার করিয়া লইলেন—গিরীশ ও চিন্তাহরণের জন্য এইরূপে।

ঢাকার বাসাবাটিতে আর একটি নূতন পর্ব খুলিয়া গিয়াছে তাঁহার জীবনে। গিরীশ ও চিন্তাহরণকে এই প্রবাসে তাঁহারই দিতে হইবে স্নেহ মমতা। কৈশোরের তীরে পৌঁছিতেছে তাহারা, তাহাদের চোখে গিরিঠাকুরাণী মাতা, নারীর মহত্তম আদর্শ। এই কথাটা গাঙুলী মহাশয়কেও এইবার বুঝিতে হইবে। তিনি সুরাপান করেন বা জিরতলীর জলসায় যাহা কিছু করেন, তাহাতে এই পুত্রদের বিকাশোন্মুখ মনে যেন অশ্রদ্ধার রেখাপাত না করিতে পারে, গিরি ঠাকুরাণী সেই বিষয়ে সতর্ক। গাঙুলী মহাশয়কেও এই শাসন মানিতে হয়। তাঁহার অনেক জিনিসই গোপন রাখা যায় পৃথিবী হইতে। কিন্তু পীতাম্বর গাঙুলী না বুঝুন,—গিরি ঠাকুরাণী জানেন—সন্তানের নিকট হইতে কিছুই গোপন রাখা সহজ নয়। রাখিতে গেলে একটা অস্বাভাবিকতা আসে সম্পর্কের মধ্যখানে। গিরি ঠাকুরাণী অন্তত সেই অস্বাভাবিকতা

জমিতে দিবেন না এই গৃহে, এই সংসারে—গিরীশ ও চিন্তাহরণের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের মধ্যে। গিরি ঠাকুরাণীর অনুভবে উহা তাঁহার একান্ত আশ্রয়—পবিত্রতম মন্দির।

বড় কঠিন এই প্রয়াস। বহু আয়াসে গিরি ঠাকুরাণী তাহা পালন করিতে চাহেন। একেবারে ব্যর্থও হয় নাই তাঁহার প্রয়াস। পীতাম্বর গাঙ্গুলীর সুরাসক্তি ক্রমেই কমিয়াছে; গৃহে তাঁহাকে মত্ত অবস্থায় এখন প্রায় দেখাই যায় না। জলসায় যতই নাচ গান শুনুন, এই কথা স্বীকার করিতে হইবে, তিনি ইন্দ্রিয়াসক্ত নন। সহরের দশজন শৌখান বন্ধুবান্ধবের অপেক্ষা বরং তিনি উন্নত চরিত্র। আত্মীয়-পরিজনের মত দেবপ্রসাদও বোঝে—গিরি ঠাকুরাণীর গুণেই পীতাম্বর গাঙ্গুলীর এই উন্নতি। শুধু তাহাই নয়, গিরি ঠাকুরাণী বাসাবাটির অন্য সকলেরও সুখ-দুঃখের দরদী। অন্তরাল হইতে তিনি সকলের খোঁজ রাখেন। আগেকার সেই হুল্লোর এই বাসায় আর নাই; বাসাটায় শ্রী আসিয়াছে তাঁহারই গুণে।—ছেলেরাও তাই মানুষ হইবে।

রাজীবের রোগ শয্যায় এই আশ্চর্য নারীকে দেখিল দেবপ্রসাদ। দেখিল এবং বুঝিল আরও অনেক বেশি। কেন গাঙ্গুলী মহাশয়ের এই অস্বস্তি, বিরক্তি?

পীতাম্বর গাঙ্গুলী বরাবর খুঁত খুঁত করিতেছিলেন—'এমন কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে বাড়ির ভিতরে না আনিলেই হয়ত যুক্তিসঙ্গত হইত। বলিবার ত উপায় নাই গিরি ঠাকুরাণীকে, তাঁহার এমনি জিদ্।' —গজ্‌গজ্‌ করেন গাঙ্গুলী মহাশয় রাজীবের গৃহদ্বার হইতে গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে। নিতান্ত আপন মনেও বলেন না।

গিরি ঠাকুরাণীও কথাটা শুনিতে পান। একটু তীক্ষ্ণ স্বরেই বলেন: তুমি এখানে না আসিলেই পার।

আমার নিজের কথা বলি নাই। ছেলে-পিলের বাড়ি।—পীতাম্বর গাঙুলী তৎক্ষণাৎ আমতা-আমতা করিয়া বলিতে বলিতে তাঁহার নিকট অগ্রসর হন।

গিরি ঠাকুরাণীর কণ্ঠ শোনা যায়ঃ হাঁ। বলিয়াছিই ত—তাহারা এই ঘরে ঢুকিতে পারিবে না। বরং এক কাজ করো—তুমি উহাদের লইয়া আপাতত নন্দীগ্রামে যাও—দুর্গাও নিশ্চিন্ত বোধ করিবে। আমিও খানিকটা নিশ্চিন্ত হইব।

তুমি? তুমি এখানে থাকিবে,—না? কে দেখিবে শুনিবে?

কাহাকে দেখিতে-শুনিতে হইবে? আমাকে?—অন্তরালে হাস্য শোনা যায়—বিদ্রূপ মিশ্রিত।

পীতাম্বর গাঙুলীও ক্ষুব্ধ হনঃ তোমাকে দেখিবার লোকের অভাব হইবে না, ঠাকুরাণী, জানি। অনেকেই আগাইয়া আসিবে—কিন্তু এই পীড়িত ছেলেটাকে দেখিবে কে?

গিরি ঠাকুরাণী শ্লেষের সহিত বলেনঃ কেন? দেখিব আমি। আর আমাকে যাহারা দেখিবে-শুনিবে তাহারাও!

কে? 'ছোট চৌধুরী' বুঝি?-কেমন চাপা ঈর্ষা-কুটিল কণ্ঠ।

কয়েকটা মুহূর্ত কাটিয়া যায়!

তারপর গিরি ঠাকুরাণীর কণ্ঠ শোনা যায়ঃ হাঁ।—গম্ভীর মর্যাদাময়ী নারীর কণ্ঠস্বর। আবার শোনা যায় সেই নারীর তেমনি কর্ত্রীত্ব ভরা নির্দেশঃ

বহির্বাটিতে যাও। মুহুরি মহাশয়কে বলো—আজই তোমরা নন্দীগ্রাম যাইবে। নৌকা ঠিক করুক।

পীতাম্বর গাঙুলী একটু স্তব্ধ হইয়া থাকেন।

আবার শোনা যায়: যাও। এখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে না।

নীরবে বাহির হইয়া যান পীতাম্বর গাঙ্গুলী।

গাঙ্গুলী মহাশয় গিরীশ ও চিন্তাহরণকে নন্দীগ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তিনি যাইবেন না। রোগীর গৃহে অবশ্য তাঁহার প্রবেশ বারণ ছিল। তিনিও আসিতেন না। সেখানে দেবপ্রসাদ সেবা করিবে। আর সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন গিরিঠাকুরাণী। অন্য কাহারও সেই গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি বিশেষ মিলিত না।

দেবপ্রসাদ গিরি ঠাকুরাণীকে দেখিল,—দেখিল অন্দর মহলে ক্ষুব্ধ গাঙ্গুলী মহাশয়ের গতায়াত। গৃহের বাহিরে তাহার বারম্বার কুশল-জিজ্ঞাসার ছলে আনাগোনা। কেমন অস্বস্তিবোধ করিতেছিল দেবপ্রসাদ—কোথায় একটা বিসদৃশ অস্বাভাবিকতা আসিয়াছে এই গৃহাভ্যন্তরে। পীতাম্বর গাঙ্গুলীর দৃষ্টিতে, স্বল্প কথায় সে আপনার প্রতি একটা বক্র বিরোধিতা অনুভব করিতে পারে। অথচ সাহস করিয়া ভাবিতে পারে না কি তাহা, তাহার কারণ কোথায়!

দেবপ্রসাদ হঠাৎ বুঝিল—বিরক্তি নয়, ইহাই ঈর্ষা!

বুঝিতে পারিলেও যাহা ভাবিতে চাহে নাই, তাহাও দেবপ্রসাদ এইবার জানিয়া গেল।

শোনো, ছোট চৌধুরী।

আহারান্তে দেবপ্রসাদ নিজ কক্ষে বহির্বাটিতে তামাক খাইতেছিল। রাজীবের শয্যাপার্শ্বে এখনি গিয়া বসিবে গিরিঠাকুরাণী ততক্ষণ সেখানে আছেন। পীতাম্বর গাঙ্গুলী বলিলেন: শোনো, ছোট চৌধুরী!

দেবপ্রসাদ হুঁকা নামাইয়া রাখিল। পীতাম্বর গাঙুলী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন : বলি, কাণ্ডটা হইতেছে কি ?

দেবপ্রসাদ বুঝিতে পারে না। গাঙুলী মহাশয় একটু মত্ত, মনে হয়। মুখে গন্ধও বাহির হইতেছে। পীতাম্বর গাঙুলী বলেন : তোমার ঘর-সংসার আছে, স্ত্রীপুত্র আছে ;—তুমি মজিতেছ কেন ?

দেবপ্রসাদ নিষ্পলক চোখে তাকাইয়া থাকে। বলিল : কি হইয়াছে ?

কি হইয়াছে ? শোনো—ও বিধবা ; মেয়ে মানুষ, সংসার নাই, পুত্র কলত্র নাই। উহার ত কিছু একটা চাই।—

দেবপ্রসাদের বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু এ কি জঘন্য, কুৎসিৎ কথা!—যে কলঙ্ক অপরেরা গোপনে আরোপ করিতে করিতে এখন আপনা হইতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, গাঙুলী মহাশয় তাহা এমন বাজে লোকের মত কহিতে পারিলেন। হয়ত মত্তাবস্থা বলিয়াই। অথবা—দেবপ্রসাদ চমকিত হয়—ইহা কি অন্য কিছু—ঈর্ষা! সে প্রতিবাদ করিল : কি বলিতেছেন আপনি, গাঙুলী মহাশয়! ছিঃ!

যাহা বলিতেছি শোনো। ও মেয়ে মানুষ আমাকে মজাইয়াছে এতকাল, তোমাকে মজাইবে এইবার।—

যেন বজ্রপাত হইল দেবপ্রসাদের সম্মুখে। সে নির্বাক, রুদ্ধশ্বাস।

গাঙুলী মহাশয় বুঝাইয়া বলিবেন : তুমি আমার ছোট ভাইএর অপেক্ষাও বেশি। কথাটা শোনা। প্রথমাবধিই তোমার দিকে উহার দৃষ্টি। তোমার ঘর আছে, সংসার আছে। সময় থাকিতে এইবার পালাও। ইহার পরে আর উদ্ধারের পথ থাকিবে না।

পীতাম্বর গাঙুলী আরও কত কি বলিতেছিলেন, কত কি বলিলেন, কিছুই তাহা দেবপ্রসাদ শুনিতে পাইল না। সে নিষ্পন্দ বসিয়া রহিল। অবশেষে পীতাম্বর গাঙুলী উঠিলেন। বলিলেন :

হাঁ, রাজীব আছে কেমন ?

দেবপ্রসাদের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল : রাজীব! রাজীবের কথা জানিতে চাহেন ? মনে হয় তত ভয়ানক আক্রমণ নয়! এই যাত্রা সহজেই রক্ষা পাইবে।

তাহা হইলে এইবার নিজে রক্ষা পাও।

পীতাম্বর গাঙ্গুলী আবার স্মরণ করাইয়া দিলেন। দেবপ্রসাদ ভুলিয়া গেল রাজীবের শয্যাপার্শ্বে রাত্রি জাগিয়া বসিয়া আছেন গিরি ঠাকুরাণী। একা নির্বাক নিস্পন্দ সে নিজ কক্ষে বসিয়া রহিল। পলদণ্ড প্রহর চলিয়া গেল। কেবলি সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—ইহা কি সত্য ? ইহা কি সত্য ? এই আশ্চর্য রমণী—এমনি আত্ম-বিস্মৃতা, ইহা কি সত্য ? তাহাকেও সে আকর্ষণ করিতে চায়—ইহা কি সত্য ? তাহারও উদ্ধার পাওয়া প্রয়োজন—ইহা কি সত্য ? কেহ তাহাকে মজাইতে পারে—মহেশ্বরী থাকিতে, ঘর সংসার থাকিতে—ইহা কি সত্য ?....

ইহা কি সত্য ? ইহা কি সত্য ? ইহা কি সত্য ?...

দেবপ্রসাদ চমকিত হয়—সে বুঝি জোর করিয়া কিছুই বলিতে পারে না। কিসে যেন সেও তলাইয়া যাইতেছে।

রাজীব সারিয়া উঠিল। দেবপ্রসাদ স্থির করিয়াছে—এখনি রাজীবকে বাড়িতে বিশ্রামের জন্য রাখিয়া আসিতে হইবে।

গিরীশের মারফৎ কথা বলেন গিরি ঠাকুরাণী : আর দুইদিন পরে যাইবেন। এখনো রাজীব দুর্বল।—স্বচ্ছন্দ মায়ামাখা সাধারণ অনুরোধ।

'না'—কণ্ঠ কঠিন তথাপি দেবপ্রসাদের।

গিরি ঠাকুরাণী বুঝিলেন—এই 'না' উগ্র, কঠোর; স্থির-সংকল্প মানুষের 'না'। কিন্তু কেন এই কঠোরতা এই মৃদু স্বভাব মানুষের ?

চিত্রিসারে ফিরিয়া রাজীব মুক্তিস্নান করিয়াছে, সেইসময়ে দেবপ্রসাদ স্বয়ং পড়িল সেই রোগে। মায়ের দয়া কে রোধ করিবে? পীড়ার প্রকোপ গুরুতর না হউক, দেবপ্রসাদের চিরদিনের ক্ষীণ দেহ যখন রাজীবের সেবায় ক্লান্ত, ক্ষীণতর, তখন এই আক্রমণ একেবারে রোধ করিবার শক্তি দেবপ্রসাদের ছিল না। তাহা গুরুতর হইল না, গো-বীজের টীকা সে বাল্যে গ্রহণ করিয়াছে। সেবার গুরুভার এখন পড়িল মহেশ্বরীরও অনন্তের উপরে, আর শীল বৈদ্যের উপরে পড়িল চিকিৎসার দায়িত্ব।

অসহ্য যন্ত্রণায় দেবপ্রসাদ মূক। কিন্তু তবু মনে মনে বাঁচিল—এই মুহূর্তে আর শহরে ফিরিতে হইবে না, পীতাম্বর গাঙ্গুলীর গৃহাশ্রয়ে গিয়া উঠিতে হইবে না। বাঁচিল; কিন্তু আপনাকে সে 'উদ্ধার' করিতে না পারিলে মনে মনে বাঁচিবে না, তাহাও বুঝিল। আপনাকে উদ্ধার করিতে হইবে আপনার। সেখানে কি আর কেহ আছে?—জায়া পুত্র পরিবার বাঁচাইতে পারে কি কাহাকেও? দিবা রাত্রি মহেশ্বরী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে—স্ফীত, কদাকার দেবপ্রসাদের মুখ। ভাগ্য যে চক্ষু সেই গুটিকা মুক্ত। আরক্ত বেদনাহত দৃষ্টি মেলিয়া দেবপ্রসাদও চাহিয়া থাকে মহেশ্বরীর দিকে। কিন্তু সে দৃষ্টি সুদূর। মহেশ্বরীর আবাল্য পরিচিত সেই চক্ষু কেন এত মনে হয় উদ্‌ভ্রান্ত, জিজ্ঞাসু, সুদূর ও শ্রান্ত? কিছুই সে বুঝিতে পারে না। দিবা রাত্রি মহেশ্বরীর দুর্ভাবনা।

না, না। অনন্ত চৌধুরীকে সহজে ছুঁইবে না ঐ শীতলা মাতা ঠাকুরাণীও।

বলিষ্ঠ, নির্বোধ নিঃসঙ্কোচ অন্তরে হাসিয়া উঠে অনন্ত। আর তেমনি সবল শক্ত বাহুতে লাগিয়া যায় পরিচর্যায়। তাহার মত কেহ পারিবে নাকি ছোট খুড়ার শুশ্রূষা করিতে? ছোট খুড়ীরও সাধ্যে কুলাইবে না।—'বলে মেয়ে মানুষ আর পুরুষ মানুষ।'

দেবপ্রসাদ শুনিয়া একবার হাসে—'মেয়ে মানুষ আর পুরুষ মানুষ'।

মহেশ্বরী আশান্বিত হয়। স্বামী হাসিলেন। স্বামী বুঝি তবে ফিরিয়া আসিতেছেন পূর্ব-বোধে। কিন্তু আবার যে তাঁহার সেই চোখ চলিয়া যায় অদৃশ্য লোকে। তারপরে তাহা নিমীলিত হয় যন্ত্রণায়। তাহার স্বামী যেন কোন্ লোকান্তরের ভাবনায় নিমজ্জিত। এ কি হইল!

মহেশ্বরী রাত জাগিয়া চাহিয়া থাকে। ক্রমে দেবপ্রসাদও বুঝি তাহারই দৃষ্টি, তাহারই মুখ, সেই অন্তরে মুদ্রিত ছবির আশ্রয়ে আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসে। চোখে তাহার নামে মমতা, কৃতজ্ঞতা। এই সেবাপরায়ণ কল্যাণ হস্তই বুঝি নারীর পরিচয়—পৃথিবীর আশ্রয়। ইহাই সে দেখিয়াছে গিরি ঠাকুরাণীর মধ্যে, ইহাই সে দেখিতেছে মহেশ্বরীর মধ্যে। একজনকে দেখিয়া নূতন অনুভূতিতে বিমথিত হইয়াছে তাহার অন্তর; আর একজন সেই বিমথিত হৃদয়ের সমস্ত সুধা তাহার জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে,—তাই দেবপ্রসাদ আপনাকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে। আছে তাহার জায়া পুত্র পরিবার, আছে বিশেষত মহেশ্বরী। পৃথিবীতে আর তাহার ভয় নাই কোনোখানে। সে সর্বজয়ী, আত্মজয়ী—গৃহ-সংসারের আশ্রয়ে।

দেবপ্রসাদ বিপদ মুক্ত হয়। আরও দীর্ঘদিনে মুক্তিস্নান সমাধা হয়। কিন্তু সে ভগ্নস্বাস্থ্য, দেহবল আর ফিরিয়া পায় না। আশ্চর্য! শহরে ফিরিতে তাহার আর ইচ্ছা নাই। উদ্যম নাই, উদ্যোগও নাই। 'বঙ্গপ্রকাশে'ও আর লিখিবায় তত আকাঙ্ক্ষা নাই। বনমালী চাটুজ্যে বা চিন্তাহরণের সঙ্গে সাহিত্য আস্বাদনের আনন্দও তাহাকে পীতাম্বর গাঙ্গুলীর গৃহে ফিরিয়া যাইতে প্রলুব্ধ করিল না। সে গ্রামে স্বগৃহেই থাকিতে চায়—মহেশ্বরীর তাহাই ব্যবস্থা। তাহার সহজ সংসার-যাত্রা ও মমতার আবেষ্টন ছাড়িয়া দূরে যাইতে সে আর চাহে

না। পরিণত দাম্পত্যের এই মদিরতা-হীন আকর্ষণে যে শ্রী আছে, কল্যাণ আছে, তাহা দেবপ্রসাদকে এক পরম প্রসন্নতায় ভরিয়া দিল এইবার।

রাজীব ফিরিয়া গিয়াছে। 'শহারের মাসী মা' থাকিতে তাহার জন্য ভাবনা নাই, দেবপ্রসাদ তাহার মাকে বুঝাইয়াছে। ভগ্ন স্বাস্থ্য দেবপ্রসাদ বাড়ি রহিল। বাড়ি বসিয়াই যাহা হয় করিবে। পুরাতন আটচালার পাঠশালাটাই আবার নূতন করিয়া সে গড়িয়া তুলিবে; অন্তত কিছুটা ত গ্রামের ছেলেদেরও পড়াশুনা হইবে। মধ্যমগ্রামে কয়জনা যাইতে পারে ইংরেজী পড়িতে? দেবপ্রসাদ ইংরেজীও পড়াইতে পারে। তাই ত, দেশে কয়জন লিখিতে পড়িতে শিখিল এই এক শত বৎসরে? শিক্ষক হইয়া দেবপ্রসাদ কয়জন নিজ গ্রামের লোককে শিক্ষাদান করিয়াছে? এই গৃহে, এই গ্রামে করিবার মত কত কাজ আছে, দেবপ্রসাদ এইবার তাহাও দেখিতে পায়।

শিক্ষার আগ্রহ দেশে বৃদ্ধি পাইতেছে। এইত, কাজী পাড়ার মজীদ কাজী আসিয়া দেবপ্রসাদকে বলিয়াছেন—সাহেদকে তিনি পড়াইতে শুনাইতে চাহেন ইস্কুলে। মক্তবে মসজিদে আর সে কি শিখিবে? তাহাতে দিনই বা গুজরান্ হইবে কিরূপ? রুজি-রোজগার না হইলে এদিনে আর কাহারও চলিবে না।—সেই কাজীরা, এই সেদিনও সগর্বে বলিয়াছে—নসরার ইস্কুলে পড়া তাহাদের পক্ষে গোনাহ। তাহারাও আজ এই কথা বলে। অথচ কোথায় শিক্ষাব্যবস্থা গ্রামে?

দেবপ্রসাদের বিশ্বাস এইবার গ্রামেও শিক্ষা বিস্তার প্রয়োজন।

সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করিতেই চৌধুরীদের 'বঙ্গ বিদ্যালয়ে' ডিপুটি ইনস্পেকটর বনমালী চাটুজ্যে আসিয়া উদিত হইলেন। দেবপ্রসাদ এতটা

প্রত্যাশা করে নাই। গল্প জমে। অনেক নূতন সংবাদও শোনে দেবপ্রসাদ। শুধু 'দুর্গেশ নন্দিনী' পড়িয়া আসিয়াছিল সে শহরে; পড়ে নাই 'কপাল কুণ্ডলা'—অদ্ভুত! অদ্ভুত!—মাত্র একবেলা বনমালী চাটুজ্জের থাকিবার কথা। দেবপ্রসাদের সঙ্গে কিন্তু কথা তাহার ফুরায় না। শেষে ইস্কুলে পনের টাকা সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দেবপ্রসাদ চৌধুরীর আয়েরও কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিয়া যান বনমালী চাটুজ্জে। গ্রামের লোকে বিদ্যালয়ে আরও মাসে পনের টাকা চাঁদা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। কিন্তু তাহা দিবে না, বনমালীবাবু বেশ জানেন; তাই বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। সরকারের কত টাকা বিনা কাজে নষ্ট হইতেছে। একজন উপযুক্ত শিক্ষকই এই সামান্য বৃত্তি পাইবে। একটা স্কুলও বাড়িবে।

হঠাৎ একটা ঢেউ উঠিল গ্রাম্য সমাজের মরা খাতেও। দীনু চক্রবর্ত্তী কন্যা-পণের অভাবে 'ভরার মেয়ে' বিবাহ করিয়া আনিয়াছিল। একালে এই কাণ্ড! মেয়েটা ব্রাহ্মণের, তবে ভিন্ন জাতের ব্রাহ্মণের —এদিনে তাহা গোপন করা অসম্ভব। ঘোঁট পাকিয়া উঠে। দেবপ্রসাদ চিত্রিসারে, দীনু কাকাকে এখন সে আশ্রয় দিল। সমাজ-পতিরা গ্রহণ করিলেন কালচিতার সেনেদের আশ্রয়—তাঁহাদের বাড়ির মেঝ কর্তা দারোগা। এই দলাদলিতে ইস্কুলের চাঁদা বন্ধ হইয়া গেল সব প্রথম।

দলাদলি ক্রমে আরও জমিয়া উঠে। গ্রামের চাষা ভূষাদের ছেলেদের পাঠশালায় পড়াইতে চাহে চৌধুরী। পাড়ার মেয়েগুলিকেও ধরিয়া পড়িতে বসায়। বয়স্থা মেয়ে সব,—দশ বা এগারো বৎসর বয়স। অনাসৃষ্টি ঘটিতে আর বাকী কি? ব্রাহ্মণ কর্তারা স্থির করেন—স্কুলটা ভাঙিয়া দিতেই হইবে। বহু দিন মাস ধরিয়া চলে রেষারেষি। দেবপ্রসাদ চৌধুরী কিন্তু কিছুই শুনে না। স্কুলও ঠিক চলে।

আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গেল তাই এক রাত্রে চৌধুরীদের আটচালায় ইস্কুল ঘর। তবু দেবপ্রসাদ হার মানিবে না। দুঃসাহসিক বড় কাজ ইহা নয়, সে তাহা জানে। কিন্তু গ্রামের বহু শিকড় জড়ানো জীবনে এই সামান্য কাজে এত প্রতিকূলতা জুটিবে, তাহা সে জানিত না। তথাপি দীনু চক্রবর্তীকে সে ছাড়িবে না, স্কুলও সে ছাড়িয়া দিবে না। পারিলে সে সকল জাতির ছেলে মেয়েকেই পড়াইবে, তাহারা বেতন দিতে না পারিলেই বা কি?

বনমালী চাটুজ্জে আবার আসিলেন; ইস্কুলের জন্য এবার বিশেষ সাহায্য নির্দ্দিষ্ট হয়। সাবধানও করেন বনমালীবাবু—শীঘ্রই তিনি বদলি হইয়া যাইবেন। তাহার পরে কে আসিবে কে জানে।—গ্রাম বড় শক্ত ঠাঁই, দেবপ্রসাদ।

বিদায় লইতে লইতে তিনি জানান: 'আমি হয়ত আর বেশি দিন এখানে নাই, দেবপ্রসাদ।

এই আত্ম-সচেতন কাব্য-রসিক পুরুষের প্রতি দেবপ্রসাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। তাহার চক্ষু এইবার আর্দ্র হইয়া আসে।

বনমালী চট্টোপাধ্যায়েরও চক্ষু একবার ছলছল করিয়া উঠিল। এই নিরভিমান স্বল্পভাষী যুবকের মত অনুভূতি-সক্ষম সুহৃদ তিনি এই দূরদেশে, পূর্ব্ববঙ্গে পান নাই। পাইবেন, তাহা আশাও করেন নাই। ইহাদের পাইয়াই তাঁহার মনে হইয়াছে তাঁহার বাঙলা দেশ কত বড়, কত আশ্চর্য! তাহা শুধু ভাগীরথীর দুই তীরেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি তাই স্বপ্ন দেখিয়াছেন—নব কালের ভাবস্রোত এই পদ্মাতীরেও বুঝি নূতন ফসল উৎপাদন করিবে। এ যে নূতন আবাদ! আবার তিনি ভাবেন: শুধু নূতন উত্তেজনায় ইহারা ভাসিয়া না গেলে হয়।

দেবপ্রসাদকে তাহাই তিনি জানান: জোর হাওয়া দিয়াছে। পাল

উড়িয়াছে, এখন হাল ঠিক মত ধরিতে পারিলে হয়। শহরের সংবাদ কিছু রাখো কি? তোমার সেই ছেলেরাও ভাসিয়া যাইবার মত। ব্রাহ্ম আন্দোলনে তাহারাও মাতিয়া উঠিতেছে। কি হইবে তবে জাতির?

দুই তিন বৎসর শহর ছাড়িয়া আসিয়া দেবপ্রসাদ শহরের সামান্য সংবাদই রাখিত। এই গৃহ, এই সমাজ আপনার কর্মক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ইহারই সমস্যায়ও মাধুর্যে সে বিজড়িত হইয়া থাকে। তথাপি শহরের কিছু কিছু সংবাদ দেবপ্রসাদও পাইয়াছে। নন্দীগ্রামে চিন্তাহরণ গিরীশ দুর্গা পূজার প্রসাদ গ্রহণ করে নাই, বিগ্রহকে প্রণাম করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। রাজীবকে লইয়াও চিত্রিসারের বাড়িতে এইবার বিভ্রাট ঘটিয়াছে। রাঘব তাহাকে মারিতে যায় আর কি। অনন্ত আবার উল্টা লাফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠে: 'তুমি উহাকে মারিবার কে? ও নরকে যাইবে ত নরকে যাইবে; তুমি স্বর্গে যাইও। এখনি যাও না। কর্তৃত্ব ফলাইতে আসিও না।'—দেবপ্রসাদ বাড়িতে, সে-ই বিরোধের মীমাংসা করিয়া দেয়। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ করে ত রাজীব? তাহা হইলে ব্রাহ্মণের আবার ভয় কি?—কিন্তু তাই বলিয়া দেবপ্রসাদ বিষয়টার গুরুত্ব বোঝে নাই, তাহা নয়। রাজীবের মুখ দেখিয়াই সে তাহা বুঝিয়াছে। মহেশ্বরী পর্যন্ত তাহা বুঝিয়াছে—সে মুখে বিদ্রোহ দেদীপ্যমান।

সে মুখে দেবপ্রসাদ দেখিল দেবনন্দন ওঝার সেই তেজ, সেই ক্ষোভ, সেই সংকল্প! দেবপ্রসাদ ভীত হয়, আশায় শিহরিত হয়।

বনমালীবাবুকে দেবপ্রসাদ বলে: জাতি জন্মিতেছে। ভয় আর কাহাকে?

মাঝিরা নৌকা খুলিতেছিল। বনমালীবাবু থামাইলেন, ভিতরে গিয়া

বাক্স খুলিলেন। কি করিলেন, তার পর ফিরিয়া আসিলেন। দেবপ্রসাদের হাতে তুলিয়া দিলেন একখানা বই—'কপালকুণ্ডলা'। বলিলেন: আর কিছু সঙ্গে নাই, দেবপ্রসাদ। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বড় কি আর থাকিতে পারে বাঙালীর? এই ত আমাদের আপনার জিনিস। বাঁচিলে আমরা আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়াই বাঁচিব। তাহার বন্ধনেই জাতির অতীতের সঙ্গে জাতির ভবিষ্যতের বন্ধন।

দেবপ্রসাদ কপালে স্পর্শ করিল সেই আশীর্বাদ। বনমালীবাবুকে প্রণাম করিতে গেল—এমন দান আর কে তাহাকে দিতে পারিত?

বনমালী চট্টোপাধ্যায় বাধা দিলেন, তাহাকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিলেন। বলিলেন:

আবার কি দেখা হইবে?—নিজেই আবার বলিলেন,—কে জানে?

নৌকা ছাড়িল। তীর মিলাইয়া যাইতে লাগিল। তীরের মানুষও, দেবপ্রসাদও। না, আর দেখা হইবে না। কিন্তু বনমালী চট্টোপাধ্যায় এই পূর্ব বাঙলাকেও আর বিস্মৃত হইতে পারিবেন না, আর অবজ্ঞা করিতে পারিবেন না। তাঁহার মনের অবজ্ঞা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। কে তাহাকে ভালবাসিতে শিখাইল এই নদী-নালা ঝোপ-জঙ্গল ঘেরা বাঙাল দেশকে? এই বাঙাল শিক্ষক, দেবপ্রসাদ? না তাহাদের প্রিয় বাঙলা ভাষা, বাঙালা সাহিত্য? বাঙালীকে বাঙালী করিয়া তুলিতে পারে আর কিসে?—বাঙলার সাহিত্যে ও বাঙলার মানুষে?

বনমালী চাটুজ্জের শেষ আশঙ্কায় দেবপ্রসাদ একটু সতর্ক হইল।

দেবপ্রসাদ ব্রাহ্মধর্মের বিরোধী নয়। কিন্তু সত্যই এতটা জাতির ও সমাজের বিরোধিতা কি সমুচিত? দেবপ্রসাদ রাজীবকে তাই বলিয়াছে: একেশ্বরবাদ ত ঠিক জিনিসই। ঈশ্বর ত এক ছাড়া দুই নয়।

কিন্তু এই ধারণাটাও শিক্ষার গুণেই সহজবোধ্য হয়, গায়ের জোরে হয় না।

রাজীব বলে : সেই শিক্ষা তবে ধর্ম শিক্ষা, নীতি শিক্ষা।

আরও বেশি। শুধু ধর্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষাও নয়,—দীক্ষা।

দেবপ্রসাদ তাহা বুঝাইয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু নিজের অন্তরে উপলব্ধি করে—এই দীনু চক্রবর্তীর, ঐ শৈলীর মা,—ঐ নীলমাধবের দেউল, ঐ গ্রামাধিষ্ঠাত্রী সিংহবাহিনীর মন্দির, ফকিরের আস্তানা, এখানকার মাঝি মাল্লা চাষী কৈবর্ত, সকলের—আর মহেশ্বরীর—নিকট হইতে জীবনের এই গম্ভীর দীক্ষা না গ্রহণ করিলে ব্রহ্মোপাসনায়ও তাহা মিলিত কি দেবপ্রসাদের?—দেবদেব'র পূজা নয়, ইহাই ত আসল জাতীয় ধর্ম।

রাজীবের এই সব কথা ভালো লাগে নাই। ছোট খুড়া গ্রামে থাকিয়া গ্রামের মানুষ বনিয়া যাইতেছেন। বিশেষত, বনমালী চাটুজ্জের প্রভাবে ক্রমেই ভূদেব মুখুজ্জের মত গোঁড়া হিন্দুত্বের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহার গ্রামে থাকায় একমাত্র উপকার হইতেছে—পাড়ার ছেলেরা ও বাড়ির মেয়েরা কিছু সুশিক্ষা পাইতেছে। কিন্তু দেবপ্রসাদ নিজে পুরাতন সংস্কারে আরও জড়াইয়া পড়িতেছেন। তবে তাঁহার সাহস চিরদিনই একটু কম। বনমালী চাটুজ্জের মত ওই মাইকেলেই তিনি মুগ্ধ, 'কপাল কুণ্ডলা' পাঠে তন্ময়। ধর্ম, স্বাধীনতা ও সমাজ-সংস্কারের ইচ্ছা তাঁহার প্রবল নয়।

আর রাজীবও বুঝিতেছে,—এই দুর্বলতা কত সংক্রামক। রাজীবকে অবশ্য সাহিত্যাকার্ষণে টানিবে না। তথাপি রাজীব শ্রাদ্ধে তর্পণে বিশ্বাস না করিয়াও মাতৃশ্রাদ্ধ করিল কেন? ইহা মাইকেল বঙ্কিমের প্রভাব নয়। এই চিত্রিসার, এই চৌধুরী বাড়িই তাহাকে গ্রাস করিবে—দেবপ্রসাদ চৌধুরীর ও মহেশ্বরীর স্নেহ মমতার জালে পড়িয়া সে-ও জড়াইয়া

পড়িবে। সত্যধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে, তেত্রিশ কোটি দেবতা ও কুসংস্কারে তলাইয়া যাইবে,—চিন্তায় স্বাধীনও হইতে পারিবে না।

রাজীব আর ছুটিতেও তাই চিত্রিসারে বেশি থাকিতে চাহে নাই। এইবার গ্রীষ্মে মাতুলালয়েই নিরুপদ্রবে বেশি সময় কাটায়াছে। ন্যায়রত্ন গম্ভীর, স্নেহশীল। কিন্তু তিনি এতই গোঁড়া যে রাজীব তাঁহার নীতিতে জড়াইয়া পড়িবে না। সেই গৃহের দ্বারও একদিন বন্ধ হইবে, তাহাও রাজীব জানে। কারণ রাজীবের ধর্ম-বিষয়ক মতামত তিনি একটুও সহ্য করিবেন না। সেই গৃহে দেবপ্রসাদের মত উদার দৃষ্টিতে কেহ উহা ক্ষমা করিবেন না। তাই রাজীবের সেখানে ভয় নাই; সেই গৃহে তাহার সংকল্প কোনোরূপে ক্ষয় পাইবে না। কিন্তু চিত্রিসারে তাহার বড় ভয়—এখানে যেন সকলেই তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিবে। পিতৃপিতামহের আচার-নিয়ম, দেবদেবী, মন্দির বিগ্রহ,—সবই এখানে মনে হয় জীবন্ত, রাজীব তাহাদের বন্দী।

১০

সকল চেষ্টা শেষ হইয়া গেল। চিন্তাহরণ গিরীশ কলিকাতায় পালাইয়া গিয়াছে; রাজীব কোথায় তাহা ঠিক নাই।

পীতাম্বর গাঙ্গুলী এবার উন্মাদের মত চুল ছিঁড়তে লাগিলেন। মামলা করিবার জন্য বার কয় তিনি উকিলের বাড়ি ছুটিলেন, তারপর শাপ-শাপান্ত করিতে লাগিলেন। এক-একবার পৈতা দিয়া জড়াইয়া ধরিতে যান কোনো ব্রাহ্ম নেতার হাত, আবার ক্রোধে তুবড়ির মত ফাটিয়া পড়েন—'আমি উহাদিগকে ত্যজ্যপুত্র করিব।—না, আমি উহাদের মন্দির পোড়াইয়া দিব।—না হইলে আমি নন্দীগ্রামের নীলাম্বর গাঙ্গুলীর পুত্র নই।'

দেবপ্রসাদ এখন জানে—কিছুই পীতাম্বর গাঙ্গুলী করিতে পারিবেন না, করিবেনও না। তত খানি তেজ তাঁহার মধ্যে নাই। তাহা ছাড়া সুবুদ্ধিও তাঁহার আছে। চালাকি করিতে করিতে তিনিই তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদের ব্রহ্মোপাসনার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। এইত, গিরীশ ও চিন্তাহরণের নামে এই মর্মের পত্র ব্রাহ্মদের স্থানীয় পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে: "আবাল্য আমরা আমাদের পিতার নিকটে ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা করিয়াছি।" দেবপ্রসাদ জানে তাহারা মিথ্যা কথা কহে নাই। আজিও আবার ক্রোধে আত্মহারা হইয়া পীতাম্বর গাঙ্গুলী যে পিতৃনাম তুলিয়া শপথ করিতেছেন তাহাও তিনি কাল বিস্মৃত হইবেন। আপনার এই চালাকি ও চরিত্রের দুর্বলতার জন্যই তিনি ছেলেদেরও নিকট নিজের সম্মান অনেকটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেবপ্রসাদ এখনো মানিয়া চলে। কিন্তু অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছে—আর ভক্তি করিতে পারে নাই। তথাপি সম্প্রতি চাক্ষুষ দেখিয়া তাঁহার জন্য বেদনা বোধও করিয়াছে। দেবপ্রসাদ বোঝে—পিতার প্রাণ; অমন সুযোগ্য দুইটি পুত্র গৃহত্যাগ করিল; এই বেদনায় তিনি যদি রাগিয়া খুন হন, আবার কাঁদিয়া ভাসান, তাহার কোনোটাই অস্বাভাবিক নয়। তাহার জন্য দেবপ্রসাদের সমবেদনাও জাগে। দুর্বলচিত্ত হইলেও লোকটা দুর্জন নন। দেবপ্রসাদের হিতৈষী মুরুব্বিও।

গিরি ঠাকুরাণী কিন্তু ভাঙিয়া পড়িলেন: আনিতে পারিলেন না উহাদের? দেশ হইতেও তাহারা পালাইয়া গেল! কি লইয়া আমি এই গৃহে থাকিব আর?

সত্যই কি,থাকিবার মত আর কিছু নাই তাঁহার?—দেবপ্রসাদ একবার মনে মনে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু চোখ তুলিতেই চক্ষে পড়িল গিরি ঠাকুরাণীর চক্ষু। সেই চক্ষু স্থির, তাহা আনত হইল না।

আপনাকে দীন মিনতিতে তাহা মেলিয়া দিয়াছে, বলিতেছে—সত্যই আমার আর কিছু নাই।

দেবপ্রসাদ চোখ নত করিল। গিরি ঠাকুরাণীর পক্ষে নন্দীগ্রামে প্রত্যাবর্তন প্রীতিকর হইবে না। করিলে সেইখানেও জটিলতা বৃদ্ধি পাইবে। সকলেই দেখিবে—দুর্গার মাতৃহৃদয়ের বেদনা, পীতাম্বর গাঙ্গুলীর পিতৃহৃদয়ের আর্তনাদ। কেহ কি বিশ্বাস করিবে—গিরি ঠাকুরাণীর মাতৃপ্রাণের যন্ত্রণা? দেবপ্রসাদের সমস্ত মনের মধ্যে একটা বেদনা জাগিয়া উঠিল এই অসহায় শূন্য-দৃষ্টি, দিশাহারা রমণীর অবজ্ঞাত মাতৃ-হৃদয়ের জন্য। এই স্নেহবশেই না তিনি আত্মবিস্মৃতা হন!

দেবপ্রসাদ বুঝিতেছে—পীতাম্বর গাঙ্গুলী অবশ্য যথাকালে অনেকটা শান্ত হইবেন। গিরি ঠাকুরাণীর সান্ত্বনা-লাভের মত কিন্তু কিছু আর নাই।

দেবপ্রসাদ অনেকক্ষণ নির্বাক বসিয়া রহিল। শেষে নির্বাক সমবেদনায় প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিল। কিন্তু এইবার শহর ত্যাগ করিল গ্লানি-লেশহীন অমলিন মন লইয়া।

দেবপ্রসাদ বুঝিয়াছিল—রাজীবও গৃহে আসে নাই। রাজীবের সংবাদে সে বিষণ্ণ, চিত্রিসারের সকলের প্রাণ অবসন্ন।

চৌধুরীদের কি হইবে? চৌধুরীবংশের অত আশা রাজীব। সে আশা বিনষ্ট হইতেছে। দেবপ্রসাদ বোঝে আবার নূতন করিয়া চৌধুরী গোষ্ঠীকে বাঁধিতে হইবে। কিন্তু দেবপ্রসাদকে দিয়া আর তাহা কুলাইবে কি? তাহার দেহে আর সে বল নাই; মনের দৃঢ়তা অবশ্য এখনো আছে। গৃহ-সংসারের সুনিবিড় সহজ সম্পর্কে তাহার জীবন সুস্থির। মহেশ্বরী তাঁহাকে শ্রী ও আত্মপ্রত্যয় দিয়াছেন—আজ গিরি ঠাকুরাণীকে দেখিয়া দেবপ্রসাদ তাহা আরও গভীরতর রূপে উপলব্ধি

করিতে পারিতেছে। সে এখনো তাই আশা রাখে—চৌধুরী পরিবারও তাহার রক্ষা করিতে হইবে। অবশ্য সে শুধু সেই কয়দিনে উপাদান সংগ্রহ করিবে, এই সংসারকে আগলাইয়া রাখতে চেষ্টা করিবে, আর আপন পুত্র কন্যাকে সহজ শিক্ষায় শৃঙ্খলায় মানুষ করিবে—সেই সাধনাতে মহেশ্বরী হইবেন সহকারী। তাহা ছাড়া, পাঠশালায় যতটা পারিবে বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের সে শিক্ষা-দীক্ষা দিবে; বিদ্যাবিতরণ করিবে তাহার গ্রামের আপন জনদের। ইহার বেশি তাহার সাধ্য নাই দেশের মানুষের জন্য কিছু করিবে। তাহার জীবনে আর বেশি সময় হইবে না।

চৌধুরী বাড়ি, সেই ভাঙা পাড় শঙ্কর দীঘি,—সেই নীলমাধবের মন্দির ও পঞ্চবটী তলা—সব জিনিসের জন্য কেমন একটা বেদনায় ও মমতায় দেবপ্রসাদের অন্তর ভরিয়া যায় দেখিতে দেখিতে। ইহারা সকলেই যেন আজ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে—জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'আমাদের কি হইল?'

'কি হইল জাতির'—দেবপ্রসাদের আপনার মনে-মনে বলে। দেবপ্রসাদ কি করিল তাহার?—কি করিবে রাজীব?—

দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, ওঝাজী বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত ধিক্কার দিত দেবপ্রসাদকে—এত বৎসর দাসত্ব ছাড়া কি করিল, বল ত?' কিন্তু দেবপ্রসাদ জানে—অন্ধ বিশ্বাসে উদ্ধার নাই। জ্ঞানে ও কর্মেই জাতির পথ যে চাঞ্চল্য, যে উদ্দীপনা নানা দিকে দেখা দিয়াছে, তাহা ত জাগরণেরই লক্ষণ। চিন্তাহরণ ও গিরীশকে দেবপ্রসাদ দেখিয়া আসিল, রাজীবও সম্ভবত তাহাদেরই সহযাত্রী। তাহাদের গৃহত্যাগ ও সমাজ ত্যাগ, দেবপ্রসাদ সমর্থন করিতে পারে না। বনমালী চট্টোপাধ্যায়ের মত সেও জানে জাতির জীবন—এই ঝোপ-ঝাড়, ঘর

দুয়ারে, আত্মীয় পরিজনে; তাহার প্রকাশ সাহিত্যে। কিন্তু ইহাও সে বুঝিতেছে—একটা প্রচণ্ড ভাব-প্লাবনে তাহার ছাত্ররা ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। দুর্বার তাহাদের সাহস, মহৎ তাহাদের আদর্শ, প্রবল কর্মাকাঙ্ক্ষা। এই সাহস, এই আদর্শনিষ্ঠা, এই কর্মাকাঙ্ক্ষা—ইহা বাপ মাকে কাঁদাইতেছে, গৃহসংসার ভদ্রাসন গুঁড়াইয়া দিতেছে। কিন্তু দেশ, জাতি ও সাহিত্য এই ভাব-গঙ্গার ধারায় নূতন অভিষেক লাভ করিতেছে, তাহাও দেবপ্রসাদ অনুভব করিতে পারে মনে-মনে। নিজেদের গৃহ সংসারের কথা ভাবিয়া সে বিষণ্ণ হয়; তথাপি কাহাকেও দোষী করিতে পারে না।—ওঝাজীকেই কি সে কখনো দোষী মনে করিয়াছে? অন্ধকারের যুগ যে শেষ হইতেছে তাহাতে আজ ভুল নাই। দেবপ্রসাদ তাহা চক্ষে দেখিবে না; কিন্তু যত দেরী হউক, রাত্রি শেষ হইতেছে; সুদিন আসিবে। হয়ত চিন্তাহরণ গিরীশ রাজীবেরাই তাহা আনয়ন করিবে। স্বাগত করিবে সেই নবোষাকে তখন চিত্রিসারের 'ছোট চৌধুরীর' ছাত্ররা, তাহার স্বজনগণ ও তাহার পুত্র-বংশধরগণ।

কোম্পানি গিয়াছে, কোম্পানির দোহাইও চিরদিন থাকিবে না, ওঝাজী!

২

কূল ও অকূল

১১

আচার্যের উপদেশ শেষ হইয়া গেল। উৎসব-মুখর মন্দির হইতে তিন বন্ধু একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিল।

চিন্তাহরণ নির্বাক, আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত। উদ্বেল হৃদয়ের তরঙ্গ এখনো থামে নাই। আচার্যের উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহা বহন করিয়া আনিয়াছে নূতন আকুলতা; আত্মার তটে তটে ইতিমধ্যেই ছড়াইয়া দিয়াছে শান্তির স্পর্শ। কত কত দিনের পরীক্ষা আজ সমাপ্ত করিয়া সে অবশেষে দীক্ষা গ্রহণ করিল একমাত্র নিরাকর চৈতন্য-স্বরূপ পরম ব্রহ্মের উপাসনার।

"নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ পরম ব্রহ্ম"—উচ্চারণ করিতে করিতে আচার্যের কণ্ঠ যেন শান্ত পবিত্রতায় ভরিয়া উঠিল। তাহার পরেই আসিল প্রেমাবেগের প্লাবন। "সমস্ত আকার ছাড়াইয়া যাঁহার আকার, হে অরূপ! হে অপরূপ! সেই তুমি আমাদের জীবনের মধ্যে চেতনা হইয়া আ'স, আমাদের কর্মের মধ্যে জ্ঞানালোকে সমস্ত তমিস্রা বিনাশ কর, আমাদের আত্মার মধ্যে আনন্দ হইয়া ভাসিতে থাক। তোমাকে পাই, তোমাকে পাই, প্রতি জিনিসেই পাই; তবু আবার চক্ষু মেলিয়া দেখি তুমি নাই, তুমি নাই। হে পরম প্রেমিক! একি খেলা আমাদের জীবন ভরিয়া তোমার! একি তোমার লীলা, ওহে পরমাত্মা! জীবাত্মার এই বিরহ-মিলনের বাসরে। লও, লও হে প্রেমিক! এই তোমার বিমূঢ় বিহ্বল দাসানুদাসকে তুলিয়া লও তোমার সিংহাসন পার্শ্বে। লও এই অবোধ

অক্ষম ভিখারী হৃদয়কে তোমার মন্দিরের বেদিতলে—সূর্য-চন্দ্র-তারকার আরতির আলোকশালায়। লও এই বিমুগ্ধ বিভ্রান্ত জীবন-সখাকে তোমার সেই প্রেম-বৃন্দাবনের স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ায়। বাঁশী বাজুক আজ, সানাই বাজুক, জ্বলুক আজ মিলন-বাসরের সকল আলো। হে প্রাণের প্রাণ! আজ আমি তোমার শরণ লইলাম। আজ আমি তোমাকে বরণ করিলাম। পাইলাম তোমার ত্রিভুবন-জোড়া চরণের স্পর্শ। দেহ পবিত্র হইল। মাথা উন্নত হইল। বক্ষ তোমার আলিঙ্গনে শিহরিত, হে প্রেমময়!”

‘বক্ষ শিহরিত’। সে শিহরণ এখনো থামে নাই। চিন্তাহরণ তাহা এখনো আপনার মধ্যে বহন করিতেছে। কিন্তু এই শিহরণে অস্থিরতা নাই, জ্বালা নাই, শান্তবাহী ধমনী-ধারায় নাই উত্তাপ। এই শিহরণে যে তীব্রতা তাহা মধুর, যে অধীরতা তাহাও শান্তির। শান্তি! শান্তি! শান্তি! ‘দেহ পবিত্র হইল, মাথা উন্নত হইল, বক্ষ শিহরিত এখনো।’ ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি ॥···

গিরীশ একবার বলিল: মুক্তি! মুক্ত পৃথিবীতে সত্যের মধ্যে আজ আমাদের মুক্তি। তাহা নহে কি?

চিন্তাহরণ শুনিতে পায় নাই। গিরীশও বুঝি অপরের শুনিবার অপেক্ষায় নাই। সে নিজের কথাই শুনিতেছে—শুনিতেছে আচার্যের মুখের ভাষায়।

“মাথা উন্নত হইল। মাথা উন্নত হইল। রাজাধিরাজ! এই মাথার উপর তুমি রাখিয়াছ তোমার পাদপদ্ম। আর ত অসত্যের নিকট এই শির ঝুঁকিয়া পড়িবে না। আর ত অন্যায়ের সম্মুখে আত্মবিশ্বাস হারাইয়া সংশয়ে কাঁপিবে না। পৃথিবীর বৃক্ষলতা, নদনদী, গিরি সমুদ্র,

জীবজন্তু, যক্ষ রক্ষঃ কিন্নর, সুরাসুর, কাহারও নিকটে তোমার চরণ আশ্রিত এই মানুষ সহিবে না আপনার অপমান। আমার অপমানে যে আজ তোমার অপমান, আমার গৌরবে তোমার প্রকাশ। মানুষের মধ্যে মানুষ আমি আজ, হে স্বপ্রকাশ! তোমারই আশ্রয়ে আজ লইলাম মানুষের অধিকার। লইলাম মুক্তির দায়িত্ব, সত্যের সাধনা'।

গিরীশের প্রতিজ্ঞা যেন তাহার অন্তর মধ্যে ঠেলিয়া উঠে—'লইলাম মুক্তির দায়িত্ব, সত্যের সাধনা'।' Lead, kindly Light! Lead me on.

গিরীশের কানে যায় নাই, রাজীব কখন তাহার কথার উত্তর দিয়াছে: মুক্তি নিশ্চয়ই। সাধনা, সংগ্রামও মুক্তির; সুপ্তি হইতে মুক্তির, আত্ম অবিশ্বাস হইতে মুক্তির। ব্যক্তির, সমাজের, জাতির আত্মবিশ্বাসের সাধনা—স্বাধীনতার সাধনা।

রাজীব উত্তর পাইল না। সে তাহা চাহেও না। সেই উত্তর ত সে শুনিয়াছে আচার্যের উপদেশে, তাঁহার আশ্বাসে: '—ইহাই সত্যের সাধনা, সত্য স্বরূপ! পৃথিবীর পদে পদে এই সত্যকে আজ জীবন্ত করিবার সাধনা আমার হইল। মানুষের কর্মের সংসারে, জাতির জীবন যজ্ঞে, আমার দিন-রজনীর প্রতিটি কর্মে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্রত আজ হইতে আমি গ্রহণ করিলাম। জীবনের সংগ্রাম ক্ষেত্রে আজ আমি প্রবেশ করিতেছি, হে সেনাপতি!—তোমার সেনানী আমি, সত্যের বীরবাহিনীর স্থির পদাতিক, সর্ব স্বাধীনতার স্বেচ্ছাসৈনিক। জয় জয় জয়, হে একমেবাদ্বিতীয়ম্! জয় জয় জয়! হে এক, একত্র করো আমাদের এই একেশ্বরের রাজ্যে। তুমি একত্র করো আমাদিগকে বহু

বিবাদ বিচ্ছেদ ছেদন করিয়া আমাদের মধ্যে। তোমার মধ্যে আমরা এক হইয়া যাইব, এক হইয়া উঠিব, এক হইয়া ফুটিব, একমেবাদ্বিতীয়ম্!

সত্যোঽহম্ শিবোঽহম!"

রাজীবের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে, 'শিবোঽহম্ শিবোঽহম্'। সেই মন্ত্র! আর সেই মন্ত্রে দীক্ষা লইল আজ রাজীব। ইহাই ত দেবনন্দন ওঝার স্বপ্ন-সাধনা। সেই সংগ্রামের সূচনা আজ। যুদ্ধোন্মুখ সৈনিকের মত রাজীব সগৌরবে তাই স্মরণ করিতেছে, "শিবোহম্ শিবোহম্"

গৃহদ্বারে আসিয়া গিয়াছে তিন জনা। একবারের মত তাহারা সচেতন হয়। তারপর চলে—আহার ও বিশ্রাম করিবে। কাল তাহারা সমস্ত দিন উপবাস করিয়াছে, আজ প্রত্যুষে স্নান করিয়াছে ব্রাহ্ম মূহূর্তে, তারপর মন্দিরে গিয়াছে—এই শুভোৎসবের দিনে স্বয়ং আচায তাহাদিগকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দান করিয়াছেন। অপরাহ্নে আবার উৎসব। ততক্ষণ তাহাদের বিশ্রাম।

এবার ভাসানু তরী তোমারে স্মরিয়া
ত্রিভুবনপতি ওহে বিশ্বের কাণ্ডারী,
ভাসিনু অগাধ স্রোতে তোমারে বরিয়া,
নাহি কড়ি, করো পার, নিঃস্বের ভাণ্ডারী।

অকূল এ পারাবার, পার তার নাই,
তবু জানি তুমি আছ, আছে তাই পাড়।

তুমি আছ স্থলে জলে যত দিকে চাই,
তুমিই কাণ্ডারী প্রভু, তুমি পারাবার।

তুমিই আকাশ জানি, তুমিই সবিতা,
তুমিই প্রকাশ নিজে সবিতার জ্যোতিঃ,
তুমিই মাতার মাতা, তুমি বিশ্বপিতা,
জীবনে সারথি তুমি, তুমিই ত রথী।
মায়ের আদর তুমি, জায়া মায়া মিতা,
লইনু শরণ তব, পতির হে পতি!

'পতির হে পতি'—চিন্তাহরণ কি বলিতে চাহে, বলিতে পারে না। তাহার প্রার্থনা তুমি শুনিবে না পিতা! অস্ফুট যে তাহার কণ্ঠ! কথা দাও, কথা জোগাও! পথ দেখাও তাহার বালিকা বধূ মনোরমাকে— তুমিই ত তাহার 'পতির পতি'।—মাথা লুটাইয়া চিন্তাহরণ উপুড় হইয়া পড়ে উন্মুক্ত ছাদের এক কোণে।

গিরীশ মনে মনে আবৃত্তি করে Lead kindly Light! Lead me on. তমসা মাং জ্যোতির্গময়, অসতো মাং সদগময়ো। তাহার পথ আলোকিত; আরও আলোকিত হইবে এই পথ। ইংরেজী প্রার্থনারাশি তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে। সন্ধ্যায়·আজ আছে ইংরেজীতে আচার্যের প্রার্থনা, তারপর ইংরেজীতে বক্তৃতা। তাহা শুনিবার আগ্রহে গিরীশ অধীর হইয়া আছে। অধীর হইয়া সে গৃহমধ্যে পদচারণা করে।

রাজীব বিশ্রাম করিতে চাহে;—এখনো মন্দিরে উৎসব চলিতেছে। ইহার পরেই সেও গিয়া তাহাতে যোগদান করিবে। কত কাজ সম্মুখে, কত সাধনা, কত সংগ্রাম!—অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অন্যায়ের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জাতীয় জড়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম—ইহাই ত ব্রহ্মদীক্ষা, বজ্রমন্ত্রের দীক্ষা।

রাজীব শুইয়া থাকিতে পারে না। উঠিয়া দাঁড়াইল।

চলো।—সে গিরীশকে বলে।

কোথায়?

মন্দিরে! উৎসবে।

চিন্তাহরণকে ডাকিয়া লইতে গিয়া তাহারা দেখে—সে বুঝি ধ্যানে অচেতন। সম্মুখে একখণ্ড কাগজে সদ্যলিখিত প্রার্থনা, 'এবার ভাসায়ু তরী তোমারে স্মরিয়া।'

১২

বিধাতার যখন শরণ হইয়াছে, তখন তাহারা আর ত কোনো ভয় করে না। তাঁহার যাহা ইচ্ছা করিবেন, চিন্তাহরণের তাহাতেই মঙ্গল। গিরীশও ভয় করে না। এইবার নির্ভর করিবে তাহারা নিজেদের উপরে; আর পিতার মমতা দাক্ষিণ্যের উপরে নির্ভর করিবে না। সেই আরামের সুযোগ না ছাড়িলে আপনার অধিকার লাভ করা যায় না। রাজীবের পক্ষে অবশ্য তাহা ত্যাগ কষ্টসাধ্য নয়। সে ত অল্পাধিক স্বাবলম্বীই। তিন জনে মিলিয়া একসঙ্গে অন্যত্র এইবার বাসা লইয়া থাকিবে। দুইজনার বৃত্তির টাকা আছে, তাহাতেই তিন জনার চলিবে। চিন্তাহরণের এবার পরীক্ষার বৎসর, রাজীবের পরীক্ষা নিকটেই। তাহাদের সময় নষ্ট করা চলিবে না। পড়িতে হইবে, পরীক্ষায় বৃত্তি আদায় করিতে হইবে। ততদিন গিরীশই কলেজে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহ শিক্ষকতা করিবে।

প্রয়োজন হয় দুই বেলা, তিন বেলা সে ছাত্র পড়াইবে। কাহারও তাহারা মুখাপেক্ষী হইবে না।

দীক্ষার পরে এক সঙ্গে তিনজনা পূজা পর্যন্ত কলিকাতায় যাপন করিল। চিন্তাহরণ চাহে দীক্ষা শেষে আচার্য্যের নিকট সাধনা বুঝিয়া লয়; সাধন পথ গ্রহণ করিতে তাহার ইচ্ছা। গিরীশও রাজীব আপাতত কলিকাতার বিরাট জ্ঞান ও কর্মের আয়োজনে, এই ব্রহ্মমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ স্ব-জন সমাজে কিছু দিন যাপন করিবে। হৃদয়ে বড় আনন্দ জাগে, প্রাণে প্রেরণা আসে, অপরাজেয় হইয়া উঠে প্রতিজ্ঞা এই সংস্পর্শে।

হরকান্ত দত্ত নিজ গৃহেই তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে চাহিতেন। কিন্তু তিনি জানেন—উহারা তাহা গ্রহণ করিবে না। হরকান্ত দত্তও মানেন—গ্রহণ না করাই কর্তব্য। তিনি অদূরে বাসাবাটি ভাড়া করেন, কেহ উহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে সাহস করিবে না। তাহা ছাড়া, ভৃত্য হয়ত জোগাড় করিতে তিনি পারিবেন না, উহাদেরও ভৃত্য রাখিবার সাধ্য হইবে না। তাঁহার স্বগ্রামের পরিচারকটিকে দিয়া উহাদের গৃহকর্মে কিছু কিছু সাহায্য করাইতে পারিবেন। উহারা তাহাও বিশেষ গ্রহণ করিবে না, তাহা তিনি জানেন।—তেমন প্রয়োজন হইলে মহেশ উহাদের সংবাদাদি তাঁহাকে দিবে।

বাজার, কুয়ার জল তোলা, বাসন মাজা, কাপড় কাঁচা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া,—কোনো কাজই রাজীবের অনভ্যস্ত নয়। চিন্তাহরণ ও গিরীশ অপটু হস্তে তাহাতে যোগদান করে। ভৃত্য পাওয়া যাইবে না, তাহারা রাখিতেও পারিত না, রাখিবেও না। সর্বরকমে তাহারা স্বাবলম্বী।

গিরি ঠাকুরাণী শুনিয়া অস্থির হন। তাঁহার গিরীশ, তাঁহার চিন্তাহরণ —যাহাদের তৃণটি করিতে হয় নাই,—এমন ভাবে থাকে তাহারা

'মুহুরি কাকা' আসিয়া বলিলেন : চলো। যাইতে হইবে।

গিরীশ বলিল : কোথায় ?

কোথায় আর ? নিজের বাড়ি।

নিজের বাড়িতেই ত আছি।

চিন্তাহরণ কথা কম বলিল। রাজীব অবশ্য উঠিয়া ইচ্ছা করিয়াই গৃহকর্মে চলিয়া গেল। গিরীশ অনমনীয়। পিতা শপথ গ্রহণ করিয়াছেন—তাহাদের মুখদর্শন করিবেন না, তাহাদের ত্যজ্যপুত্র করিবেন। কোন্ মুখে তাহারাই বা যাইবে সেই পিতৃসমীপে ?

মুহুরি কাকা বলেন তাহা ত মুখের কথা কর্তা মশায়ের। রাগে দুঃখে কত কথাই ত বলে মানুষ। তাহা ত বোঝ।

তবে কি বলিতে চান—এই রাগ দুঃখ তাঁহার ঐরূপ লোক-দেখানো ?

মানী মানুষ, দশজনের কাছে তোমরা তাঁহার মুখ রাখিলে কোথায় ?

কথাটায় উল্টা ফল হইল।—মানী মানুষের পুত্রও মানীই হয়। তিনি মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করিতে পারেন। আমরা পৃথিবীর মুখামুখি দাঁড়াইতেও লজ্জা বা ভয় পাইব না।—গিরীশ উত্তর দেয়।

মুহুরি কাকা দ্বিপ্রহরের পূর্বেই আবার ফিরিয়া আসিলেন। জানাইলেন :

মাসী মা পাঠাইলেন। বলিলেন, 'বলো গিয়া আমি বলিয়াছি। আমি ত তাহাদের ছাড়ি নাই, তাহারা আমাকে ত্যাগ করিতেছে কোন ধর্মে ?'

কিন্তু এবারও মুহুরি কাকা ফিরিয়া গেলেন। গিরীশই বলিল : তিনি ও বাড়ির কে যে আমাদের তিনি সেই গৃহে আশ্রয় দিবেন ?

চিন্তাহরণ তবু বলে : মুহুরি কাকা, বুঝাইয়া বলিবেন, আমরা তাঁহাকে কোনদিন ছাড়িব না ; তিনিও যেন ত্যাগ না করেন। কিন্তু ও বাড়িতে আমরা বাস করিলে ঝামেলা বাড়িবে, লোকে তাঁহার উপর উপদ্রব করিবে।

আবার আসিলেন মুহুরি কাকা : তবে নন্দীগ্রাম চলো—তোমাদের মায়ের কাছে থাকিবে। দেখিয়া আসিবে তাঁহার দশা। আর তিনি বাঁচিবেন না।

চিন্তাহরণ বলে : এখন কয়দিন যাউক। না হইলে আমরা গেলে বাড়িতে ও তাঁহাদের বড বিপদ হইবে। তাঁহাদের ঠাকুর দেবতা পূজা-আর্চার অন্ত নাই। আমরাও তাহা মানিতে পারিব না; তাঁহারাও খৃষ্টান ছেলেকে বাড়িতে লইয়া আসিলে গুরু পুরোহিত সকলের নিকট বিপন্ন হইবেন। সত্য বলিতেছি, পরীক্ষার শেষে গিয়া মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব।

মুহুরি কাকার যাতায়াত তথাপি শেষ হইল না।

কর্তা নন্দীগ্রামে চলিয়া গিয়াছেন,—তোমাদের মায়ের অবস্থা বাড়িতে খারাপ। এখন অন্তত শহরের বাসায় চলো, আর ত মুখ দর্শনের কথা উঠিবে না।

গিরীশ জানায় : কিন্তু মাসী মায়ের বিপদ ও গঞ্জনা আমাদের জন্য বাড়িবে। এমনিতেই লোকে তাঁহার নামে দোষারোপ করে; কেহ তাঁহাকে তখন আর ছাড়িবেনা।

কথাটার পশ্চাতে অন্য কোনো আভাস ছিল কিনা কে জানে। কিন্তু মুহুরি কাকা উত্তরটা ঘুরাইয়া বলিলেন :

বেশ, তোমরা বহির্বাটিতে কাছারি ঘরে স্বতন্ত্র থাকিবে। তোমাদের জন্য মাসী মা ভিন্ন চাকর ঠাকুর ব্যবস্থা করিবেন। তিনি শুধু রাঁধিয়া পাঠাইয়া দিবেন ভিতর হইতে।

কিন্তু কাহার টাকায় এ ব্যবস্থা হইবে? কাহার গৃহে আমরা যাইব? মাসী মায়ের সেই বাড়িতে কি অধিকার আছে?—গিরীশ শুনিবে না।

তাঁহার অধিকার নাই, অধিকার তবে কাহার?—'অধিকার' আইনের

কথা, মুহুরি মহাশয়ের তাহা দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু দুর্বোধ্য এই ছেলেদের কথা। এই ত ইহারা বলে—যাহাতে অধিকার নাই তাহা তাহারা গ্রহণ করিতে পারিবে না, তেমনি মাসী মাও তাহা দিতে পারিবে না।

রাজীবকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন 'শহরের মাসী মা'। রাজীব বিপন্ন বোধ করিল। গিরি ঠাকুরাণীর কথা অগ্রাহ্য করিবার মত তাহার শক্তি নাই। কিন্তু সে করিবেই বা কি? তাহারা ত পীতাম্বর গাঙুলীর বাড়িতে ফিরিয়া যাইবে না। গেলে তাহাদের জীবনের অনেক আদর্শ আর উদ্‌যাপন করা সম্ভব হইবে না। পুরাতন বন্ধন বাধা বিঘ্ন সবই আসিয়া জড়াইয়া ধরিবে, আর তাহার ফলে শিথিল হইয়া যাইবে তাহাদের দীক্ষা দিনের শপথ—চিন্তাহরণ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মোৎসর্গ করিবে; গিরীশ জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করিয়া আত্মোন্নতি করিবে, ইউরোপের মুক্তিমন্ত্রে সমস্ত সমাজকে অনুপ্রাণিত করিবে; আর সে রাজীব,—সে কি করিবে? অত দৃপ্ত তাহার তেজ নাই, অত গভীর তাহার চেতনা নয়। সে সমাজ সংস্কারে ইহাদেরই পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া লইবে বাস্তব কার্য-ভার। এই তাহাদের শপথ। তাহারা কি আর পুরাতন গৃহাবাসে ফিরিয়া গেলে ইহা পালন করিতে পারিবে? কিছুতেই পারিবে না।

রাজীব দৃঢ় মনে সাক্ষাৎ করিতে গেল। গিরি ঠাকুরাণী রাজীবকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল।

কি এত পাপ আমি করিয়াছি, একবার দেখাও করিতে আসিলে না? তোমরাও আসিলে না আমাকে দেখিতে?

এইবার রাজীবের বিচলিত হইবার পালা। কি হইয়াছেন সেই হাস্য মর্যাদাময়ী মাসী মা। কি হইয়াছেন দেখিতে! না, যতক্ষণ দূরে থাকা যায় ততক্ষণই মানুষের মায়া-মমতার বন্ধনকে দূরে রাখা যায়। বিশেষত,

এই নারী-জাতির, এই মাতৃ হৃদয়ের আক্ষেপ। রাজীবের মা আজ নাই বলিয়াই ত এত সহজে সে গৃহত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই কথা মনে করিতেই সে 'শহরের মাসী মায়ের' ব্যাকুলতায়ও বিচলিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু পথ নাই, উপায় নাই। 'একবার কোনো ছিদ্রপথে দুর্বলতাকে প্রবেশ করিতে দিলে আর তুমি আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না'—গিরীশের এই অভিমত সেও মানে।

শেষাবধি রাজীব তবু স্বীকার করিল: দেখা করিব না কেন? আমরাই দেখা করিব আপনার সঙ্গে।

কিন্তু যখন গৃহে ফিরিয়া গেল তখন গিরীশ তাহার কথায় স্বীকৃত হইল না।—দেখা মাসী মায়ের সঙ্গে করিব, কিন্তু ওই বাড়িতে গিয়া নয়। ওই বাড়িতে তিনি থাকিতেও নয়।

গিরীশের উগ্র মতই মানিতে হয়, চিন্তাহরণ' বা রাজীব তাহা উপেক্ষা করিতে পারে না। গিরি ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করিবার কথা আর উঠিল না। আদর্শ পালন করিতে হইবে।

দিন যায়। কঠোর জীবনের কঠোর সাধনা, অধ্যয়ন, গৃহকর্ম, সব লইয়া একটা ব্রত উদ্‌যাপনের গম্ভীর গর্ব তাহাদের মনে। পৃথিবীতে একটা মহৎ কর্মের জন্য তাঁহারা উৎসৃষ্ট জীবন। কোথাও তিলমাত্র ছিদ্র নাই দুর্বলতা প্রবেশ করিতে পারিবে না। আদর্শ জয়ী হইবে।

হঠাৎ একেবারে স্বয়ং গিরিঠাকুরাণী আসিয়া উপস্থিত। গিরীশ তখন ধুচুনিতে চাউল ধুইতেছে, রাজীব কুয়া হইতে জল তুলিতেছে, চিন্তাহরণ চুলা লইয়া ব্যস্ত। বাহিরে মুহুরি মহাশয় গাড়ী শুদ্ধ অপেক্ষা করিতেছেন।

সব ফেলিয়া তাহারা এবার সকলে ছুটিয়া গেল: মাসী মা!

গিরীশই সর্বাগ্রে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিল। এতক্ষণ যিনি আত্মসম্বরণ করিয়া ছিলেন, এবার তিনিও একেবারে উদ্বেলিত বেদনার ভারে ভাঙিয়া পড়িলেন। চোখে জল আসিতেছিল চিন্তাহরণের। দেখিয়াই গিরীশ সাবধান হইল। আপনাকে কঠোর ভাবেই শাসন করিতে জানে গিরিশ ; তাহার চোখে আর জল আসিবে না।

গিরি ঠাকুরাণী বলেন : এত শত্রু আমি তোমাদের! দেখাও করিবে না?

শত্রু! দেখা করিবে না—গিরীশও বুঝিয়া একবার করুণ ভাবে হাসে। পরক্ষণেই সতর্ক হয়—না, এই দুর্বলতা পরিহার করিতে হইবে। শুধু বলে : দেখা করিব না কে বলিয়াছে?

করিলে কোথায়? আমি যে পথ চাহিয়া চাহিয়া পাগল হইয়া গেলাম।

ওই পথে আমি কোথায় যাইব? ওই বাড়িতে আমি যাইব না।

কথা অনেক হয়। কিন্তু গিরীশের অনমনীয় পণ। সে বলে : তুমি কেন, মাসীমা, আসো না আমাদের এ বাড়িতে? তুমি ভিন্ন থাকিবে, সব ব্যবস্থা ভিন্ন হইবে, তোমার বাসন-কোসন আমরা ছুঁইব না। তোমার নিরামিষ রান্না আমরা কত খাইতাম। আবার তেমনি কাড়াকাড়ি করিয়া খাইব সকলে।—বলিতে বলিতে একবার গিরীশের স্বর কেমন আগ্রহে ভরিয়া উঠে।

মাসী মা একটু চমকিত হইলেন। পরক্ষণে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন : ওরে আমি রাঁধিয়া পাঠাইলে তোরা খাবি?

হঠাৎ উচ্ছল হয় গিরীশের কণ্ঠ : রাঁধিয়া দেখো না। বেশ ত রাঁধো তুমি আজই এখানে। দ্যাখো বসিয়া, আমরা তোমার রান্না খাই, না ফেলিয়া দিই।

কিন্তু কথা বলেন না আর গিরি ঠাকুরাণী। মাথা নত করিয়া কি ভাবেন। গিরীশের মুখের দিকেও তাকাইবেন না নাকি?

চিন্তাহরণ বুঝিল, বলিল: আমাদের কাছে আসিয়া থাকিতে পারিবে না, মাসী মা? আমরাও ত নিরামিষই খাই।

গিরি ঠাকুরাণী মুখ তুলিলেন। কেমন ব্যথায় কাতর মুখ, কথা বলেন না। তিনি বুঝিতে পারেন—চিন্তাহরণ আহত হইল, গিরীশের প্রবল আগ্রহও ক্ষোভে পরিণত হইতেছে। আর তাঁহার আপন আকাঙ্ক্ষা? কিন্তু না, আর নয়, আর নয়। তাঁহার অপরাধেই ত আজ এত শাস্তি সকলের—সমস্ত আত্মীয়ের। নিজের অপরাধ আর তিনি বাড়াইবেন না কোনো আকাঙ্খায়, কোনো স্নেহ-মমতার ভ্রান্ত আকুলতায় আর তিনি এই সংসারের উপর ঠাকুর দেবতার ক্রোধ-অভিশাপ টানিয়া আনিবেন না।

মুখ ফুটিয়া শেষে গিরি ঠাকুরাণীকে বলিতে হইল:

অপরাধ অনেক হইয়াছে, বাবা। না হইলে এত শাস্তি কি ঠাকুর আমাকে দিতেন? আর তাহা বাড়াইতে চাহি না। ঠাকুর দয়া করুন্ তোমাদের – তোমার মা বাবার প্রাণ জুড়াক!

বলিতে বলিতে তিনি একবার উঠিলেন, পিছন ফিরিয়া চোখ মুছিলেন। বুঝা গেল দেহ কাঁপিতেছে রুদ্ধ ক্রন্দনে।

একি অদ্ভূত কথা বলিতেছেন মাসী মা? ব্রত, নিয়ম, উপবাস—তিনি পূর্বেও যথারীতি পালন করিতেন, তাহা চিন্তাহরণ-গিরীশ সকলেই দেখিয়াছে। কিন্তু এই পাপ-বোধ ও অনুশোচনা, ইহা ত তাঁহার মুখে কোনো দিন তাঁহারা শোনে নাই; শুনিবে, তাহা কল্পনা ও করিতে পারিত না। সকলের সুখে তিনি সুখী হইতেন,—দুঃখে বেদনা পাইতেন; কিন্তু জীবনকে তিনি গ্রহণ করিতেন স্বচ্ছন্দে,

কর্মকুশল উদ্যোগে, আনন্দে, সহজ তৃপ্তিতে, চারিদিকে স্বাচ্ছন্দ্য ও সহজ কৌতুক বিতরণ করিয়া। সেই মাসী মা—কি বলিতেছেন? 'তাঁহার অপরাধেই' গাঙ্গুলী পরিবারের সকলে এই মনস্তাপ পাইল? তাঁহাদের হারাইয়া মাসী মা আপনার সেই আত্মবিশ্বাস ও সেই সহজ প্রসন্নতাও হারাইতেছেন,—ভাবিয়া চিন্তাহরণের মনে মনে ব্যাকুলতা জাগে।

কিন্তু গিরীশের অভিমান আহত হয়। পাপবোধ, অনুশোচনা তাহাকে বিষম ক্ষুব্ধ করে। ব্রাহ্মসমাজেও সে ইহা সহ্য করিতে পারে না। তাহা ছাড়া, মাসী মা মনে করেন—তাহারা গর্হিত কিছু করিয়াছে।—তাহারা অন্যায় অপরাধ করিয়াছে বলিয়াই মাসী মা নিজেকে অপরাধিনী মনে করেন! কাহাকেও গিরীশ বিচার করিতে চাহে না,—প্রত্যেকেরই অধিকার সে স্বীকার করে। কিন্তু বিচার করিতে হইলে কাহাকেও সে বিচার করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না—হউক সে পিতা, হউক সে মাতা। গিরীশের সেই কঠিন বিচারবোধ দৃঢ় কণ্ঠেই বলিবে—"তোমার এই আত্ম-ছলনা, মাসীমা, আমার অগ্রাহ্য। তোমাদের অপরাধ তোমাদের, আমাদের অপরাধ আমাদের। আমাদের কর্মকে তোমাদের কর্মফল বলিয়া আমি স্বীকার করি না। ভালো, হউক, মন্দ হউক, তাহা আমারই কৃত, আমিই তাহার ফলভাগী হইব। না, তোমরা তাহার জন্য দায়ী নও। কেন তবে অনুশোচনার নামে তোমাদের এই অভিযোগ?"

গিরীশের অভিমানও তাই অভিযোগে পরিণত হয়—মাসী মায়ের কেন এই আত্ম-ছলনা? কেন এই মিথ্যা দোষারোপ তাহাদের প্রতি?

একটা নিস্তব্ধতা আসিল গৃহে। কোথা দিয়া যেন একটা দুস্তর ব্যবধান ঘটিয়া আছে, তাহারই আভাস দেখা যাইতেছে। কেন গিরি ঠাকুরাণী তাহাদের নিকট থাকিতে আসিবেন না? সেই পীতাম্বর গাঙ্গুলীর

আশ্রয় অপেক্ষা তাঁহার পুত্র-প্রতিম যুবকদের এই গৃহে তিনি কম মর্যাদা লাভ করিতেন ?—গিরিশ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে।

রাজীব আবার বলিল : আপনার আচার বিচার সব ঠিক থাকিবে, মাসী মা, আমরা বাধা দিব না।

গিরি ঠাকুরাণী তথাপি নির্বাক। চিন্তাহরণও ম্লান মুখ। একটা অভাবনীয় অস্বস্তি আসিয়া পড়িতেছে গৃহমধ্যে, রাজীব তাহা বুঝিতে পারে না। রাজীব তাহা সহ্যও করিতে পারে না।

সে-ই বলিল : ভাবিয়াছিলাম নিরামিষ খাই, মুখ ত পচিয়া গেল। আপনি থাকিলে, মাসী মা, অন্তত আপনার 'মরিচ-ঝোল' আর 'তিতার ঝোল' খাইয়া মুখটায় রুচি ফিরিয়া আসিত।

ভোজন-রসিক বলিয়া রাজীবের সুনাম ও আদর মাসী মায়ের নিকট অনেক দিনের। কথাটায় তাই সেই লঘু সরস স্বাচ্ছন্দ্য খানিকটা জাগিয়া উঠিল। ভার কিন্তু কাটিল না, সব বুঝিয়াই তাহাও যেন মানিয়া লইল সকলে।

গিরিঠাকুরাণী বলিলেন : কেন চলো না আমার সঙ্গে এখনি—খাইয়া দাইয়া ফিরিবে তিন জনা ? গিরিঠাকুরাণী তাকাইয়া রাহলেন, বলিলেন : —গিরীশ যাইবে না, চিন্তাহরণেরও ইচ্ছা নাই—গাঙুলী মশায়ের উপর তাহাদের রাগ। কিন্তু তোমার ত সেইসব কিছু নাই, রাজীব। তুমি কেন চলো না—মাসী মায়ের রান্না খাইবে ?

অস্বস্তির আবহাওয়াটাকে কাটাইবার জন্যই রাজীব বলিল : যাইব না কেন ? এক শ বার যাইব। কিন্তু গোলমাল করিবে না, মাসী মা, আপনার দাসী চাকরেরা ?

সে আমি বুঝিব।

বেশ চলুন। আপনি বাড়ি গিয়া রাঁধুন।

রাজীব সত্যই সেদিন গেল, আহারও করিল তৃপ্তির সহিত। গিরীশের অভিমান তাহার অপরিজ্ঞাত রহিল না। কিন্তু চিন্তাহরেণের অনুমোদনও রাজীব অনুভব করিতে পারে। তাহা ছাড়া সে বোঝে—ইহারা চিরদিনকার সহজ সম্পর্কের মধ্যে মেঘ জমাইয়া তুলিতেছে কি বুঝিয়া, কি না বুঝিয়া। তাহা দূর করা না যাউক, হাল্কা করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে না কেন রাজীব? মাসী মা তাঁহারও প্রাণ-রক্ষয়িত্রী, মাতৃসমা, আর নারীজাতি।—অবশ্য বেশি দিন এইভাবে সম্পর্ক রক্ষা সম্ভব হইবে না। হয় বন্ধন আঁটিয়া ধরিবে, নয় তাহা কাটিয়া যাইবে। কিন্তু আপনা হইতে ত কোন জিনিস ঘটিতে পারে না। তাহাদের সব সম্পর্ক তাহারা আপন হাতেই ভাঙিবার গড়িবার দয়িত্ব লইয়াছে—সেই ভাদ্র-প্রভাতে দীক্ষার দিনে। পুরাতন বন্ধন ত খসিয়া যাইবেই।

রাজীবকে লইয়াও টানাটানি হইল। দেবপ্রসাদের পত্র লইয়া আসিয়াছে অনন্ত। রাজীবের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের সংবাদ পাইয়া রাঘব খুব লাফালাফি করিয়াছে—সে রাজীবকে বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকিতে দিবে না। বাড়িতে কেন, গ্রামেই ঢুকিতে দিবে না, ঠ্যাং ভাঙিয়া দিবে, ইত্যাদি। কিন্তু দেবপ্রসাদ চৌধুরী মূর্খ নহে; সে অপেক্ষা করিয়াছে, ভাবিয়াছে, শেষে অনন্তকে পাঠাইয়াছে।

অনন্ত খাড়া দাঁড়াইয়া বলিল: ওঠ্।

তাহার চেহারা, কথা ও ভাব দেখিয়া সবাই অবাক্। এ কেমন মানুষ!—লম্বা চওড়া কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠ মূর্তি।

রাজীব পদধূলি লইয়া বলিল: কোথায়?

অনন্ত গোঁয়ার মানুষ। বলিল: কোথায় আবার কি? বাড়ি যাবি।

আমাকে বাড়িতে স্থান দিবে কি করিয়া?

গর্জিয়া উঠে অনন্ত : কেন? রাঘব 'লাফ ফাল পাড়িবে' বলিয়া? বাড়ি কি তাহার, না আমাদের? সে না থাকিতে পারে সে তাহার শ্বশুর বাড়ি যাউক্।

শুনিয়া হাস্য-সম্বরণ করা দায়। রাজীব জানিত—শ্বশুর বাড়ি স্থানটার উপর অনন্তের বিষম ক্রোধ আছে। আপন শশুর বাড়িতে বিবাহকালে কিছু কিছু উপহাস লাভ করিয়া সে ক্ষেপিয়া আছে, আর সেদিকে যায় নাই। এদিকে রাঘব শ্বশুর বাড়িতে একটু যাতায়াত বেশি করে বলিয়া রাঘবের উপর তাহার আরও বিশেষ বিরাগ।

কথা বেশি হইবার পূর্বেই আবার অনন্ত বলে : নে, বক্তৃতা রাখ্। এখন যাবি চল্। ছোট খুড়া বলিয়াছেন—এই নে তাঁহার চিঠি।

রাজীব পত্র পড়িল কৌতূহলে, ভয়ে, আনন্দে। সেই সংযত স্নেহ পত্রে। চিন্তিতভাবে রাজীব বলিল : এখন কি করিয়া যাই?

কি করিয়া যাবি?—ধরিয়া কাঁধে তুলিয়া লইয়া গিয়া তোকে ফেলিব একেবার ছোট খুড়ার কাছে। ছোট খুড়া বলিয়াছেন 'লইয়া আসিবে।'

চিন্তাহরণ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল! হয়ত গন্ধমাদন পর্বতও বহন করিত এই মানুষ।

রাজীব হাসিয়া বলিল : গেলে ত তোমার কাঁধে চড়িয়াও যাইতে পারি; তাহা জানি। কিন্তু পরীক্ষা শেষ না হইতে এখন যাইব না। পরীক্ষা দিয়া যাইব। ছোট খুড়াকে বলিলেই তিনি তাহা বুঝিবেন। বরং চিঠিও দিতেছি। পরীক্ষার ব্যাপার ত তুমি বুঝিতেছে।

অন্তকে বুঝাইতে একটু কষ্ট হইত, কিন্তু অনন্ত বুঝিল। পরীক্ষা ত একটা তুচ্ছ ব্যাপার নয়। সে অনন্ত, এক অক্ষর না শিখিলেও স্ত্রীলোক নয় ত; রাজীব ঠিকই বলিতেছে তাহার মত পরীক্ষার গুরুত্ব আর কে বুঝিবে?

অনন্ত চলিয়া গেল। গিরীশ যাহাই বলুক, পরীক্ষা শেষে রাজীব চিত্রসারে যাইবে। দেবপ্রসাদের পত্র বড় করুণ মনে হইয়াছে। মেজ খুড়া হরপ্রসাদ চৌধুরী তাহাব গৃহাগমন পসন্দ করিবেন না; কিন্তু তিনি বিদেশে। দেবপ্রসাদ ও মহেশ্বরী রাজীবকে ত্যাগ করিবেন না। শুধু তাঁহারা কেন? বাড়ির কে তাহাকে ত্যাগ করিবে? বৃদ্ধা 'বড় মা,' শিবপ্রাদের বিধবা, পিসি মায়েরা, শৈলীর মাতা, পিশ্‌তুত ভগ্নী ও ভাগিনেয়ীরা—না, বাড়িতে মেয়েরা সকলেই রাজীবের পক্ষীয়। দুঃখ তাহারা পাইয়াছে; দুঃখ সে-ই দিয়াছে তাহাদিগকে। কিন্তু সে তাহাদের অবজ্ঞা করিতে চাহে না, করিতে পারিবেও না। গিরীশের মত অত উগ্র পণে প্রয়োজন নাই। বাড়ির লোকেরাও তাহাকে অত পর মনে করিবে না। তাহাদের পর মনে করিলে কাহাকে সে আপন করিতে পারিবে?

১৩

গিন্নি ঠাকুরাণী প্রথম রাজীবকে জানাইয়াছিলেন, এখন চিন্তাহরণকেও বলিতে ভুলিলেন না: বউমা'র কি হইবে, চিন্তাহরণ?

চিন্তাহরণ মাথা নত করিল। সে কি করিয়া বলিবে কি হইবে। গিন্নি ঠাকুরাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। আপনার মনেই যেন বলিলেন: মেয়েজন্মের দুর্ভাগ্য যেন কাহারও না হয়।

চিন্তাহরণের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। হয়ত এই কথাই মনোরমারও কথা—চিন্তাহরণের বিরুদ্ধে—সমস্ত নারী জাতির দীর্ঘশ্বাস। সে তাড়াতাড়ি বলিল: এমন কথা কেন বলো, মাসী মা?

বলি কি সাধে। মাকেও ত দেখিলে না।—তুমি ত তোমার ধর্ম লইয়া মত্ত। কিন্তু সে যে স্ত্রী—তাহার ত ধর্ম বলিতেও তুমি।

গিরীশ হইলে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিত:—কেন, মেয়ে বলিয়া কি সে মানুষ নয়, তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাহার আপন ধর্মবোধ নাই? মানুষের প্রত্যেকেরই এই স্বাধীনতা আছে।—কিন্তু চিন্তাহরণ তাহা মানিলেও ভাবে—মনোরমা ইহাতে কোনো সান্ত্বনা পাইবে কি। সে নিজেই কি কোনো স্বস্তি পায়—এই যুক্তিতে?

চিন্তাহরণ বলিল: মাসীমা, আপনি কেন জিজ্ঞাসা করুন না—সে কি চায়।

হায়রে অদৃষ্ট! তোমরা কি তাহাও বোঝো না। সে হিন্দু মেয়ে, হিন্দু স্ত্রী—সে তোমাকে ছাড়া আবার কি চাহিবে?

চিন্তাহরণ নীরব হয়। নিশ্চয়ই ইহা সত্য। কিন্তু এই বিষয়ে যখন তাহাদের বন্ধুদের আলোচনা হইয়াছে তখন বহুবার সে গিরীশকে বলিতে শুনিয়াছে—এই সত্যের মধ্যেই সত্য নাই। কারণ, ইহা ত একটা সংস্কারের ফল। মানুষের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মতামতের ও বিচারের অবকাশ পাইল কোথায় সে-ই নারী? বিচার বুদ্ধিও হৃদয়বৃত্তির পরিষ্কার অনুমোদন যতক্ষণ কোনো সিদ্ধান্তে নাই, ততক্ষণ সেই সিদ্ধান্তকে সত্য বলিব কেন আমরা ব্রাহ্ম যুবকেরা?

চিন্তাহরণ তাই আবার বলিল: তবু আপনি তাহার মত জানুন না, মাসী মা। বরং আপনার কাছেই তাহাকে আনিয়া রাখুন—তাহার কথা শুনুন, একটু না হয় শিক্ষারও ব্যবস্থা করুন।

গিরিঠাকুরাণী খানিকক্ষণ মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন: কি বলিতেছ? আমার কাছে রাখিব তোমার

বউকে ? শেষে তোমার বউকেও আমি কাড়িয়া লইব ?—বলিতে বলিতে আবার তিনি সাবধান হইলেন—তোমার মা-বাবা তাহা অনুমোদন করিবেন কেন ? সে যে বাড়ির বউ—গাঙ্গুলী বাড়ির বউ। বিদেশে —আমার নিকটে—রহিবে কিরূপে ?

প্রচ্ছন্ন একটা ব্যথিত অনুশোচনা রহিয়াছে তাঁহার কথায়, আর যাহাই হউক—গাঙ্গুলী বাড়ির বউকে তাহার নিকট পাঠাইবেন না গাঙুলীরা, তিনিও বুঝি সেই ভার গ্রহণে অক্ষম।

আপনিও ত আমাদের মাসী মা !

গিরিঠাকুরাণী ব্যথিত হাসি হাসিলেন : সে কি তোমরাই আর বোঝো ? —তারপর বলিলেন : না চিন্তাহরণ, বিবাহ তুমি করিয়াছ ; এ দায়িত্ব তোমার। বউমাকে বরং তোমার কাছে তুমি আনিতে পার।— এইবার মনে পড়িল এই শ্রীহীন বাসগৃহের কথা—তাহাই আনো, চিন্তাহরণ। একজন মেয়ে গৃহে থাকিলে তোমাদের এই রান্নাবান্না ঘর দুয়ারেও লক্ষ্মীর হাত পড়িবে। আমরাও একটু নিশ্চিত হইতে পারিব। এ দেখা যায় না, তুমি রান্না করো, গিরীশ বাসন মাজে—

চিন্তাহরণ নিজের দ্বিধা প্রকাশ করিল : সে কি আসিবে ? — সে আপনাদের বউ মা। নন্দীগ্রামেও বাবা সে অনুমতি দিবেন না, তাহার পিত্রালয়ে সকলে আমাদের ঘোরতর বিরোধী।

গিরিঠাকুরাণী আবার নীরব হইলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন : তাই ত বলি—মেয়েজন্ম যে কি জ্বালা তাহা তোমরা পুরুষেরা কেহ বুঝিবে না।

চিন্তাহরণ এই প্রসঙ্গটা তখন আর তোলে নাই। গিরিঠাকুরাণীকে

বিদায় দিবার পর তাহা উঠিয়া পড়িল। গিরীশের কথায় মাসী মা আঘাত পাইয়াছেন।

গিরীশ, বড় কঠিনভাবে তুমি মানুষকে বিচার করিতেছে।

গিরীশ দাদাকে অমান্য করে না। তবে জানে দাদা দুর্বল প্রকৃতির, বাঙালী কবিতা পাঠ করিয়া যে মানুষ অভিভূত হয়, কবিতা লেখে, তাহার পক্ষে এইরূপ দুর্বলতা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই দুর্বলতা বর্জনীয়।

গিরীশ বলে: বিচার সর্বদাই কঠিন—সত্য যেমন কঠিন। সেখানে ভেজাল দিতে চাহিও না।

চিন্তাহরণ বলে: কিন্তু দয়া মায়াও সত্য। তাহার পর যোগ করে—দি দি কোয়ালিটি অব্ মার্সি ইজ্ নট ষ্ট্রেন্ড্। ইংরেজী উদ্ধৃতিতে গিরীশের সম্মতিলাভ বেশি সম্ভব। বিশেষতঃ ইহা শেক্স্পীয়রের কথা। চিন্তাহরণ নিজের পক্ষে গিরীশের সমর্থন চায়। রাজীবও তাই আশা করে—গিরীশ এই উক্তির জোরেই দাদার কথা মানিবে।

সত্যই গিরীশ মানিল। দয়ামায়ার কথা কেন, স্নেহ মমতাও কি সে মানে না? নিশ্চয়ই মানে। এই ত মাসীমাকে তাহাদের নিকট থাকিবার জন্য বলিল। কিন্তু তিনি যে তাহার নিজের চতুষ্পার্শ্বের বন্ধন ছেদন করিবেন না। উহাতে যে তাঁহার কোনো মর্যাদা নাই, সেকথাও বুঝিতে চাহেন না। বরংএখন আবার মন-গড়া সব পাপ-পুণ্য অনুতাপ-অনুশোচনা গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাই ত গিরীশ কঠিন ভাবেই সত্যকে উদ্‌ঘাটন করিয়াছে।—'যেন আমরাই অন্যায় করিতেছি। আর তিনি অনুতাপ করিয়া মরিবেন, তাহাতেই আমাদের উদ্ধার হইবে।'

চিন্তাহরণ ও রাজীব দুই জনাই ইহাতে আপত্তি করিল: না। মাসীমাকে তুমি ভুল বুঝিতেছ।

চিন্তাহরণ জানাইল : আমরা তাঁহার মানসিক জ্বালা-বেদনার কথা জানি না। তাই সেদিন তিনি—আমাকে বলিলেন : 'মেয়েজন্মের দুর্ভাগ্য যেন কাহারও আর না হয়।'

গিরীশ বলিল : ওইত! মেয়েজন্ম দুর্ভাগ্যের হইবে কেন?

চিন্তাহরণ স্বীকার করে : আসলে তাহা দুর্ভাগ্য নয়। কিন্তু আমাদের দেশে ত তাহাদের সত্যই কত বিপদ।—একটু নীরব থাকিয়া চিন্তাহরণ জানায় : বলিলেন, 'তোমরা আমাকে কেন রাখিতে চাহ? মনোরমাকে তোমাদের কাছে আনাও। তোমার সে বিবাহিতা স্ত্রী। তাহা ছাড়া তাহারও গতি নাই।'—মরীয়া হইয়া সে বলিয়া ফেলে।

কথাটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ও সমস্যার কথা। তিনজনে তাহার ইতিহাস আলোচনা না করিয়াছে তাহা নয়। তখন এক রকম ইহাই তাহারা জানিত—এই বিবাহকে বিবাহ বলাই অন্যায়। মনোরমা সেচ্ছায় যদি কোনো দিন তাহা স্বীকার করে তবে অবশ্য তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।—চিন্তাহরণ এখন কি অন্যরূপ মনে করিতেছে? গিরি ঠাকুরাণীর পরামর্শই তাহার মনঃপূত? কয়েকটা মন্ত্র পড়িলেই বিবাহ করা হয় না, তিন বন্ধু তাহা একদিন বিশ্বাস করিত। কিন্তু ক্রমেই যে চিন্তাহরণ এই কথায় আস্থা রাখিতে পারে নাই, তাহা বুঝা যাইতেছিল। আজ গিরীশ তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতেছে।

কিন্তু রাজীবও ভাবিল—গিরীশ ঠিক বলিয়াছে বটে, কিন্তু সত্য সত্যই মনোরমার কি হইবে, আর চিন্তাহরণই বা করিবে কি? এইরূপে চিরদিন চলিবে না। এতদিন কিছুই আসলে ঠিক হয় নাই।

আজও ঠিক হইল না। গিরীশ গম্ভীর হইল। পরে বলিল : সেই মহিলাকে জানানো প্রয়োজন—তিনি স্বাধীন। আগে তিনি স্থির

করুন—তিনি তোমার স্ত্রী থাকিতে চাহেন কিনা। না হইলে এই বিবাহ আমরা মানিব কেন ?

সেই পুরাতন সিদ্ধান্ত। কিন্তু বড় কঠিন প্রাণহীন ঠেকে এখন তাহা।—সমস্যার কোন্ সমাধান হইল ইহাতে ?

গিরীশ প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া যায়—ব্রাহ্ম সমাজেও দুর্বলতা প্রশ্রয় লাভ করিতেছে। হিন্দু সমাজের স্ত্রীদের লইয়া ব্রাহ্মদিগের বিপদ কি কম ? আশ্রমই করুন্ আর যাহাই বলুন, স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতা, প্রভৃতি বিষয়ে দেখা গিয়াছে প্রবীণদের উৎসাহ অল্প। পিতামাতার মনে আঘাত দিবার নামে, কিম্বা স্ত্রী-পুত্রের পীড়াপীড়ির ওজর তুলিয়াও নানাভাবে ব্রাহ্ম ধর্মের মহৎ আদর্শকে খর্ব করা হয়। ইহার বিরুদ্ধে তাঁহাদেরই দাঁড়াইতে হইবে। অবশ্য চিন্তাহরণ ও রাজীব তখন পরীক্ষার্থী ;—তাহারা তত পরিশ্রম করিতে পারিবে না। কিন্তু গিরীশ ও তাহার বন্ধুরা একটা নূতন পাক্ষিকপত্রের পরিকল্পনা করিতেছে —জ্ঞানপ্রচারই হইবে তাহার লক্ষ্য—কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাহাদের আমরণ সংগ্রাম।

চিন্তাহরণ ও রাজীব পরীক্ষার্থী হইলেও একেবারে দূরে থাকিতে পারে কিরূপে ? কাজের মত কাজ হইবে, আর তাহারা দূরে থাকিবে ? বিশেষত গিরীশকে সাহায্য না করিয়া রাজীব পারে ? চিন্তাহরণ কবিতা না লিখিলে বন্ধুরা ছাড়ে ? অথচ সে কবিতায় লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি পৌত্তলিক ছোঁয়াচ থাকিয়া যায়। এই দুর্বলতাও গিরীশ সহ্য করিতে পারে না। 'নিজের শিক্ষার জন্য বরং, দাদা, প্রবন্ধ লেখো—ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করো।' নানা প্রসঙ্গ লইয়া জল্পনা-কল্পনা হয়, কাজও আরম্ভ হয়। তিনজনেই মাতিয়া থাকে এই উৎসাহে, কিন্তু একটা দূরত্বও যে থাকিয়া যায় তাহাও সত্য। যত চেষ্টাই করুক চিন্তাহরণ ও রাজীব,

তাহারা গিরীশের সঙ্গে পারিয়া উঠে না। রাজীব চিন্তাহরণ তাঁহারই কথা মানিয়া লয়, কিন্তু অনুভব করে মাসীমায়ের সঙ্গে তাহার ব্যবহার, পীতাম্বর গাঙ্গুলীর প্রতি তাহার বিরূপতা—সবই যেন বড বেশি উগ্র। আর, মনোরমার বিষয়ে চিন্তাহরণ যে কি করিবে, তাহার যে দায়িত্ব আছে, উহা যেন গিরীশ ভাবিতে চাহে না। বুঝিয়া শুঝিয়া তাই কেহই সেই কথা বিশেষ উত্থাপন করিতে চাহে না আর তাহার নিকট।

পথও ততক্ষণে জটীল হইয়া উঠিল। ব্রহ্মানন্দকে পূজা করিতেছে ব্রাহ্মরা। আচার্যকে অমন পূজা কবিবে কেন ? গিবীশ চটিয়া ক্ষিপ্ত হয়। 'নরপূজা' কথাটা কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। কলিকাতাতেই তাহার মনে হইয়াছিলে—এই দিকে ঝোঁক দেখা দিতেছে। তাহারা নব ব্রাহ্মযুবকেরা আরও দৃঢ হইবে তাহাদের মতে, আরও জোরে কলম ধবিতে হইবে 'মহাপাপ বাল্যবিবাহের' বিরুদ্ধে, আরও সুদৃঢ় ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে ব্রাহ্ম আন্দোলনকে—কোনো বন্ধন আর রাখিবে না।

যেন বন্ধুদের দ্বিধাকে তিরস্কার করিবার জন্যই গিরীশ তাহার পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিল।

চিন্তাহরণও রাজীবের তখনো দ্বিধা। বাপ মা, খুড়া, খুডী সকলেব কথাই তাহারা ভাবে। মনে শান্তি নাই। চোখে নিদ্রা নাই। 'হে পরম ব্রহ্ম, পথ দেখাও! সত্য পথে চালনা করো।' গিরীশ দৃঢ় গম্ভীর। ব্রহ্ম ক্ষমা করিলেও সে ক্ষমা করিতে পারে না দাদার ও রাজুর দ্বিধা। চিন্তাহরণের যাহাই হউক, রাজীবের পক্ষে গিরীশের সম্মতি ভিন্ন দিন চলে কিরূপে ? তবু চিন্তাহরণই প্রথম উপবীত-ত্যাগ করিল, রাজীবও আর দেরী করিল না। আত্মীয় পরিজন কুটুম্ব দেশবাসী শিহরিয়া উঠিল ভয়ে।

গৃহত্যাগে যতটা কোলাহল হইয়াছে, উপবীত ত্যাগে তদপেক্ষা

অনেকগুণ বেশি বিস্ময় ও ত্রাসের সঞ্চার হইল পরিবারে সমাজে। কাহারও বাঙনিষ্পত্তি হয় না।

পরিবারের মূল বন্ধন তাহারা কাটিয়া ফেলিল। গৃহে ফিরিবার পথ নিজ হইতে রুদ্ধ করিয়া তাহারা এবার মুখ ফিরাইল সম্মুখের দিকে।

এবার আর গিরি ঠাকুরাণী কাঁদিলেন না, রাজীবকে আর ডাকাইয়া পাঠাইলেন না। পীতাম্বর গাঙুলী অবশ্য আবার শহরে আসিলেন, একেবারে শেষ আশা চূর্ণ হইতেছে। আর একবার হৈ চৈ করিলেন:

যাহা বলিয়াছি অন্যায় হইয়াছে। আমি তোমাদের ত্যজ্য পুত্র করি নাই।

গিরীশই কথা বলিল বেশি: করিলে কিছু অন্যায় হইবে না।

অপরাধীর মত পীতাম্বর বলেন: না, না, আমি করি নাই।

করাই উচিত। আর না হইলেও আমরা আপনার সম্পত্তি চাই না।

পীতাম্বর বুঝাইতে চাহেন: তোমরা আমার শ্রাদ্ধের অধিকারী, পিণ্ডের অধিকারী,।

না, আপনি তাহা পাইবেন না।

পিণ্ড পাইব না?—পীতাম্বর গাঙুলীর চক্ষু আশঙ্কায় ইতস্তত ঘুরিতেছে।—পিণ্ডও পাইব না?

হঠাৎ তিনি পৈতা দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন চিন্তাহরণের হাত: চিন্তাহরণ! তুমি, বাবা, অন্তত পৈতাটা রাখো—একটা কথা রাখো আমার। ঘরে যে তোমার বউ রহিয়াছে। অধর্ম করিও না।

চিন্তাহরণ অধোমুখ হইল। গিরীশ উঠিয়া গেল। চিন্তাহরণ একটি কথাও বলিল না আর।

সত্যের পথ ক্ষুরধার। তাহাতে চলিতে গেলে চরণ রক্তাক্ত হইবে

কিন্তু চলিতে হইবেই। বহু প্রার্থনার মধ্য দিয়া সেই সত্যকে গ্রহণ করিবার মত বল চিন্তাহরণ আপনার মনে সঞ্চয় করিতে পারিয়াছে। পরমেশ্বরের করুণা না হইলে তাহা সম্ভব হইত না। সেই করুণায় তাহার হৃদয় অভিষিক্ত। কিন্তু তাহার হৃদয় বড় দুর্বলও। এই ত, কেমন মোচড়াইয়া উঠিল—পিতার এই আকুল আবেদনে। ইহার অপেক্ষা আরও শত গুণে চিন্তাহরণের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইলে। হয়ত সেই রুগ্না জননীর অশ্রুজলে তাহার সঙ্কল্পও ভাসিয়া যাইত। গিরীশ মিথ্যা বলে না—'ইহা দুর্বলতা; এবং দুর্বল কখনো সত্যলাভ করিতে পারে না।' · এই দুর্বলতাই চিন্তাহরণকে গ্রাস করিতে আসে তাহার পত্নী মনোরমার নামে আর-একরূপে। কতটুকু তাহাকে চিন্তাহরণ দেখিয়াছে? কতটুকুই বা সেই বালিকা জানে চিন্তাহরণকে? তথাপি—গিরীশের কথামত তাহাকে স্ত্রী বলিয়া না মানিলেও—চিন্তাহরণ আপনার মন হইতে সেই কথা ত একবারও মুছিয়া ফেলিতে পারে না—মনোরমাকে সে বিবাহ করিয়াছে। কেবলই মনে হয় —এক নিরপরাধা বালিকার জীবনকে সে ছারখার করিয়া দিতেছে। কর্তব্য-চ্যুতি ঘটিতেছে, অধর্ম হইতেছে।....ধর্ম ও অধর্ম এমনি জটিল সমস্যা। সত্যের পথ এমনি ক্ষুরধার বটে। চিন্তাহরণকে সেই পথে চলিতে গেলে এই সত্যও স্বীকার করিতে হইবে—সেই বালিকা স্বাধীন, আপনার স্বাধীন ইচ্ছায় সে আপনার কর্তব্য স্থির করিবে। কিন্তু বলিলেই কি কর্তব্য শেষ হইল; কে তাহাকে সেই কথাটা বুঝাইবে? কে তাহাকে ইহা বুঝিবার মত শিক্ষা দিবে? সাহস দিবে? চিন্তাহরণ সারারাত্রি বালিশে মুখ গুঁজিয়া বিধাতার নিকট প্রার্থনা করে: "হে বিধাতা, তুমি তাহাকে সত্যপথ দেখাও। সত্য পথ দেখাও সেই বালিকাকে। এই বন্ধন পাশ ছেদন করো—মুক্ত করো।"

চিন্তাহরণ মনে-মনে মানিয়া লইতে চায়—যে বিবাহ শুধু কয়েকটা আচার অনুষ্ঠান ; তাহা সত্য নয় ; উহা তাহারই দুর্বল সংস্কার মাত্র।

কয়েকমাস পরেই সংবাদ আসিল নন্দীগ্রামের গাঙুলী বাড়ির কর্ত্রী আর নাই। অনেক দিনই তিনি শয্যাশায়িনী ছিলেন পুত্রদের অদর্শনে। কিন্তু তাহাদের উপবীত-ত্যাগের পরে আর সহ্য করিবার শক্তিও তিনি হারাইয়া ফেলিলেন। পুত্ররাই তাঁহার কাল হইল।

গিরীশ ও চিন্তাহরণ বজ্রাহতের মত বসিয়া রহিল। আর শেষ দেখা করাও হইল না।

১৪

রাজীব বাড়িতে আসিয়াছে। আসিতে দ্বিধা ছিল—উপবীত ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সে এই চৌধুরী গোষ্ঠীর বংশধারা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে, তাহাই সেও মনে করিয়াছিল। অবশ্য সে বোঝে—ইহাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। চৌধুরীদের রক্তধারা তাহার শিরায় যতক্ষণ রহিবে ততক্ষণ সেও চিত্রিসারের চৌধুরী। কিন্তু এই কথা অন্যরা মানিবে কেন? তাহাদের নিকট কূল-প্রথা দিয়াই বংশধারা। সেই কূল-প্রথা যে না মানে সেই বংশেরও সে কেহ নয়। বিশেষত তাঁহারই অগ্রজ রাঘব তাহার আগমন সম্ভাবনায় পাড়া মাতাইয়া বলিয়া বেড়াইয়াছে—সে বাড়িতে থাকিতে কিছুতেই রাজীবকে সে এই বাড়িতে ঢুকিতে দিবে না। পৈতা ছিঁড়িয়া যে খ্রীষ্টান হইয়াছে সে এই বাড়ির কেহ নয়।

রাঘব এখন গ্রামে জালিয়াদের এক দলের কর্তা রূপে অন্য দলকে দাবাইয়া শাস'ইয়া বেড়ায়: এ নদীরে এই দিকে চৌধুরীদের মালিকানা, কালচিতার সেনেদের নয়, অতএব, 'দে মাছ।' রাজীবের ধর্মত্যাগ উপলক্ষ করিয়াও সে গ্রামের সমাজের একজন মোড়ল হইয়া বসিবার উপক্রম করিল। এই গ্রামে, এই সমাজে রাজীবের স্থান নাই, গ্রামে ঢুকিলে যে কেহ তাহাকে দেখে যেন মারিয়া ঠ্যাংখোঁড়া করিয়া দেয়—রাঘব চৌধুরী রহিবে তাহার সেই কাজের জন্য দায়ী।

কিন্তু রাঘব অত চীৎকার করিলে হইবে কি, ইহাও সকলে বোঝে, চৌধুরীদের ছোট কর্তা বাড়ি আছেন। দেবপ্রসাদ চৌধুরী কথা কম বলে, নিবিরোধ প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু মানুষটি দুর্বল নয়। কালচিতার সেনেরাও তাহাকে নোয়াইতে পারে নাই। 'ভরার মেয়ে' বিবাহ করায় দীনু চক্রবর্তীকে একঘরে করিয়াও এই দেবপ্রসাদের জন্যই গ্রামের কর্তারা দীনুকে একঘরে করিয়া রাখিতে পারে নাই। সেই দেবপ্রসাদ এখনো কথা বিশেষ বলে নাই। রাজীবের কার্যে সে আহত হইয়াছে, কিন্তু রাঘবকেও অত বাড়াবাড়ি করিতে বারণ করিয়াছে। তাহারই কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া গোঁয়ার অনন্ত চৌধুরী তখন বলিয়াছে, 'গ্রামের কি ক্ষতি করিয়াছে রাজীব, যে রাজীব আসিতে পারিবে না গ্রামে? সে কাহাদের মাছ ধরিয়া খায়, না গাছ হইতে ফল কাড়িয়া আনে, না, কাহারও বউ-ঝি লইয়া টানাটানি করে?' কথাটার মধ্যে হয়ত রাঘব ছাড়াও অন্যান্য সমাজ পতিদের কার্যের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু তাহাতে আপত্তি করিলেও লাভ হইবে না। অনন্ত চৌধুরীর মুখে শাসন নাই। সে গায়ে জোর রাখে, অন্যের ভরসায় সে কথা বলে না, নিজের লাঠি আছে। আর মাঝিপাড়া, ঢালীপাড়ার লোকগুলা তাহার সাকরেদ। দেবপ্রসাদের যুক্তিকে তাই অনন্ত তখন নিজের ভাষাতেই

এইরূপে জারী করিয়া বেড়ায় বাড়িতে ও গ্রামে—'গ্রাম কি কাহারও শ্বশুরের সম্পত্তি? মগের মুল্লুক পাইয়াছে, গ্রামে ঢুকিলে মারিবে রাজীবকে। আয়, আমিই ত আনিব রাজীবকে বাড়ি—ছোট খুড়া বলিয়াছেন ঢাকা যাইতে'।

চৌধুরী বাড়িতে আবার দেবপ্রসাদকে ঝড়ের সম্মুখে পড়িতে হইল। তাহার অন্তরেও ঝড়। কিন্তু সে ঝড় বিরোধের নয়, বিষাদের। রাজীবকে সমর্থন করিতে পারিলে সে শক্তি পাইত, রাজীবকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারিলেও সে এত ব্যাহত বোধ করিত না। কেন রাজীব এমন করিল? গৃহ, পরিবার এই হতভাগ্য গ্রাম ও তাহার সমাজ, ইহার জন্য কি কোনো মমতা নাই রাজীবের? মহেশ্বরী, বাড়ির খুড়ী, জ্যেঠাই, পিসিদের এই মায়ামমতার দোহাই ত একেবারে মিথ্যা নয়। না হইলে ধর্মত্যাগ করা তেমন দুঃসাধ্য কি?. ইংরেজ ত খৃষ্টান করিবার জন্যই তাহা আইনত পর্যন্ত সুসাধ্য করিয়াছে। এই ত মাইকেল গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তবু আজও কাঁদিয়া ভাসান বুক। চিন্তাহরণ, রাজীবই বা পৈতা ছিঁড়িয়া কি লাভ পাইবে?

না, না, ত্যাগ করিলেও ত্যাগ করা যায় না এই গৃহ, সমাজ, আজন্মের বন্ধন। এই কথা চিন্তাহরণ জানে, রাজীবও বুঝে—গিরীশ না বুঝিতে পারে, সে বরাবরই ইংরাজি ভাবাপন্ন—এই সমাজ-ত্যাগের মধ্যে পুরুষার্থই বা কোথায়? —রাজীবের মনে অন্তত এই কথাটা উদয় হওয়া উচিত। ইহা ত পলায়ন।

দেবপ্রসাদ বাড়িতে রাজীবের বিরুদ্ধে মনোভাবকে যথাসম্ভব প্রশমিত করিয়া অনন্তকে শহরে পাঠাইয়াছিল। মহেশ্বরীই বলিয়াছিল— 'একবার বাড়ি লইয়া আস। বন্ধুদের দল ছাড়িলেই সে ঠিক হইয়া যাইবে'। কথাটায় দেবপ্রসাদ হাসিয়াছে—রাজীব তত চঞ্চলমতি নয়। কিন্তু

দেবপ্রসাদ চাহে বাড়িতে অন্তত সবাই একটু স্থির হউক, রাজীবকে স্থিরভাবে গ্রহণ করুক। হয়ত রাজীবও তাহা হইলে ভাবিবার অবকাশ পাইবে। ব্রাহ্ম হইলেও এই বাড়ির ছেলে সে—সে-ই বাড়ির ভরসাও—বাড়ির ছেলেই থাকুক।

তখন রাজীব আসে নাই—পরীক্ষা নিকটে ছিল। তার পরে রাজীব পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, সেই সংবাদও আসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অভাবনীয় আশঙ্কা বাড়ি-শুদ্ধ সকলকে বিমূঢ় করিয়া দিল। গ্রামের পাড়া-পড়শী রাতদিন আসিয়া ভিড় করে: 'ওগো ছোট বউ একি শুনি?" 'ওগো শৈলীর মা, এমনও হয়?' "বেরাহ্মণ পৈতা ছিঁড়ে!" অন্ত্যজাতিরা যেন আরও বিমূঢ় হইয়া যায়। ইহাও কি সম্ভব? পৃথিবীতে সত্যই এইরূপ হয়?—তাহার পরেও সেই ব্রাহ্মণ কথা কহিতে পারে, বাঁচিয়া থাকে? আচ্ছা, তাহা হইলে সন্ধ্যা করে কি করিয়া? আহারের গণ্ডূষ লয় কি করিয়া? আর সন্ধ্যা না করিলে ব্রাহ্মণ অন্নগ্রহণ করে কি করিয়া? —এই সব কিছুই তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

রাঘব এবার আরও জোর পাইল: আমি তো বলিয়াছিই—ও কুলাঙ্গার, খৃস্টান হইয়াছে। ছোট খুড়ার কথায় তবু চুপ করিয়া ছিলাম। কিন্তু পৈতাও ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। এখন কি বলিবে বড়দাদা, অনন্ত চৌধুরী?

অনন্ত অপেক্ষা করে—ছোট খুড়া কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য। ততক্ষণ রাঘবের কথায় কান না দিয়া প্রাণপণে তামাক টানিতে থাকে।

কিন্তু দেবপ্রসাদও কিছুই বলে না—শীঘ্র। কেমন মুস্‌ড়িয়া পড়ে সে দিনে দিনে। কেমন শুকাইয়া উঠে—হয়তো নতুন কোনো পীড়ায়, হয়তো আরও কঠিন ভাবনায়। পাঠশালায় ছেলে-মেয়েদের পড়াইতে পড়াইতে তাই আর সে পারে না—কেমন হাঁপ ধরে। দম বন্ধ

হইয়া আসে। দিন যায়। রাঘব তখনো বলে—রাজীব মরিয়াছে, এই বাড়ির ত্রিসীমানায় সে ঢুকিতে পারিবে না। কিন্তু ইহাও সকলেই বুঝিতেছে—রাজীব এই বাড়িতে ঢুকিবার জন্য ব্যস্তও নয়। ক্ষতিটা বরং চৌধুরীদেরই,—উপযুক্ত ছেলেটাকে তাহারা হারাইল,—বিশেষত এইদিনে। এই গোষ্ঠীকে তবে ভবিষ্যতে খাওয়াইবে পরাইবে কে? ছোটকর্তার এই দশা। মেজকর্তা বিদেশে রোজগার করে বেশি নয়, কিন্তু মেজকর্ত্রী সেই দেমাকে বাড়ির ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ী পোষ্যগোষ্ঠীকে দুই বেলা না কাঁদাইয়া ছাড়েন না—'এই গোষ্ঠীকে কত কাল খাওয়াইবে সেই একটা মানুষ?' বড়কর্ত্রী অশক্ত হইতেছিলেন, বুঝিয়া মানে-মানে সব ছাড়িয়া এখন ঘরে শুইয়া থাকেন। অনন্ত নিরক্ষর গোঁয়ার, রাঘবও লেখাপড়া শিখে নাই—তাহারা কেহই রোজগার করিবে না। চৌধুরী সংসারে উঠিতেছিল একটা ছেলে—রাজীব; সেও ত্যাগ করিল এই পরিবার ও পোষ্যদের। দেবপ্রসাদ এই সব বুঝিয়াও মুসড়িয়া গিয়াছিল।

তাড়া ছাড়া দেবপ্রসাদের বেদনা আরও নিগূঢ়:—হয়তো গোড়াতেই ভুল ঘটিয়া গিয়াছে। হয়তো এই শিক্ষা দীক্ষা সবই একটা খৃস্টান রাজশক্তির চক্রান্ত। তাহাদের উদ্দেশ্য সকলকে জ্ঞানের আলোক না দিয়া বরং কয়জনকে শিক্ষার সুবিধা দিয়া হাত করা; এই দেশের সেই মানুষগুলিকে তাহাদের ধর্ম সমাজ সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া হতভাগ্য সমাজ ও হতভাগ্য দেশকে আরও দুর্বল করিয়া ফেলা; তাহার বিরুদ্ধেই দাঁড় করানো তাহার নিজের শ্রেষ্ঠ সন্তানদিগকে। 'বেইমানী! বেইমানী!' —দেবনন্দন ওঝার সেই আর্তস্বর তাহার মনে পড়ে। একেবারে মূর্খ ছিল কি সেই দুঃসাহসী ব্রাহ্মণ? ভ্রান্ত ছিল, কিন্তু ছিল দেশের বীর সন্তান।

দেবপ্রসাদ দিনে দিনে যেন আরও অসুস্থ হইয়া পড়ে। কিছুই সে বলে না। মহেশ্বরী বলিল: একবার রাজীবকে আসিতে লেখো না বাড়িতে।

দেবপ্রসাদ চমকিত হয়। রাজীবকে! এই বাড়িতে!—কিন্তু তাহার চক্ষে যে একটা আশার রেখাও খেলে তাহা মহেশ্বরী দেখিতে পায়। সে বুঝিতে পারে—দেবপ্রসাদের অভিলাষ কি। বলে :

কেন? বাধা কি?

তাহাকে ঘরে দুয়ারে উঠিতে দিবে তোমরা?—দেবপ্রসাদ ম্লান-হাস্যে বলে।

মহেশ্বরী উত্তর আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছিল। বলিল : বেশ, আমাদের ঘরে জল থাকে। না আসিল সে ঘরের ভিতরে। কিন্তু পঞ্চবটীতলায় অতিথ-ঘরে ত থাকিতে পারিবে। সেই ঘরে তো ব্রাহ্মণ শূদ্র কোনো জাতের থাকিতে বাধা নাই—তোমরাই বলো।

তাহা নাই। কিন্তু রাজীবের বিরুদ্ধে বাধা আছে। সে তো ব্রাহ্মণও নাই, শূদ্রও নয়। বরং সে খৃস্টান হইলেও তাহাকে এই বাড়িতে বাহিরের ঘরে স্থান দেওয়া চলিত—তাহাও সমাজ সহ্য করিত। কিন্তু রাজীব এই বাড়ির তত পরও হয় নাই। সে আপনার জন, তবু আপনার নাই,—তাহার বিরুদ্ধে এই বাড়ির প্রাতকূলতা তাই এত বেশি। সেই ক্ষোভই হয়তো রাঘবেরও এমন গুণ্ডামির একটা কারণ। অবশ্য লোভও সেই সঙ্গে রাঘবের আছে—ঘর দুয়ার, বাসন-কোসন, জমিজমাও কিছুই যখন বেশী নাই, তখন যতটা রাঘব যেভাবে নিজে আয়ত্ত করিতে পারে ততটাই মনে করে লাভ। দেবপ্রসাদ ভাবে, মূর্খ রাঘব, সে জানেও না রাজীব ইহার প্রত্যাশী নয়। এই সংসারই বরং রাজীবের মুখাপেক্ষী। কিন্তু রাজীব কি তাহার মুখ রক্ষা করিবে আর?

মহেশ্বরীকে দেবপ্রসাদ বলিল : রাজীব আসিবে কেন?

আসিবে। তোমার অসুখ, তুমি বলিলে দেখিবে নিশ্চয় আসিবে।

কে জানে। সে পৈতাটাও রাখিল না। আমি লিখিলেই বা কি হইবে?—দেবপ্রসাদ ভাবিতে ভরসা পায় না।

বেশ, আমিই লিখিব। —মহেশ্বরী জানায়।

মহেশ্বরী নিজেই পত্র লিখিবে। লিখিতে সে জানে। কিন্তু বৎসর দুই যাবৎ চোখে কম দেখিতেছে, লিখিতে কষ্ট হইত। অবশ্য বয়স তাঁহার এখনো ত্রিশের কোঠায়। তথাপি এই কনিষ্ঠ পুত্রটির জন্মের পরে চোখে আরও কম দেখিতেছে মহেশ্বরী। শৈলীকে দিয়াই তাই সে পত্র লিখাইবে। বাড়ির মেয়েদের মধ্যে দেবপ্রসাদের নিকট শৈলীই বেশি লেখাপড়া শিখিয়াছে। আরও শিখিতে তাহার আগ্রহ ছিল। কিন্তু এখন সে বালিকা নাই। মেজকর্ত্রীর তাই তাহার উপর উষ্মা—বাড়ির হাজার কাজ ফেলিয়া শৈলী এখন লিখিবে পড়িবে কেন? কোন্ পণ্ডিত হইতে চায় শৈলী?—শৈলীর আর তাই এখন পড়াশুনা হয় না। গৃহকর্মে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর কোথায়? ছোট মামাও ছোট মামীই তবু তাহার একটু আশ্রয়। শৈলীর হস্তলিপি পরিচ্ছন্ন। বড় বড় অক্ষর, সুন্দর না হউক লেখায় ছাঁদ আছে।

পত্র লইয়া এবার অনন্ত যাইবে না, ডাকেই গেল পত্র। তবে অনন্ত চৌধুরীকে তাহার মর্ম জানাইয়া রাখিল মহেশ্বরী। রাঘব যদি গোলমাল বাধায় অসুস্থ দেহে ছোট চৌধুরী তাহাতে আরও বিপন্ন হইয়া পড়িতে পারে। তাই অনন্ত যেন রাঘবকে সামলায়।

কথামত শৈলী লেখে—দেবপ্রসাদ অসুস্থ। ক্রমশই তাহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতেছে। রাজীব যেন তাহার ছোটখুড়াকে দেখিতে আসে। যত বাধাই থাকুক, সে তো এ বাড়ির পর নয়। দেবপ্রসাদকে সে ভুলিয়া যাইবে কি?

চিঠির শেষে শৈলী গোপনে যোগ করিল: "দাদা ভাই, তুমি আসিও, আসিও, আসিও। ইতি—সেবিকা শৈল!"

রাজীবের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল; সে পাশ করিয়াছিল। খরচপত্র না চলায় পড়া হয় নাই। চিন্তাহরণ ও সে শিক্ষকতা করিয়া ঢাকায় রহিয়াছে। এখন গিরীশের পরীক্ষা দিবে। রাজীব বুঝিয়াছিল—উপবীত ত্যাগের পর আর দেবপ্রসাদও তাহাকে বাড়িতে আহ্বান করিতে সাহসী হইবে না। এমন সময় আসিল এই অভাবনীয় আহ্বান। দেবপ্রসাদ নয়, ছোট-খুড়োর নিকট হইতে এবং সেই শৈলীর নিকট হইতে রাজীব পত্র পাইল। এত অপ্রত্যাশিত এই আমন্ত্রণ যে রাজীবের মন তাহাতে মথিত হইয়া উঠিল। এই জাতির মেয়েরাই বুঝি সাহসী। তাহাদের হৃদয় আছে, আর তাই তাহারা এখনো সব খোয়ায় নাই। হয়তো গোপনে গোপনে তাহারা সাহস করিয়া রাজীবকে লিখিয়াছে—অনেক আশা মনে লইয়া। দেবপ্রসাদও তাহাকে লিখিতে সাহসী হয় নাই, অথচ সাহসী হইল খুড়ীমা ও শৈলী। না লিখুক দেবপ্রসাদ, সে তাহার সেই ছোট খুড়া,—নিজে রাঁধিয়া যে তাহাকে গাঙুলীদের বাসাবাটিতে খাওয়াইয়া পরাইয়া স্কুলে পড়াইয়াছে। আর আজ সেই দেবপ্রসাদ পীড়িত, কে বলিবে কি হইবে? এই তো চিন্তাহরণ—গিরীশ আজন্মের মত মনে খেদ লইয়া বসিয়া আছে—পীড়িতা মাকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া আসিল না। রাজীব কি সেইরূপ মূঢ়তার পুনরাবৃত্তি করিবে?

আর দেরী করিতে পারে না রাজীব। তথাপি চিন্তাহরণের সহিত পরামর্শ করিল। গিরীশও আপত্তি দেখিল না। মায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে কেমন একটা খেদ তাহার মনে জন্মিয়াছে। কে বলিবে কি হইবে চৌধুরী খুড়ার? লোকটি কখনো মিথ্যা শিক্ষা দেন নাই। একবার বরং রাজীব দেখিয়া আসুক তাঁহাকে।

রাজীব খুড়ীমাকে জানাইল—সপ্তাহ শেষে দুই দিনের ছুটি। সে ছোট খুড়াকে দেখিতে তখন বাড়ি আসিবে।

রাজীব বাড়িতে আসিয়াছে—তর্কের জন্য প্রস্তুত হইয়া। বাড়িতে দেবপ্রসাদের সঙ্গে তর্ক বিশেষ হইল না। তর্ক হইলেই বরং রাজীব অনেকটা স্বস্তি বোধ করিত। কিন্তু কোনো দিনই তো দেবপ্রসাদ মানুষের সঙ্গে মুখ ফুটিয়া তর্ক করিতে পারে না। তখনো চিন্তাহরণ গিরীশকে সে গালমন্দ করে নাই—জোর-জুলুম কিছুমাত্র সে করে নাই। এখন তো কথাই নাই। কিন্তু আগেকার সেই শান্ত স্থির মুখ এই দুই বৎসরেই শ্রান্ত, কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। দেহে অবসাদ সুস্পষ্ট, পীড়ায় তাহা আরও করুণ করিয়া তুলিয়াছে। দেখিয়া রাজীব মনে মনে শঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে। হয়তো বরাবর দেখিতেছে বলিয়াই মহেশ্বরী বা বাড়ির অন্যান্য কেহ ততটা বুঝিতেছেন না; কিন্তু এতদিন পরে দেখিয়া রাজীব একবারেই বুঝিতে পারে—এই মানুষের দিন আর বেশি নাই। নানা কথা তাহার মনে পড়ে, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও মমতায় মন ছাইয়া যায়। দেবপ্রসাদের প্রত্যেকটি কথা তাই রাজীবের নিকট আরও বেশি অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে—বিশেষত যখন সে তর্ক করিতেছে না, বাধা দিতেছে না, আঘাত করিতেছে না একটিবারও।

শুধু সামান্য দুই চারিটি বিষয়—দেবপ্রসাদের কথা পরোক্ষে উহা ঘিরিয়াই। কথাটা ধর্মত্যাগের নয়, ধর্ম ত রাজীব ত্যাগ করে নাই। বরং ধর্ম আরও বেশি করিয়াই সে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। সত্যই ত, ধর্ম লইয়া এত জিজ্ঞাসা, এত চিন্তা, এত আগ্রহ, আতিশয্য, এই সব দেবপ্রসাদের নাই; বাপ-খুড়া ও দাদা-কুটুম্বদের মধ্যেও কেহ ইহা লইয়া মাথা ঘামায় না। হয়ত এরূপ ধর্মপ্রাণতা ছিল পূর্বকালের মানুষের—

সনাতন চৌধুরীর। দেবপ্রসাদ তাই রাজীবকে ধর্মত্যাগী বলিবে না। কিন্তু রাজীব সমাজ-ত্যাগী, পরিবার-ত্যাগী।—"সমাজ কুসংস্কারে আবদ্ধ, অধঃপতিত। কিন্তু তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেলে তুমি না হয় একা অগ্রসর হইয়া যাইবে, কিন্তু সে ত সেখানেই পড়িয়া থাকিবে।"

রাজীব কথাটা অস্বীকার করে: আমি সমাজ পরিত্যাগ করি নাই। সমাজই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে!

তাহার গৃহাগমনে আপত্তি করিয়া মেজকর্ত্রী পিত্রালয়ে গিয়াছেন, রাঘব সপরিবারে শ্বশুরালয়ে গিয়াছে—সমাজ কি ভাবে দেবপ্রসাদের এই দুঃসাহসকে গ্রহণ করিবে তাহারা ঠিক বুঝে না। রাজীব কৌতুক ও বেদনা দুইই ইহাতে বোধ করিয়াছে। আবার সে বলিল: আমরা সমাজকে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে চাই। তাই আগে যাইতে হইবে; আগে গিয়া রশি টানিতেছি।

রশি যে তুমি রথ হইতে খুলিয়া লইয়াছ—টানিতেছ কি? রশি, রথ নয়, সমাজ নয়। —শান্ত, মৃদু কথা দেবপ্রসাদের।

রাজীব মানিবে না। তাহার দীক্ষা ত সংগ্রামের দীক্ষা। তাহা শুধু নিজের মুক্তি-সংগ্রাম নয়, সমস্ত সমাজের ও দেশের মুক্তি-সংগ্রাম। —ব্যক্তির, সমাজের, দেশের স্বাধীনতা। হাঁ, স্বাধীনতা।

দেবপ্রসাদ মুখের দিকে চোখ মেলিয়া তাকাইয়া থাকে। সে দৃষ্টি নীরবে বলে—সত্য কি রাজীব?

দুই-এক সময় আরও সহজভাবে কথা ওঠে। রাজীবই তোলে সম্পর্কটা সহজ, স্বচ্ছন্দ করিবার জন্য। কত পরিবর্তন ইতিমধ্যেই বাড়ির ঘরে-দুয়ারে দেখা যাইতেছে। সে ত জানিতই না—বিভূতির আর-একটি ভাই জন্মিয়াছে কয়েক মাস পূর্বে—তাহারই খুল্লতাত ভ্রাতা। সকুতূহলে রাজীব জিজ্ঞাসা করে মহেশ্বরীকে: কি রাখিবেন উহার নাম?

মহেশ্বরী বলে: সে ত অন্নপ্রাশনের সময় রাখা হইবে।

তবুও, স্থির করুন না এখনি—কি নাম রাখিবেন।

দেবপ্রসাদ বিষণ্ণ শান্ত কণ্ঠে জানায়: বিভূতির নাম রাখিয়াছিলেন তাহার মাতামহ—'বিভূতি।' আমি শঙ্কর চৌধুরীর নামটুকুও তাহাতে জুড়িয়া দিই। যাহা কিছু বিভূতি-সম্পন্ন গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন তাহাতেই ভগবানের পরিচয়। জীবে-মানবে, জড়ে-চেতনে।

প্রতিবাদ করিতে গিয়াও রাজীবের প্রতিবাদ আটকাইয়া যায়: শুধু বিভূতিসম্পন্ন কেন? তাহা ছাড়া যাহা, তাহাতেও ত তাঁহারই পরিচয়। কথাটা ইহা নয়। আসল কথা—কোন্ পরিচয়ে মানুষের গৌরব, সেই পরিচয়েই মানুষের কাছে ভগবানের পরিচয়। মানুষের পরিচয় জ্ঞানে—তিনি জ্ঞানং।

'জ্ঞান!'—দেবপ্রসাদও তাহাই জানে। কিন্তু দেবপ্রসাদ তর্ক করিল না। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল: আমরাও চাহিয়াছিলাম—জ্ঞান। ভাবিয়াছি তোমরাই জ্বালিবে সেই জ্ঞানালোক।

রাজীব প্রীত হয়। চুপ করিয়া থাকে। দেবপ্রসাদ তাহাদের ভুল বুঝেন নাই। তারপর আবার মহেশ্বরীকে বলে: কি নাম রাখিবেন খোকার, ছোটমা?

দেবপ্রসাদ বলিল: নাম রাখিলেই কি সে তাহা হইবে?

রাজীব বলে: কে কি হইবে তাহার ত ঠিক নাই। তবু কী সে হউক, আমরা চাই, সেই মতই আমরা নাম রাখি।

বেশ, তুমিই বরং নাম রাখিবে—তোমরা যাহা চাও।

রাজীব বিচলিত হয়—সে নাম রাখিবে এখনো এই বাড়ির নবজাত বংশধরের? এত আপনার সে এখনো ইহাদের? আমি রাখিব?

দেবপ্রসাদ বলিল: হাঁ, তুমিই ত রাখিবে। তোমরাই এখন আদর্শ স্থাপন করিবে, রক্ষা করিবে।

সত্যং জ্ঞানমানন্দং। ইহার অপেক্ষা বড় আদর্শ আর নাই। রাজীব বলে: আপনার কথাই সত্য হোক—নাম রাখুন 'জ্ঞান'।

আবার সেই দৃষ্টি দেবপ্রসাদের চক্ষে—সত্য কি, রাজীব? তোমরা কি সেই জ্ঞানালোকের যুগ আনিবে এই সমাজে?

রাজীব কর্মী প্রকৃতির মানুষ। তথাপি এই দৃষ্টিতে যেন নিজেকেও নিজে সে প্রশ্ন করিতে উদ্যত হয়: সত্য বলিতেছে ত সে? তারপরেই তাহার প্রকৃতি মাথা নাড়া দিয়া বলে—ইহাতে আবার সংশয় কিসের? প্রতিজ্ঞাকে কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইতেই হইবে, এই ত? তাহাতে সন্দেহ কি, ভয় কোথায়?

তর্ক করিতে আসে কিন্তু গ্রামের লোকেরা। আবালবৃদ্ধবনিতা কেহ বাদ যায় না। কত লোক আসে, কত লোক যায়। কেহ নমস্য, ভক্তির পাত্র, কেহ বয়সেই জ্যেষ্ঠ, অন্য কারণে শ্রদ্ধেয়ও নয়। কিন্তু রাজীব প্রণাম করে। কেহ প্রণাম করিতেই পিছাইয়া যায়—পাছে ম্লেচ্ছ স্পর্শ করিয়া ফেলে। রাজীবের হাসি পায়। কেহ আবার প্রণাম করিতে অবাক হয়—খ্রীষ্টানরা ত প্রণাম করে না, তবে কি রাজীব সত্যই খ্রীষ্টান হয় নাই? তখনই তাকাইয়া দেখে—রাজীবের গলায় উপবীত নাই। বলে—ব্রাহ্মণের কণ্ঠে উপবীত না থাকিলে কি বিশ্রীই না দেখায় ব্রাহ্মণকে? রাজীব আবার হাসে মৃদু মৃদু। ইহাদের তর্কে কথায় রাজীব কিছুমাত্র অপ্রতিভ বোধ করে না। টোলের পণ্ডিতেরা আসেন, স্মৃতিতীর্থ আসেন। শাস্ত্রের প্রমাণ তৎক্ষণাৎ আবৃত্তি করেন। রাজীব ইচ্ছা হইলে তর্ক করে, ইচ্ছা না হইলে করে না। মনে-মনে বড় সুস্থ বোধ করে—ইহাদের বিরোধিতা তাহাকে আরও সুনিশ্চিত করিয়া তোলে। ইহাদের সঙ্গে তাহার

যোগাযোগ নাই—তাহা রাখিবারও প্রয়োজন নাই—গিরীশের মতই তখন তাহারও ইহা মনে হয়—ইহাদের সঙ্গে তাহার 'সমাজ' নয়, থাকিতে পারে না। গিরীশের মতই তাহারও ইহা মনে হয় ইহারা নিজের সমাজেরও মঙ্গল চাহে না—হিন্দুসমাজ মানুষের লজ্জা।

ইহারা তর্ক না করিলেই বরং রাজীব বিপদে পড়ে। মাঝে মাঝে আশ্বাসও লাভ করে তাহাদের কাহারও আচরণে।

'ছোট কামার বাড়ির' মেয়েটি অপলক নেত্রে তাহাকে অনেকক্ষণ দেখিতেছিল। কত জনেই অমন দেখে। রাজীব নিজমনে কি পড়িতেছে, পড়িতে থাকে। শৈলী সকালের জলখাবার দিয়া গেল। অনেক যত্নে রাত জাগিয়া রাজীবেরই জন্য তৈয়ারী করিয়াছে সে আর মহেশ্বরী এই নারিকেলের নাড়ু। শৈলী তাই বলে: আরও নাও, দাদাভাই—

না,—না—আর না—তোরা খাবি, নিয়ে যা কিছু'।

তুমি না খাইলেও আর ঘরে তুলিতে পারিব না ইহা। তোমার ছোঁয়া হইয়া গিয়াছে।

রাজীবের মুখ বেদনায় ও অপমান বোধে কঠিন হইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ কামারদের মেয়েটা বলিয়া উঠিল: ওঃ শৈলীদিদি, ইনি যে কথা কহিতেছেন!

রাজীবের মনের বিক্ষোভ এক নিমেষে উবিয়া গেল। ততক্ষণ শৈলী বলিতেছে: কথা বলিবেন না কেন?

রাজীব মেয়েটির বিস্ময়ের কারণ বুঝিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে। কামারদের মেয়েটি একেবারে অপ্রতিভ। শুধু বলিল: বেরাম্মন গলার পৈতা খুলিলে বোবা হইয়া যাইবে না?

হয়, না, না হয়, দেখিলে ত। এখন বলো গিয়া সকলকে—রাজীব মেয়েটিকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল, না পারিয়া কথাটা বলিল। মেয়েটি

ছুটিয়া পালাইল। শৈলীও হাসিল, বলিল: ওর দোষ কি? আমরাও ভাবিয়াছিলাম—তোমরা ইংরেজি ছাড়া বলো না।

কেন, আমি বাঙলা জানি না? না, বাঙালী না?

শৈলী বুদ্ধিমতী, চতুরাও। কিন্তু তবু উত্তরটা ঠিকমত গুছাইয়া বলিতে পারে না।—সবাই ওইরকমই ভাবে কি না—তোমরা আমাদের কথা সব ভুলিয়া গিয়াছ।

কাহাদের কথা?

এই আমাদের—ভাই-বোন, খুড়া-খুড়ী, পিসি-মাসি।

অনুযোগের ও বেদনার আভাস আছে কথাটায়। শৈলী যে দাদাভাইয়ের কত নিকট তাহা কি রাজীব আর মনে রাখে? সেই অনুযোগ রাজীবের বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

কুলীনের কন্যা শৈলী মায়ের সহিত এই মাতুলালয়েই আজন্ম পালিত হইয়াছে। রাজীবের খুব বেশি ছোটও নয়—হয়ত বৎসর চার পাঁচেকের ছোট। যেমন হউক কখনো খুব সম্মানের ছিল না তাহার মায়ের স্থান। এই গৃহে শৈলী তাই বেশি আদরও পায় নাই। এমন কি, মায়ের কাছ হইতেও পায় নাই—মা যেন তাহাও সম্বরণ করিত। কিন্তু আদর পাইবার মত লোভ ছিল শৈলীর মনে প্রচুর। রূপও ছিল—ফুটফুটে মুখ, সুশ্রী, টানা টানা চোখ, সুচিক্কণ নাসা, সুগঠিত চিবুক। মাঝে-মাঝে জোর করিয়া আদর সে আদায় করিত দাদাভাইর নিকট হইতে—একটু বেশি কাঁচা-মিঠা আমের টুকরা, দুইটা বেশি পাকা ফল; কিম্বা নৌকায় কোনো একদিন তাহার ও তাহার সঙ্গীদের সহিত স্কুলে যাওয়া মধ্যমগ্রামে, এক আধবার সঙ্গে যাওয়া রথের মেলায়, ভাসান, বাইচ খেলা দেখিতে। রাজীবের উপর এই ভাবেই একটা বিশেষ দাবীও শৈলীর

মনে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজীবও তাহা কতকটা মানিত। রাজীব শহরে পড়িতে গিয়াছে, তখন আর শৈলীর এই সুযোগ হয় নাই, কিন্তু বাড়ি ফিরিয়া আসিলে শৈলীর জন্য কিছু-না কিছু মনে করিয়া রাজীব আনিয়াছে। তথাপি ক্রমেই ছেদ পড়িয়া যাইতেছিল—সে ছিল শহরে বন্ধুদের সঙ্গে ব্যস্ত, শৈলীও বড় হইতেছে —বাড়িতে সকলের কাজের হুকুম তাহার ওপরে ; গঞ্জনারও শেষ নাই।

চৌধুরীদের এখন যে-অবস্থা, পূর্বের মত দাসী বা প্রজা-রায়তের বাড়ির বউ-ঝিদের আর গৃহকর্মের জন্য রাখিবার উপায় নাই। ক্ষেত-খামার প্রায় নাই, বাড়তি মানুষের খোরাক আসিবে কিরূপে? কর্ত্রীরা নিজেরা দুই বেলাই কাজ করেন। কুলীন ননদেরা এতদিন পিত্রালয়ে কর্ত্রীত্ব করিতেন। বয়ঃকনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূদের উপর তাঁহাদের মুখ হইতে হাত পর্যন্ত সবই সতেজে চলিত। কিন্তু এখন তাঁহারাও আর বসিয়া থাকিতে পারেন না। বরং উল্টা মেজকর্ত্রী রাতদিনই এখন তাঁহাদিগকে শুনাইতে অভ্যস্ত—'পানের বাটা লইয়া বসিয়া আছেন—সব পটের ঠা'ন। কোথা হইতে যে পঞ্চব্যঞ্জন আসে সে ভাবনা ত করিতে হয়না।' যাহা একটু স্বাচ্ছল্য বিদেশের উপার্জনে দেখা দিতেছিল শিব প্রসাদের মৃত্যুতে ও দেবপ্রসাদ চৌধুরীর পীড়ায় তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। অভাব ক্রমশ বাড়িতেছে। ক্ষেতের ধান চাউল, পুকুরের মাছ আর যথেষ্ট নয়। না কিনিলে বৎসর চলে না, আবার কিনবার মত পয়সাও নাই। সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরী সংসারে কুলীন ভগ্নীদের দাপটই শুধু কমিয়া যায় নাই, বসবাসের নিশ্চয়তাও কমিয়া গিয়াছে। কুলীনের গোষ্ঠীকে কে পালন করিবে? বয়স্কারা কেহ কেহ পুরাতন দাপটের রেশ টানিয়া মহেশ্বরীর মত বউদের দাবাইয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু মেজকর্ত্রীর সহিত তাহারাও আর আটিয়া উঠিতে পারেন নাই। —অথচ অন্যত্রও তাহাদের স্থান নাই!

বয়স বাড়িবার সঙ্গে শৈলী এই কঠিন সত্যটা সহজেই বুঝিয়াছে—এই বাড়িতে তাহার মায়ের কোনো দাবী নাই। তাহার মা অবশ্য কোনো দিনই আপনার দাবী আদায় করিতে পাবে নাই। মুখ বুজিয়া কাজ করিয়াই আপনার অপরাধ যেন সে ক্ষালন করিতে চাহিত। শৈলীর উপরেও তাই বয়স হইতে না হইত চাপিয়া পড়িতেছিল অজস্র কাজের ভার। তাহারা ত গলগ্রহ মাত্র। রাজীবের গৃহত্যাগে শৈলীর মায়ের ও শৈলীরও তাই বেদনা আশঙ্কা বাড়িয়া গিয়াছিল—এই পরিবারের ভবিষ্যতে কি হইবে? কে খাওয়াইবে, কে পরাইবে এই প্রকাণ্ড গোষ্ঠীকে? মা ভাবেন—তাহার শৈলী যে বয়স্থা হইয়া উঠিতেছে। কে ই বা দিবে তাহার বিবাহ, কোথায় সে বিবাহ হইবে?—অমনি ভয় হয়—শৈলীও কি আজীবন শুধু তাহার মায়ের মত 'সধবা' নাম পুঁজি করিয়া বিবাহ-বিলাসী কোনো কুলীনের স্ত্রী-ই হইয়া থাকিবে? আর এমনি করিয়া হইয়া উঠিবে পরের গলগ্রহ?—অথবা, তাহার বিবাহও হইবে না—কে 'বরপণ' দিবে?

রাজীবকে আর এই সব কথা বলিয়া লাভ নাই—পূর্বেকার দিনে রাজীবকে তাহা বলিবার প্রয়োজনও ছিল না। সে নিজেই তাহার মর্মবেদনা বুঝিত। তবু শৈলীর মা কোনো-একটা অবসরে এক-আধ কথা এখনো রাজীবকে না বলিয়া পারেন নাই। যাহা বলিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। রাজীবের ত কিছুই অজ্ঞাত নয়। সে ত এই অভাবের ছায়া এই সংসারে ঘনাইতে দেখিয়াছে। দেখিয়াছে অমর্যাদার কদর্য তাড়নাও,—নানাদিকে দেখিয়াছে এই লাঞ্ছনা কুলীন কন্যার জীবনে। দেখিয়াছে উহার নিদারুণ অভিশাপ তাহাদের চৌধুরী পরিবারের উপরে। কে ইহাতে সুখী? কাহার ইহাতে লাভ? কে পাইতেছে শান্তি এই সমাজ ব্যবস্থায়? কিন্তু এই বহু-জটিল সামাজিক পারিবারিক চক্র হইতে কি করিয়া রাজীবই কাহাকেও রক্ষা করিতে

পারিত? অভাবের চক্রে বিকৃত, বিকার-গ্রস্ত' চৌধুরী সংসারকে সে কি রক্ষা করিতে পারিত? না, অসহায়, স্বামী থাকিয়াও স্বামী-শূন্য এই কুলীন ভগ্নী ও ভাগিনেয়ীকে সে এই গঞ্জনা হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইত?—কিছুই হয়ত সে করিতে পারিত না, এই সমাজেকে কাহাকেও বাঁচানো যায় না। —কিন্তু তাই বলিয়া বাঁচাইবার চেষ্টাও কি রাজীব করিবে না?—উহাই ত শৈলীর অনুযোগ।

রাজীব কেমন অস্বস্তি বোধ করে। সে জানে—এই সমাজ চক্র হইতে ইহাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা সে করিতে পারিবে না। কিন্তু ইহাদের এইভাবে ত্যাগ করিবার মধ্যে কোথায় যেন একটু পৌরুষের অভাবও আছে। কি করিবে সে? উদ্ধারের পথ সে অবশ্য উহাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারে। কিন্তু সে পথ ইহারা গ্রহণ করিবে কিরূপে?

কথাটা দেবপ্রসাদের সঙ্গেও হয়। রাজীবই তোলে—সমাজকে আশ্রয় করিবার কথা বলিতেছেন তিনি। কিন্তু সমাজ ত আশ্রয় দেয় না সকলকে। কি আশ্রয় সমাজে আছে আজ এই শৈলী ও শৈলীর মায়ের? চৌধুরীরাই যে আর পারিতেছেন না আশ্রয় দিতে। অভাবে-অনটনে দিন চলে না। উহার গঞ্জনা সকলের উপরই যাহা পড়ে, তাহা অপেক্ষা স্বভাবতই বেশি পড়ে এই কুলীন-কন্যা ও গোষ্ঠীর উপরে।

দেবপ্রসাদ তাহা জানে। সে বহু বহু পূর্বেই জানে এই জিনিস সত্য। সেদিনে তাই তাহারা বিদ্যাসাগরের মতকে সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরও ত এমন করিয়া সমাজ ত্যাগ করেন নাই। বরং দেশের ছোট বড় সকল মানুষকেই লইয়া আপনার সংসার তিনি তৈয়ারী করিয়াছেন। তথাপি এই উপস্থিত সমস্যার—চৌধুরীদের সমস্যার—কোনো উত্তর সে খুঁজিয়া পায় না। দেবপ্রসাদ জানে—যাহার জীবিকার স্বাধীনতা নাই, সংসারে সে কোনো দিনই সম্মান লাভ করে না। স্বয়ং কুরুপিতামহ

ভীষ্ম পর্যন্ত অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিলেন দুর্যোধনের অন্নদাস বলিয়া আর এখন—এই যুগে ? সম্মান থাকুক, সেই অন্নও কেহ লাভ করিবে না —নিজের সামর্থ্যে ছাড়া। সামর্থ্য যাহার নাই, তাহার সম্মান থাকিবে কিরূপে ? সামর্থ্য নিজেকেই অর্জন করিতে হইবে সকলের।

শৈলীকে রাজীব বলে: আমি ভুলিয়াছি কিনা, তাহাত দেখিলি। দ্যাখ্ ভুলিবি তোরাই—এখনই ত বাড়ি হইতে অতিথ্ঘরে তাড়াইয়া দিয়াছিস্। রান্না ঘর কেন, বসবাসের ঘরেও ঢুকিতে দিস না।

তাহাতেও ত কত গোলমাল !—শৈলী আভাসে জানায়।

রাজীব তাহাও বোঝে। ইহার বেশি অধিকাব এই বাড়ীতে এখন রাজীব প্রত্যাশাও করে নাই। সে জানে—এইটুকুও সম্ভব হইয়াছে দেবপ্রসাদ চৌধুরীর জন্য। এই অধিকারেব একটা মাত্রা আছে, তাহা লঙ্ঘন করা চলিবে না,—দেবপ্রসাদও তাহাতে সাহসী হইবেন না। রাজীব বাড়িতে আসিবে সত্য, কিন্তু সে রন্ধন গৃহে ও মন্দিরে-মণ্ডপে প্রবেশ না করাই উচিত। স্বতন্ত্র কবিয়া তাহার আহার্য মেয়েরা পরিবেশন করিবে অতিথ্ঘরে। মহেশ্বরী ও শৈলীর মা উপস্থিত থাকিবেন, বসিয়া খাওয়াইবেন। শৈলী বা মহেশ্বরী কেহ ভুক্তাবশেষ পরিষ্কার করিবে, তারপর স্নান করিয়া গঙ্গাজল স্পর্শে তাহারা শুদ্ধ হইবে। এই নিয়ম সত্যই কি ভাবে পালিত হয় তাহা দেখিবার জন্যও কম লোকে চেষ্টা করে না। চক্রবর্তী বাড়ির সেজকর্ত্রী ঠিক রাজীবের আহারের সময়েই মহেশ্বরীর সন্ধানে আসিয়া দাঁড়ান—শুধু তেজপাতা চাই তাঁহার,—এবং আসিয়া দাঁড়ান একেবারে অতিথ্ঘরের দুয়ারে—

থায় বুঝি রাজীব ? কি থায় ?

সে কি খায়, তাহাও কম কৌতূহলেব ব্যাপাব নয়। রাজীবের হাসি পায়। দীক্ষাগ্রহণের পর হইতে তাহারা নিরামিষই আহার করিত, এখনো চিন্তাহরণ তাহাই করিতেছে। কিন্তু গিরীশের মাছ না হইলে চলে না, রাজীবও একেবারে নিরামিষ খাইতে চাহে না। তথাপি এই বাড়িতে সে নিরামিষ আহায এখন গ্রহণ করে। নীলমাধবের অতিথ্‌ঘরে আমিষ আনিবার কথা নয়।

কিন্তু চক্রবর্তী ঠাকুরাণী তাহা বিশ্বাস করিবেন কি করিয়া? খ্রীষ্টানরা অখাদ্য খাইবেই। তাকে তাকে থাকিলে নিশ্চয় ধরা পড়িবে।

রাজীব ইহাদের কথা জানে—দীনু চক্রবর্তীকে জব্দ করিতে না পারিয়া তাহারা চৌধুরীদের জব্দ করিবাব সুযোগ খুঁজিতেছে। বেদনা পাইল রাজীব বরং তাহার পুরাতন সহচর মাঝিদের জালিয়াদের দাসেদের ঢাকীদের সঙ্গে দেখা হইলে। খেলাধূলায় 'ছোট চৌধুরী' ছিল চিরদিন তাহাদেব নেতা। গাছে চড়া, মাছ ধরা, নৌকা-চালনা, ঐসব চিরদিনের সহজ গ্রাম্যজীবনের মধ্যে তাহারা এক সঙ্গে বড হইয়াছে। চৌধুরী সন্তানেরা তাহাতে জন্মসূত্রেই এই গ্রামে নেতৃত্ব করিবার কথা। তবে অনন্ত চৌধুরীব মত না হউক, বাজীব চৌধুরীও এই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল আপনার গুণেই—সত্যই সে প্রধান বলিয়া। তাবপব সে স্কুলে গেল, কত শিখিল, কত পড়িল। তখনো সময়ে অসময়ে এই নিরক্ষর বাল্য-সহচরের নিকট তাহার পাঠ্য বিষয়েরও কত গল্প সে করিত। গল্প শুনিতে শুনিতে তাহারা অবাক হইয়া যাইত—পৃথিবীর দশ আনা জল, আর পাঁচ আনা মাত্র মাটি! তাহা হইলে যে কোনো দিন ত সব ডুবিয়া যাইবে! এই পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, তাই নাকি সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, শীত-গ্রীষ্ম। এক একটা তারা নাকি আবার সূর্যের অপেক্ষাও বড়। আর চন্দ্র নাকি অনেক অনেক ছোট সূর্যের অপেক্ষা!—

এই সব শুনিতে শুনিতে তাহারা তখন অবাক হইত। তাহার পর কেমন যেন বিভ্রান্ত, ক্লান্তও হইয়া পড়িত। অত তাহারা ভাবিতে পারে না। হয়ত তাহা পুঁথির কথা, আসলে সত্যও নয়। কেহ কি দেখিয়াছে তারা বড়, না চন্দ্র বড়, না পৃথিবী বড় ?—এইরূপ গল্প বলিতে বলিতে রাজীবের উৎসাহ বাড়িয়াছে। আবার হতাশা আসিয়াছে ;—ইহাদিগকে কেন সব কথা সে বুঝাইয়া দিতে পারে না ? কেন ইহারা শিখিবে না এই সব কথা ? দেবপ্রসাদ চৌধুরীর নিকট হইতে সে এই অবস্থাতেই পাইয়াছিল এই সহজ বোধ—ইহাদের মধ্যে এই জ্ঞানালোক বিতরণ না করিলে তাহার বিদ্যালাভও সম্পূর্ণ হইবে না। রাজীব সহরে পড়িতে গেল —নিয়মিত মেলামেশার সহজ সম্পর্ক তাহাতে একটু বাধা পাইল। বাধা পাইলেও তাহা বিনষ্ট হয় নাই। কিন্তু রাজীব শহরে যখন ধর্ম জিজ্ঞাসায়, সমাজ সংস্কারে মাতিল তখন এই বন্ধুদের কথা সে ভাবিতে আর অবসর পায় নাই। বরং গ্রামে ফিরিয়া ইহাদের আচার বিচারে, বিশ্বাসে নিয়মে আস্থা হারাইয়া হারাইয়া কতকাংশে রাজীবই আগ্রহ হারাইয়াছে। মনসার ভাসানে, আগমনী, নবমীর গানে, রাসে চরকে সে তাহাদের বিমুখ করিয়া দিত। তবু দেখাশুনা, সহজ সম্পর্ক একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। গহর ঢালী আসিলে, কালাচাঁদ দাস আসিলে, গণেশ মাঝি ডাক দিলে সহজ মনে রাজীবও আগাইয়া যাইত গল্প করিত। মাঝে মাঝে আগেকার মতই লাঠি খেলিত, গণেশের সঙ্গে মাছ ধরিতে ছুটিত, কিম্বা গহরের মত চলিত রথের মেলায়। বড় ভালোলাগিত সব আবার।

অনেক দিন পরে সে বাড়ি আসিয়াছে পৈতা ছিঁড়িয়া,—খৃষ্টান হইয়া। বাড়ি আসিয়াছে তাহাদের সেই রাজীব, ইহারাও তাই দেখিতে আসিয়াছে —সত্যই রাজীব করে কি ? দেখিতে কেমন হয়—খ্রীষ্টান হইলে মানুষ।

ও হরি! সেই মানুষই আছ যে, চৌধুরী!—কালাচাঁদ বলে। দাসেদের কালাচাঁদ, লাঠী খেলাতে সে রাজীবের জুটি ছিল।

তবে আবার কি হইব?—রাজীব হাসিয়া বলে। বন্ধুদের লইয়া পঞ্চবটীতলার ভাঙা চাতালের উপর বসিতে বসিতে গল্প জমে।

তবে খ্রীষ্টান হইতে গেলে কেন?—গহর ঢালী জানিতে চাহে।

রাজীব হাসিয়া উত্তর দেয়: আরে খ্রীষ্টান হইয়াছি কে বলিল?

তবে কি হইয়াছ?—পৈতা ছিঁড়িয়াছ। জাত মানো না। ঠাকুর দেবতা মানো না—গহর বলিতে থাকে।

রাজীব খুশী হয়—ইহাদের এই সব কথা বুঝাইয়া বলিতে সে আগ্রহ বোধ করে। ইহারা কেহ শিরোমণি ভট্টাচার্য নয়। তাহার বন্ধু, তাহাকে ভালোবাসে। লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পায় নাই, না হইলে তাহারই মত হইত!

রাজীব বলে: তোরা মানিস গোরা?—গহরেরই সহজ নাম গোরা। রাজীব জিজ্ঞাসা করে, জাত মানিস তুই? পৈতা রাখিস্? না, ঠাকুর দেবতা মানিস?

গহর আশ্চর্য্য হয়: —আমরা হইলাম ঢালী, মুসলমান। আমাদের ওসব মানিতে হয় না। কিন্তু আমাদের যা মানিবার তাহা মানি না নাকি?

রাজীব বলে: গ্যাখ্, তোরা মুসলমান—তোদের আসল কথা কি? এই না—আল্লা এক; কেমন? আমিও বলি আল্লা এক।

তুমি কি মুসলমান হইয়াছ নাকি?—গহর আরও বিস্মিত হয়।—না হইলে এক আল্লা বলো কেন?

রাজীব বুঝাইয়া বলিবে—গহর তাহার বিশেষ বন্ধু।—আরে শোন।

আল্লারই নাম ব্রহ্ম। আমি সেই ব্রহ্ম মানি। আর এসব ঠাকুর দেবতা সব বাজে।

গহরের বিস্ময়ের অবধি থাকে না।—সব বাজে! কালী দুর্গা মনসা শীতলা—সব বাজে? সে মুসলমান বলিয়া কি সে বলিবে ইহা সব বাজে? মনসা দুর্গা—কিছু মানিবে না?

হঠাৎ গহরের, সন্দেহ হইল। বলিল: তুমি কি তবে ফরাজী হইয়াছ? না, খ্রীষ্টান?

কিছুতেই তাহারা স্বস্থ বোধ করে না। অন্যদিকে রাজীবও কেমন ব্যর্থতায় পীড়িত হয়। না, শিক্ষাবিস্তার না করিলে ইহাদের সে আপনার কথা বুঝাইতে পারিব না। সে শুধু চৌধুরী বাড়ির নয়—চিত্রিসায়ের সমস্ত গ্রামের নিকটও কি আজ এত দূর হইয়া গিয়াছে? ঐ তাহার অজস্র সাধারণ মানুষের মধ্যে যদি এই ব্রাহ্মধর্ম ও এই জ্ঞানের প্রসার না ঘটে তবে—দেশ স্বাধীন হইবে কিরূপে? মানুষের উন্নতি হইল কই, রাজীবেরাই বা করিল কি?

রাজীব দেবপ্রসাদের কথাতেই মনে মনে শপথ গ্রহণ করে—আমি তোমাদের ত্যাগ করি নাই। আমি বরং তোমাদের সকলকে চাই, ধর্মের দ্বারা আপন করিতে চাই, জ্ঞানদানে উন্নত করিতে চাই।

শৈলী বলিয়া ফেলে: আমরাও ভাবিতাম তোমরা অখাদ্য খাও?

রাজীব হাসে: অখাদ্যটা কি শৈলী?

শৈলী বিব্রত বোধ করে: ধরো এই যা খাইতে নাই—যেমন মুর্গী। আর—আর—

'আর-টা' না হয় নাম না করিলি। আমি ত মুর্গী খাই না

দেখিলিই। কেউ কেউ খায় অবশ্য—গিরীশকে তাহার সাহেব প্রোফেসর খাওয়ায়। কিন্তু মুর্গী খাইলে কি হয় ?

চিন্তাহরণ ও গিরীশ এ বাড়িতে আসিত যাইত। তাহা শৈলীর খুব মনে আছে। নাচিয়া, ছড়া কাটিয়া শৈলী তাহাদের শোনাইত।

সেই গিরীশদা' ? খাইয়াছিলেন মুর্গী ! মাগো !—শৈলীর চোখে মুখে আশঙ্কা।—তারপরেও তোমরা তাহার সঙ্গে থাকো, এক হাঁড়িতে খাও ?

রাজীব মজা পায় : আর তোরা আবার আমার থালা বাসন ছুঁস্। ভাব্‌ তাহা হইলে, তোর জাতই বা কি আর রহিল ?

কিন্তু পরিহাস যেমনই হউক, শৈলীর মনের আশঙ্কা তাহাতে মুছিয়া যায় না। গহর বা কালাচাঁদের মত সে তবু অতটা বিভ্রান্ত হয় না। কারণ রাজীব যে অখাদ্য খায় না, তাহা সে বোঝে। তাই গ্রামের লোকে তাহা বিশ্বাস করিতেছে না দেখিয়া সে রাগ করে। রাজীব জানে—চৌধুরীবাড়ির সকলেই বোঝে—রাজীবের আহার কালে কোনো না কোনো উপলক্ষে প্রতিবেশিনীদের কোন কাজ পড়িয়া যায় মহেশ্বরীর কাছে, কিম্বা নীলমাধবের মন্দিরের নিকটে। কাহাকেও দেখিলেই অনন্ত চৌধুরী ক্ষেপিয়া যায়—কি দেখিতে আসিয়াছ ? রাজীব কি খায়, না ? খায় তোমাদের মাথা।

দেবপ্রসাদ তাহাকে থামায় : কি বলো, অনন্ত !

কিন্তু রাজীব কথা বলে, রাজীব বাঙলাতে কথা বলে, রাজীব নিরামিষ খায়—পিঁড়ি পাতিয়া মাটিতে বসিয়া দশ জনের মত হাত দিয়াই মুখে ডাল ভাত পোরে—এই সবই একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার চিত্রিসায়ের সমাজে। জোট পাকাইবার একটা অবসর জুটিল, অথচ কেহই তাহা পাকাইতে বেশি সুযোগ পাইল না। রাজীব চৌধুরী খ্রীষ্টান নয় বটে, 'ব্রহ্মজ্ঞানী' ; তাহাদের মতই দেখিতে, কিন্তু কিছুই তাহাদের মত মানে না

রাজীব বাড়ি আসিল, গেল। আবার রাঘব ফিরিয়া আসিল, মেজকর্ত্রীও ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু 'অনাসৃষ্টি' যতই অসহ্য হউক, তেমন একটা বিপদ যখন ঘনাইয়া আসিল না, তখন তাহাদেরও প্রতিবাদের তীব্রতা কমিয়া গেল। পূজা পার্বণের বাড়িতে রাজীব আসিবে না, তাহা ছাড়া মাসে মধ্যে এমনি আসিলে কি করা যায়? তবে সে গৃহমধ্যে স্থান পাইবে না।

রাজীবও তাই মাঝে-মাঝে বাড়ি আসিবে—সে সমাজত্যাগী নয়। কাহাকেও ভুলিতে চায় না।

দেবপ্রসাদ নিজের মনে মনেই ভাবে—রাজীব এই পরিবার, এই গ্রাম, এই সমাজকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে কি? বন্ধন একবার জোর করিয়া ছিঁড়িলে আর যে তাহা জোড়া লাগে না।

১৫

পীতাম্বার গাঙ্গুলী নন্দীগ্রামেই প্রায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। শহরে ছেলেরা তাঁহার সহিত প্রকাশ্যে সম্পর্ক-চ্ছেদ করিয়া ভিন্ন গৃহে বসবাস করে; সেখানে আর তাঁহার মুখ দেখাইবার ইচ্ছা নাই। প্রতি দিন তাহাদের কার্য কলাপে সেই উঁচু মাথা আরও হেঁট হইবে মাত্র। তাহা ছাড়া পত্নীবিয়োগের পর তাঁহার পক্ষে বাড়ি ছাড়িবারও উপায় ছিল না। অসুস্থা হইলেও দুর্গাবতী দাস-দাসীর মারফৎ সংসারের তদারক করিতে পারিতেন; বাড়ি ঘর একরকম আগলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে সংসারে দেখিবার লোক এখন চিন্তাহরণের বধূ। অবশ্য মনোরমা আর বালিকা নাই; বৎসর পনের বয়স হইতে চলিল। গিন্নি

ঠাকুরাণী আসিয়া এখানে ভার-গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু গিরিঠাকুরাণী কেমন ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি আর গ্রামে ফিরিতে চাহেন নাই। ভগ্নীর সেই পরিচিত সংসারে আপনার পূর্ব কর্ত্রীত্বভারও গ্রহণ করিতে তাঁহার পক্ষে যেন কি বাধা আছে। তিনি বলতেন—শহরে থাকিলে গিরীশের চিন্তাহরণের সংবাদটা অন্তত তিনি পান, কদাচিৎ চোখের দেখাও দেখিতে পাইবেন। গাঙ্গুলী মহাশয়ও তাঁহাকে গ্রামে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন না। বধূমাতা সংসার দেখিবে—তাহারই ত সংসার। শ্বশুর আছেন, ভয় কি?

মুহুরী কাকা আসিয়া চিন্তাহরণকে বলিলেন: একটা বিহিত ত করিতে হয়? বড় বিপদ হইল।

কি বিপদের কি বিহিত, চিন্তারণ তাহা শান্তভাবে শুনিতে চাহে। কথাটা যে ভাবে মুহুরি কাকা উত্থাপন করিতেছেন ও যতটা ভূমিকা ফাঁদিতেছেন, তাহাতে তাহা গুরুতর হইবার সম্ভাবনা। অথবা না হইতেও পারে—মুহুরি কাকার অনেক দিনের অভ্যাসই এইরূপ। চিন্তাহরণ তাহাতে ধৈর্য্য হারাইবে না। গিরীশ হইলে বিরক্ত হইত, তাহা প্রকাশও করিত, মুহুরি কাকাকে কঠিন কথা শুনাইয়া দিত। গিরীশ এখনই আসিতে পারে; তাহার আগে মুহুরি কাকা বিদায় লইলেই ভালো।

যথা নিয়মে ভূমিকা করিতে করিতে মুহুরি কাকা কথাটা উপস্থিত করিলেন:—একটা বিহিত করিতে হয়। নন্দীগ্রামের ঘর-দুয়ার দেখে কে? তোমার বধূ এখনো বালিকা। আর সে থাকিবে দেশে, তোমরা এখানে? সেও ডাগর হইতেছে, তাহার কথাটাও তোমাদের ভাবিতে হয়। গাঙ্গুলী মহাশয়ের অবস্থাটা বুঝিতেছ?—শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছে। এই বয়সে কে তাঁহাকে দেখে, কে বা দেখে তাঁহার সংসার? আর মনস্তাপই কি কম? দুই দুইটি ছেলে—রাজপুত্রের মত ছেলে,—তাহারা

তাঁহার দিকে তাকাইল না। আর একটা ছেলেও নাই।—মেয়ে? মেয়ে ত কুসন্তান—গোত্রান্তর হইয়াছে, চলিয়া গিয়াছে; সে ত পিণ্ডদান করিবে না। শেষে পিণ্ড লোপ পাইবে নাকি গাঙ্গুলী গোষ্ঠীর?

চিন্তাহরণ কতকটা বুঝিল।—এখন কি করিতে চাহেন?

আবার বলি, তোমরা এই সব ছাড়; এখন বাড়ি চলো।—বলিয়া মুহুরিকাকা কাছে সরিয়া আসেন—একটা প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইবে। পৈতা ছিঁড়িলেই বা কি হয়? চোখে একটা চতুর ইঙ্গিত।

চিন্তাহরণ ধীরভাবে জানায়: তাহা ত হইবে না, জানেন।

জানি বলিয়াই ত বলিতে আসিয়াছি—পিতৃপিতামহের পিণ্ডই যদি না দিলে তবে পিতৃ-পিতামহের সম্পত্তিই বা পাইবে কিরূপে?

ও! এই কথা বলিতে আসিয়াছেন? তা ঠিক কথা। সম্পত্তির যাহা হয় তিনি করিবেন। আমি তাহা চাই না।

মুহুরি কাকা যেন তাহাও পূর্বেই বুঝিযাছিলেন। তথাপি তাহার ত বুঝাইয়া বলা উচিত: দ্যাখো! রাগের মাথায় কি বলিতেছে যত ছেলেমানুষ!—সস্নেহ ভর্ৎসনা।

না আমি রাগ করি নাই। যাঁহার কথা রাখি নাই তাঁহার সম্পত্তি লইব কেন?

এইক্ষণে গিরীশ আসিয়া গেল। মুহুরি কাকা যেন একটু তাহাতে বিব্রত ভীতবোধ করিলেন।

কি ব্যাপার?'—গিরীশ জিজ্ঞাসা করিতেই চিন্তাহরণ বুঝাইল—বাবা আমাদের ত্যাজ্য করিতে চাহেন। মুহুরি কাকা অমনি বুঝাইয়া বলিতে গেলেন—তাহা নয়। কিন্তু গিরীশ সেই কথা না শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল: ত্যাজ্য করিলেই পারেন। কে বাধা দিতেছে? তাঁহার সম্পত্তি কে চায়? দিলেও আমরা তাহা লইব না। আমি কাহারো সম্পত্তি চাই না।

মুহুরি কাকা স্নেহে মোলায়েম হইলেন : আহা! না লইলে ত না লইলে। এখন সেই কথা বলিবার কি?—আসল কথা হইল – পূর্বপুরুষের পিণ্ডিদানের একটা ব্যবস্থা ত করা দরকার।– যেন একটা সমস্যার কথা।

এইবার চিন্তাহরণ কথাটায় নূতন অন্য একটা আভস পাইল। গিরীশ মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত বুঝিল। বলিল : সে আমাদের দিয়া হইবে না, এই ত বলিতে চান? এতদিনে তিনি তবে ইহা বুঝিয়াছেন। তারপর কি করিবেন? তাহাও আমি বুঝিয়াছি—গাঙুলী মহাশয়ের এখন দার-পরিগ্রহ করা দরকার। এত লম্বা ভূমিকা তাহার জন্য কেন করিতেছেন? সোজা কথাটা বলুন।

মুহুরি কাকা ভাব দেখান—যেন ক্রমশই বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিতেছেন। বলেন : আরে, তাহা বলিতেছি না। ঠিক তাহা নয়। ঠিক তাহা নয়। কর্তার সেই রকম ইচ্ছা মোটেই নাই—

কর্তার নাই, আপনাদের আছে, না? আর তাই তিনি রাজী হইয়াছেন। কেমন?

মুহুরি কাকা সত্যই এবার অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন। কি কথারে বাবা! মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া যেন ফৌজদারীর মোক্তার জেরা করিতেছে।—বলেন, না, কর্তা রাজী নয়। তবে গাঙুলী গোষ্ঠীর পিণ্ডলোপের কথাটা ত সকলেরই ভাবিতে হয়।

পিণ্ড ত পরকালের ভাবনা। ওঁর জীবিত কালে ত সেই প্রয়োজন নাই। ওঁর জীবিত কালের প্রয়োজনটা বরং ভাবুন।

মুহুরি কাকা বিস্ময়ে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকেন। তাই ত। কি বলিতেছে গিরীশ? পুত্র হইয়া পিতার সম্বন্ধে এ সব কি আলোচনা করিতে সে উদ্যত?—একটা সামান্য মান্যগণ্য, লজ্জা সরমও নাই!

গিরীশ ততক্ষণে বলিল : কিছু আপনারা ঠিক করিয়াছেন নাকি?

মুহুরি কাকা যেন থৈ পান। বলেন: না, না। তবে কথা যখন তুলিলে তখন ভাবিতে হইবে। এক আধটুকু কথা হইতেছে। পিণ্ডলোপ না করিতে হইলে বয়স্থা কুলীন কন্যা দেখিতে হইবে। আবার উপযুক্ত বংশও ত দেখিতে হইবে—না হইলে অমন মানী, অত বড় পরিবারের কর্ত্রী হইবে কি করিয়া?—নন্দীগ্রামের গাঙুলী তোমরা! তাহা বোঝ ত—

কিন্তু গিরীশ কথা শেষ করিতে দেয় না। কঠিন অর্থপূর্ণ কণ্ঠে বলে,—ওসব ছাড়ুন। শুনুন,—যাঁহাকে তাঁহার বিবাহ করা উচিত তাঁহাকেই যেন বিবাহ করেন—এখনো এই সাহসটুকু যেন দেখান।

মুহুরি কাকা যেন সম্বিৎ হারাইয়াছেন বিদ্যুদাহতের মত মুখের দিকেই তাকাইয়া আছেন। কিন্তু গিরিশের চোখও ত চোখ নয়—যেন রুষ্ট দেবতার তীব্র, তীক্ষ্ণ চাহনি—তাহাতে অন্তঃস্তল দেখা যায়। সংশয়ের ক্ষীনতম অসন্তোষও নাই তাহার কণ্ঠস্বরে, আর প্রত্যেকটি কথা যেন ধনুষ্টঙ্কারের মত বাজিতেছে। তীক্ষ্ণস্বরে সে বলিল:

কথা বাড়াইবেন না, যান। এই সাহস তাঁহার মধ্যে এখনো না দেখিলে আমরাই অগ্রসর হইব। এই বিষয়ে চুপ করিয়া থাকিব না, বলিবেন।

কি বলিতেছে, কি বলিতেছ—আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি না, চিন্তাহরণ, তোমাদের কথা।—চিন্তাহরণের উদ্দেশ্যে মুহরি কাকা সকাতর দৃষ্টিতে আবেদন করিতে যান। চিন্তাহরণ শান্তভাবে তাঁহাকে থামাইয়া দেয়,—আপনিও বুঝিয়াছেন। আর যদি না বুঝিয়া থাকেন বাবাকে বলিবেন এই কথা। তিনি বুঝাইয়া দিবেন।

কি যে বলো। তিনি তোমাদের বাপ—অমন নামী লোক।

হাঁ, সেই নাম রাখুন,—বিধবা বিবাহের দলের লোক তিনি। না হইলে আমরাই তাহার ব্যবস্থা করিব। যান, বলুন গিয়া—একথা।

মুহরি কাকা কিছুই বুঝিতে পারেন না। বুঝিবেন কি?—কলিকাল।

১৬

একটা রুদ্ধ দর্প গিরীশের মনের মধ্যে কত কাল গজ্‌রাইতেছিল, তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারে নাই। চিন্তাহরণ উহা আশৈশব জানিয়া বুঝিয়া বড় হইয়াছে গিরীশের পক্ষে তাহা ঘটে নাই। তাই চিন্তাহরণের যেখানে বেদনা, পীতাম্বর গাঙ্গুলীর আচরণের অসঙ্গতির জন্য গোপন লজ্জা, আবার মমতা, অনুকম্পাও, গিরীশের মনে এখন সেখানে জমিয়া উঠিয়াছে ক্ষোভ বিতৃষ্ণা, কপটতার বিরুদ্ধে ঘৃণা। যাহা এক সময় ছিল অভিমান, তাহাই পরিণত হইয়াছিল অভিযোগে; তারপর দুর্জয় জ্বালায়, আদর্শের উগ্রতায়, তির্যক অহঙ্কারে।

সে কোন্ শৈশব, গিরীশের মনে নাই। জন্মাবধি সে মাসীমায়ের ছেলে। আপন পিতা মাতাই নাম রাখিয়াছিলেন গিরীশ। মায়ের কাছে সে শুইতে চাহিত না; মাসীমায়ের পার্শ্বেই ছিল তাহার শয্যা। তবু ঘুমাইয়া পড়িলে মায়ের পাশেই তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া যাইতেন তখন মাসীমা। গিরীশ জাগিয়া ক্রন্দন জুড়িয়া বসে, 'মাসীর কাছে যাইব।' কাঁদিতে কাঁদিতে কত রাত্রি সে মাসীর পার্শ্বেই গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ক্রমেই মা কিন্তু চেষ্টা করিল তাহাকে আপনার কাছে রাখিতে। রুগ্না, দুর্বলা সেই মা কত তাহাকে শান্ত করিতে চাহিয়াছে, 'কাল যাইবে, আজ নয়'; 'মাসী ঘুমাইয়াছে, তুমিও ঘুমাও'; 'আবার মাসী কেন? আমি আছি।' কিন্তু গিরীশ বুঝিয়া গিয়াছিল

—তাহার ক্রন্দন শুনিলে গিরি ঠাকুরাণীও স্থির থাকিতে পারিতেন না। উঠিয়া আসিয়া বলিতেন, 'দুর্গা, দে আমার কাছে। না হইলে তোকে জ্বালাইবে এই বজ্জাতটা সারা রাত্রি।' এই নিত্য-ঘটনার মধ্যে গিরীশের কানে পৌঁছিলেও তখন মন স্পর্শ করে নাই মায়ের দুই একবারের প্রকাশিত ক্ষোভ! 'আমি কি মাও নই? আমার সবই কি কাড়িয়া লইবে সে ডাকিনী? তোদেরও আমি পাইব না? কেন? কেন?'—অবরুদ্ধ ক্রন্দন, ক্ষুব্ধ রোষ, রক্তাক্ত অভিযোগ নিশীথের সেই শয্যার উপরে মাথা খুঁড়িয়া মরিত একাকিনী মায়ের বুকে। গিরীশের মর্মে তাহা পৌঁছিত কই? সে আরও ক্রন্দন জুড়িয়া দিত, 'মাসী! মাসী! মাসী!' মাসীই তাহার সব।

গিরীশের মন প্রথম স্পর্শ করিয়াছিল যখন সে শহরে পড়িতে আসিল মায়ের তখনকার ক্রন্দন-বিমথিত রুদ্ধ অভিমানের কথা।

দুর্গাবতী দুই ছেলেকে বলিলেন: 'মন পড়িবে' না আমার জন্য?

চিন্তাহরণ ঈষৎ লজ্জিতভাবে মৃদুকণ্ঠে বলিল: হুঁ। তারপর মুখ লুকাইল।

দুর্গা মুখের কাছে টানিয়া আনে দুই পুত্রকে। জড়াইয়া ধরে। বলে: কি করিবে তখন?

চিন্তাহরণ মায়ের কোল ঘেঁসিয়া আসে আরও। মুখ লুকায় আঁচলের আড়ালে।

দুর্গা জিজ্ঞাসা করে গিরীশকে আবার: কি করিবে তখন, ছোটক?—মা তাহাকে গিরীশ নামে ডাকেন না আর 'ছোটক' তাহার মায়ের দেওয়া নাম। সেই সম্বোধনে গিরীশ সহজ অন্তরে বলে: মাসীমা থাকিবেন ত।

কি যেন দংশন করিল মাকে। হঠাৎ সে দুইহাতে ঠেলিয়া দেয়

গিরীশকে। শত জ্বালায় জলে মায়ের চক্ষু। 'মাসীমা...হুঁ, মাসীমা... ছেলেও আমার নয়, না?' শীর্ণ ওষ্ঠাধর কাঁপে, শুষ্ক নীরস হয়। শীর্ণ কপোলের রক্ত যেন নিঃশেষ হইয়া যায়। চিন্তাহরণ ভয় পাইয়াছে। গিরীশও ভয় পায়। মা কি বলিতে চাহেন?

পীতাম্বর গাঙ্গুলী সোচ্ছ্বাসকণ্ঠে কি বলিতে বলিতে সেই সময়ে গৃহে আসেন :

নাড়ু, মোয়া কত আর দিবে আর? মাসীমা ত সঙ্গেই গেল—উহাদের ত পোয়াবারো। বরং এদিকে এই বাড়িঘর এখন তুমি কি করিয়া দেখিবে, এই শরীরে সামলাইবে, আমার শহরে থাকিবে সেই দুর্ভাবনা!

মা অঞ্চলে মুখ ঢাকিলেন। পীতাম্বর গাঙ্গুলী বলিতে লাগিলেন : আরে অত ভাবনা কি? গিরিঠাকুরাণী থাকিবেন সেখানে। সপ্তাহে সপ্তাহে আমার সঙ্গে বাড়ি আসিবে গয়নার নৌকায়। ব্যাটাছেলে, শহরে পড়াশুনা না শিখিলে চলিবে কেন?

মাসীমাকেই গিরীশ মা বলিয়া জানিয়াছিল, জানিত। তাহাতে তাহার লজ্জা ছিল না, সঙ্কোচ ছিল না। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর সূত্রে তাহার মনে পড়িল বহুকাল বিস্মৃত সেই সব স্মৃতি। ইতিমধ্যে যাহা গিরীশ বুঝিয়াছে, যাহা ঘটিয়াছে, তাহাও তাই সে ভুলিতে পারিল না।

বৎসর সাত তাহার বয়স, মাসীমা সম্পর্কে গিরীশ একদিন একটা কি পরিহাস শুনিয়াছিল গ্রামের পাঠশালার ছেলেদের মুখে। ভালো বুঝিতে পারে নাই বুঝি। কিন্তু বৎসর দশের গিরীশ শুনিয়া আর ভুলিতে পারে নাই—মাসীমায়ের বিষয়ে শহরের প্রতিবেশী পরিবারের সবঙ্কিম কৌতূহল : মাসীই বুঝি গাঙ্গুলী মহাশয়কে দেখেন শোনেন?

গিরীশই কথাটা বলিয়াছিল ইহাদের প্রশ্নের উত্তরে, 'কর্তাকে কে

দেখে?' এখনও বলিল: হাঁ, কাপড়-চোপড় সব তিনি গুছাইয়া রাখেন।

কেমন একটা চাপা হাসি যেন প্রতিবেশিনী মাতা ও কন্যার মুখে চোখে। কন্যা ত বলিয়াই ফেলিল: সুগৃহিণী! গাঙুলী মহাশয় ত বিধবা বিবাহের দলে। তা মাসীকে বিবাহ দেন না কেন? সুগৃহিণীটি হাত ছাড়া করিবেন না বুঝি?

মাতা মেয়েকে শাসন করিলেন: ছিঃ, রাধা কি বলিস্। আর, এ ছেলে মানুষ কি বুঝিতে কি বুঝিবে। না, গিরীশ, তুমি এসব ছাইভস্ম শুনিও না। কিন্তু তোমার মাকে একবার দেশ হইতে আনিও না. আমরা দেখিব।

গিরীশ মাকে বলিয়াছিল: মা, তুমি একবার চলো শহরে। মা তাকাইয়া রহিলেন, তারপরে কাছে টানিয়া বলিলেন: তাহা হয় না। বাড়ী ছাড়িয়া আমি যাইব কেমন করিয়া?

না হয় মাসীমা আসিয়া থাকিবেন কিছুদিন বাড়িতে।

মাসী।—শুষ্ক হয় মায়ের কণ্ঠস্বর।—আবার এই বাড়িতে আসিবে সে মুখ দেখাইতে!

কিন্তু পরক্ষণেই বলেন মা: ইহা আমার শ্বশুরকুলের বাড়ী, ছোটক। তোমাদের বাড়ি, নন্দীগ্রামের গাঙুলীদের বাস্তুভিটা। আমি এই বাড়ী ফেলিয়া যাইব কোথায়? ছাখো নাই—তোমার ঠাকুমা, কাশীও যাইতে পারিলেন না। তিনি ভার দিয়া গিয়াছেন আমাকে। আমি ভার দিয়া যাইব কাহাকে? তোমার বউ আসুক আগে।—গিরীশ অমনি লজ্জা পাইয়াছে; আর বলে নাই কিছু।

বহু পরে অবশ্য গিরীশ একদিন মাসীমাকেও বলিয়াছিল: মাসী, তুমি দেশে যাও শহরে থাকিও না। কিন্তু তাহার পূর্বে অনেক কিছু ঘটিয়াছে।

দেবপ্রসাদ চৌধুরীর শিক্ষকতায় তাহারা পড়াশুনায় উৎসাহ লাভ করিল। দুই ভাই পিতার উৎসাহে-চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শেও আসিল। নিজেদের জীবনে নূতন আদর্শ লাভ করিল—মাসীমাও তাহাতে নূতন প্রেরণা দান করিলেন। তাহাদের সুরাসক্ত পিতা কেমন করিয়া মাসীমায়ের শাসনে—তিরস্কারে অনুরোধে—মদ্যপান প্রায় ছাড়িয়া দিলেন, তাহাও তাহারা দেখিল। দেখিল মাসীমায়ের অদ্ভুত গৃহ-নৈপুণ্য ঔদার্য, কর্ত্রীত্বের সহজশ্রী। নারীর ব্যক্তিত্বময় সেই রূপ দেখিয়া তাহারা গর্বিত হইল মাসীমায়ের জন্য—আর নিজেরাও মহৎ আদর্শের প্রেরণায় পৃথিবীর মহৎ প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল। ক্রমেই চিন্তাহরণের মত ইহাও গিরীশ বুঝিতেছিল—তাহাদের পিতা যতটা মুখে হৈ হৈ করেন কাজে ততটা অগ্রসর হন না। দেওয়ান বাহাদুরের মত বন্ধু, জিরতলীর কুমারদের জলসা আড্ডা, কিছুই তিনি একেবারে ছাড়িতে পারেন না। গিরিঠাকুরাণীও এইজন্য কম তাঁহাকে পরিহাস করেন না। 'গাঙুলী মহাশয় আবার চোখ বুজিয়া কি উপাসনা করিতেছ ?—খোলা চোখেই যাহা দেখিতে পাও চোখ বুজিয়া ত তুমি তাহাই দেখিবে—নিরাকারও নয়, পরম ব্রহ্মও নয়। দেওয়ান বাড়ির বৈঠকখানা আড্ডা, হৈ রৈ, জলসার বাঈজী খেমটাওয়ালী।'

পীতাম্বর গাঙুলী ভয়ানক আপত্তি করিতেন: আমি সেই সবে যাই ?—সত্যই এখন ক্বচিৎ কদাচিৎ তিনি উহাতে যান। তারপর গোপনে আবার গিরিঠাকুরাণীকে তিনি বলেন: ছেলেরা আছে ; এই সব বলিলে তাহারা আমাকে কি ভাবিবে ?

গিরিঠাকুরাণী আরও কঠিন কণ্ঠে বলেন: সেই জ্ঞান তোমার আছে কি ? তোমাকে ঐ রকম মত্ত দেখিলে তাহারা আরও ভালো মনে করিবে বুঝি

পীতাম্বর গাঙ্গুলী সত্যই সাবধান হন। ছেলেদের সামনে তিনি বেসামাল হইতে পারিবেন না, গিরি ঠাকুরাণী সেইদিকে লক্ষ্য রাখেন। কিন্তু পীতাম্বর গাঙ্গুলীর সব আদর্শ উৎসাহ সকলেই জানে ফাঁকা, নামের লোভ। গিরীশও তাহা ক্রমেই বুঝিতে পারে। দেবপ্রসাদের লেখা তিনি আপনার বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে যান গিরিঠাকুরাণীর কাছে। গিরিঠাকুরাণী হাসেন, বলেন: ছেলেরা হাসিবে। তাহারা যে ছোট চৌধুরীকে লিখিতে দেখিয়াছে এই লেখাটি।

পীতাম্বর গাঙ্গুলী দমেন না। হাসিয়া বলেন: তুমি ত ঠাকুরাণী সবই দেখো 'ছোট চৌধুরীর লেখা'। কলম তাহার, কিন্তু চিন্তা জোগায় কে?

গিরিঠাকুরাণী চোখ বড় করিয়া বলেন: তুমি নাকি, গাঙ্গুলী মহাশয়?

নয় ত তুমি নাকি, গিরিঠাকুরাণী। একটু অপমানের রেশ থাকে এই উত্তরে। গিরিঠাকুরাণীর পরিহাসও ত বড় মারাত্মক।

কিন্তু পিতার সঙ্গে মাসীমায়ের সম্পর্কটা নিছক এতটা নির্দোষ পরিহাসের নয়, তাহা ক্রমেই গিরীশও বুঝিয়াছে। সেই সম্পর্ক যে আরও জটিল হইয়া উঠিতেছে ইহাও বুঝিতে বাকী রহিল না ক্রমে।

পীড়িত রাজীবকে লইয়া দেবপ্রসাদ চৌধুরী তখন চিকিৎসায় গিয়াছে। আর ফিরিয়া আসেন নাই। নন্দীগ্রাম হইতে শহরের বাড়িতে ফিরিতেই দুই ভাই বুঝিতে পারে কোথাও একটা অস্বচ্ছ কৃষ্ণচ্ছায়া সেই গৃহমধ্যে ঘনাইয়া আছে।

পূর্বেও কথা হইয়াছে, ভৃত্য এইবার বাহিরে দেবপ্রসাদের খুপরীতেই চিন্তাহরণও গিরীশের আবাস স্থির করিল। অন্দরে তাহাদের ঘরেই বসন্ত-পীড়িত রাজীব থাকিত, ছেলেদের পক্ষে সেই গৃহে বাস এখন নিরাপদ নয়।

গিরিঠাকুরাণী গম্ভীরস্বরে বলিলেন : না। কিন্তু বাইরের ঘরে যাইবে কেন ? উহারা আমার ঘরে থাকিবে।

তোমার ঘরে জায়গা কোথায় ?

যা আছে, উহাদের পক্ষে যথেষ্ট।

কেমন থমথম্ করে বাড়ি। একদিন দুইদিন কাটিয়া যায়, সেই অস্বস্তি শেষ হয় না। সেদিন সায়াহ্নে অবশেষে মদ্যপান করিয়া আসিয়া গিরিঠাকুরাণীর গৃহে পুত্রদের সম্মুখে বসেন পীতাম্বর গাঙুলী।

কি পড়িতেছ ?

মুখে মদের গন্ধ। চিন্তাহরণ অধোবদন। গিরীশ স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে পিতার দিকে, উত্তর দেয় না।

গৃহকোণে গিরিঠাকুরাণী আহ্নিক করিতেছিলেন, তখনো তাহা শেষ হয় নাই। তিনি ঘ্রাণ পাইয়াছিলেন, বলিলেন : গাঙুলী মহাশয়, ইহাদের পড়াশুনায় বাধা দিতে আসিলে কেন এই ঘরে ?

আমি আসিলেই বাধা হয় বুঝি ?—সুরা-জড়িত ক্ষুব্ধ কণ্ঠ গাঙুলী মহাশয়ের।

গিরিঠাকুরাণী মুখ তুলিয়া বলিলেন : পড়ার সময়ে গোল করিও না, এখন যাও।

কেন ? আমি কি পড়াইতে জানি না ? তোমার 'ছোট চৌধুরীর' অপেক্ষা বেশিই জানি ইংরেজী লেখাপড়া।

গিরিঠাকুরাণী বিদ্যুতস্পৃষ্টের মত দাঁড়াইলেন। পরে হাসিলেন, —ছেলেদের সম্মুখে তিনি। তাই বলিলেন : সে ত ভালো কথা। কিন্তু ইহাদের ত এখন পড়িতে দাও।

গাঙুলী মহাশয় ছাড়িবেন কেন ? বড় লাগিল বুঝি—ছোট চৌধুরীর কথায়।

গিরিঠাকুরাণী আর পারিলেন না। কঠোর স্বরে বলিলেন: চুপ, গাঙুলী, মহাশয়!

পীতাম্বর গাঙুলী একবার বলিতে চেষ্টা করিলেন: ইস্। কিন্তু গিরিঠাকুরাণীর মুখ চোখ দেখিয়া কেবলই সাহস হারাইতে লাগিলেন। গিরিঠাকুরাণীর দৃষ্টিই তাহাকে বেত্রাহত কুক্কুরের মত সংকুচিত করিতে লাগিল। শেষে আদেশের স্বরে গিরিঠাকুরাণী বলিলেন: যাও, এখন; বাহিরে কাছারি ঘরে যাও।

পীতাম্বর গাঙুলী চেষ্টা করিয়াও বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। উঠিলেন। বাহির হইয়া বলিতে বলিতে গেলেন: কেন? কাহার এই ঘর? কাহার এই বাড়ি? আমি পীতাম্বর গাঙুলী কিছু বলি না বলিয়াই কি কিছু বুঝিও না?

গৃহমধ্যে গিরীশ চিন্তাহরণ গিরিঠাকুরাণী। কেহ আর কাহারও মুখের দিকে মুখ তুলিয়া দেখে নাই সে রাত্রিতে।

ইহার পরবর্তী দৃশ্যও গিরীশ জানে। গভীর রাত্রি হয়ত তখন। পীতাম্বর গাঙুলী বাহিরের বারান্দায় অনুতপ্ত স্বরে ক্রন্দন করিতেছেন, গিরিঠাকুরাণী, আমি অধম, আমাকে ক্ষমা করো। বলো ক্ষমা করিলে। বলো বলো।

গিরিঠাকুরাণী ক্লান্তকণ্ঠে বলেন: থামো আর নয়, বাড়ী শুদ্ধ লোক এত রাত্রে জড় করিও না।

আরও অনুতপ্ত কণ্ঠ গাঙুলী মহাশয়ের: না, না, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

অনেক পরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন মাসীমা: ক্ষমা তোমাকে আমি করিব কোন্ জোরে? তোমার ছেলে, তোমার বাড়ি ঘর। কিন্তু আমি নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিব না।

চিন্তাহরণ সেবার মাসীমাকে প্রথম বলিয়াছে: মাসীমা, এখন তুমি দেশে যাও।

গিরিঠাকুরাণী তাহার মুখের পানে তাকাইলেন। তারপর মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিলেন। দীর্ঘশ্বাস পড়িল। বলিলেন: চিন্তাহরণ, তোমাদের ছাড়িতে পারি নাই বলিয়াই ত বাড়ি ছাড়িয়াছিলাম। আজ যে সে পথ বন্ধ।

চিন্তাহরণ কি বুঝিল ঠিক নাই। কিন্তু গিরীশ কিছুই বুঝিতে চাহে নাই। তাহার আদর্শের তীব্র বিদ্যুচ্ছটায় তখন সে জানিয়াছে—তাহার পিতা শুধু দুর্বল-চরিত্র নয়, চরিত্রহীন। ব্রাহ্মধর্ম, ব্রাহ্মজীবন, সুনীতি, সুরুচি সম্বন্ধে তাঁহার শ্রদ্ধা শুধুই একটা মৌখিক বাহাদুরি।

মাসীমায়ের মত অদ্ভুত শক্তিময়ী মহিলার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন বলিয়াই এখনো তিনি মানুষ রহিয়াছেন। না হইলে কি হইতেন, ওই দেওয়ান সাহেবকে দেখিয়াই তাহা বুঝা যায়।

আশ্চর্য মানুষ তাহার মাসীমা। নারীজাতির প্রতি গিরীশের শ্রদ্ধা বাড়িয়া যায় তাঁহাকে দেখিয়া। এই বাসাবাড়ির প্রত্যেকটি মানুষের সুখ-দুঃখে তিনি অন্দরে থাকিয়াও সহমর্মিণী। ব্রত-উপবাস যাহাই তিনি করুন, আসলে মাসীমা অনেক বেশি বুঝেন গিরীশ ও চিন্তাহরণের আদর্শকে। সাহসেরও তাঁহার অভাব নাই। রাজীবকে অসুখের সময় অন্দরে লইয়া গেলেন, দেবপ্রসাদ চৌধুরীকে সেখানে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এত করিয়াও তিনি কেন পীতাম্বর গাঙ্গুলীকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিলেন না? গিরীশ মনে মনে বুঝে—সেখানে মাসীমায়ের নিজের দুর্বলতা ছিল বলিয়া। সেই দুর্বলতাই তাঁহারও কাল হইয়াছে। দুর্বলতা সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া এমন মহিলাকে কি গ্লানিতে টানিয়া নামাইতেছে। গিরীশ বেশ বুঝিতেছে এই গ্লানিতে

মাসী মায়ের জীবন ভরিয়া উঠিবে—যদি এখনো তিনি সবলে সমস্ত কিছু ঝাড়িয়া না ফেলিতে পারেন। গিরিঠাকুরাণী এখনো উদ্ধার পাইতে পারেন—শুধু চাই সেই সাহস! আর চাই গিরীশ চিন্তাহরণের সহায়তা।

প্রথমবার গৃহত্যাগ করিয়া গেলেও গিরীশ তাই নিতান্ত অনিচ্ছায় আবার পিতার বাসগৃহে ফিরিয়া আসে নাই। গিরিঠাকুরাণী তাহাদের নীতি ও ধর্মকেই সেই গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। গিরীশ আশান্বিত হইল—মাসীমাকেও তাহারা পাইবে আপনাদের সঙ্গে। কিন্তু সে দেখিল—মাসীমা তাহাদের সকল অধিকার স্বীকার করিয়া এইবার নিজে যেন আপনাকে গুটাইয়া লইতে লাগিলেন। তিনি ঝুঁকিলেন ব্রত উপবাসের দিকে। আচার নিয়মে পূর্বেও তাঁহার শিথিলতা ছিল না, কিন্তু এখন যেন বাড়াবাড়ি হইল। গিরীশের চিন্তাহরণের আপন ইচ্ছামত চলিবার সমস্ত সুযোগ তিনি করিয়া দেন। সর্বদা সচকিত—বুঝি তাহাদের অসন্তোষ ঘটিবে। তাহাদের তিনি আরও আপনার করিতে চান। পীতাম্বর গাঙ্গুলীকে তিনি সকল রকমে আরও দূর রাখিয়া চলেন। পীতাম্বর গাঙ্গুলীও ক্ষুণ্ণ হন। জোর না করিলেও নিজেই শুনাইয়া বলেন: এই বাড়িতে যেন আমিই পর। কাহার যে কি সর্বনাশ করিলাম আমি, তাহা জানি না।

গিরীশের আর সহ্য হয় না। গিরীশও মাসীমাকে বলিল: মাসীমা, তুমি দেশে ফিরিয়া যাও।

গিরিঠাকুরাণী নিস্তব্ধ। পাংশুমুখে দাঁড়াইয়া থাকেন। কষ্টে হাসিয়া শেষ বলেন: কিন্তু তুমিই যে আমাকে দেশ হইতে টানিয়া আনিয়াছিলে; আমি না আসিলে শহরে পড়িতে আসিবে না। তোমোদের ছাড়িয়া আমিই বা যাই কোথায়?

গিরীশ জানে—গিরিঠাকুরাণী মিথ্যা বলেন নাই। কিন্তু এবার সে

ভাবে—ইহা সম্পূর্ণ সত্য কি? তাহার জন্যই কি গিরি ঠাকুরাণী দেশ ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছিলেন। শুধু তাহাদের জন্য? আর কোনো আকর্ষণ নয়? আশ্চর্য, এখনো তাঁহার অসম্মান তিনি দেখিবেন না?

গিরি ঠাকুরাণী হাসিয়া বলিলেন: বেশ, তোমাদের যেখানে সাধ্য লইয়া যাও, যাইব। কিন্তু আর আমাকে পরের গলগ্রহ হইতে বলিও না আবার!—হাসিতেছেন, কিন্তু চোখ তাঁহার ছলছল যে।

গিরীশ একবার বুঝিয়া দেখিতে চাহিল তাঁহার আগ্রহ: তবে চলো আমাদের সঙ্গে; ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রহ্মআদর্শ গ্রহণ করিতেছি আমরা।

গিরি ঠাকুরাণী চমকিত হইলেন। ভয়ে ভীতিতে তিনি যেন আর আপনার মধ্যে নাই।—কি বলো তুমি, গিরীশ, কি বলো? আমি কি পরকালও খোয়াইব? ধর্ম, দেবতা, সমাজ, নিয়ম—সব বিসর্জন দিব? আর, তোমরা যাইবে ধর্মত্যাগ করিয়া,—তোমার মা আছেন, বাবা আছেন,—তাঁহারা আমাকে অভিসম্পাত দিবেন না?

এই তাঁহার মাসী মা—গিরীশের নারীজীবনের আদর্শ? না, সাধ্য নাই কেহ দুর্নীতির মধ্যে আপন সততা অক্ষুন্ন রাখিবে। সাধ্য নাই হিন্দু-সমাজে, গৃহে পরিবারে কেহ মানুষের আদর্শ গ্রহণ করে, পালন করে, মানুষ হয়। উহা পঙ্ককুণ্ড!—আর কোনো মোহ রহিল না গিরীশের এই গৃহে। অভিযোগ এইবার আক্রোশ হইয়া উঠিতে লাগিল।

মায়ের অভিসম্পাতের ভয় করিতেছেন এখন মাসীমা। যেন অভিসম্পাত করিলে মা পূর্বে করিতেন না, এখন নূতন করিবেন।

এতদিন মা ছিলেন; কিন্তু মা ত তাহাদের আপনি পালন করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার জন্য ভক্তি থাকিলেও সে ভক্তি তাহাদের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণে বাধা হয় নাই, উপবীত ত্যাগেও বিঘ্ন জন্মায় নাই। কিন্তু সেই মায়ের মৃত্যুতেই গিরীশের মনের ক্ষোভ যেন অন্যরূপে বাড়িয়া

উঠিল। চিন্তাহরণ অপরাধীর মত বারবার বলিতে লাগিল, 'বড় অন্যায় হইয়াছে, বড় অন্যায় হইয়াছে। একবার মাকে আমরা দেখিতেও গেলাম না। মা আমাদের জন্য কোনোদিনই সুখশান্তি পান নাই।' গিরীশও মনে করে—অন্যায় হইয়াছে। সত্যই, বড় দুঃখিনী তাহাদের মা। মাকে তাহারা কখনো আপনার করিতে পারে নাই। জীবনে মা কোনো সুখই পান নাই। আর তখনি গিরীশ ভাবে—তাঁহার সংসার, তাহার স্বামীও যে তিনি সম্পূর্ণ পান নাই। তাঁহার আপন পুত্রদেরও তাঁহার নিকটে পান নাই—মাসী মা মধ্যখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মায়ের ও তাহাদের মধ্যখানে আর একজন নারী আসিয়া উদিত হইয়াছিল।

একে একে গিরীশের মনে পড়ে সেই শৈশবাবধি মায়ের বঞ্চিত মনের জ্বালা। গিরীশের মনের মধ্যে ক্ষোভ যেন গর্জিতে থাকে—গিরি ঠাকুরাণীরই কৃষ্ণ ছায়া কৃষ্ণতর হইয়া উঠে। মাকেও তাহারা আপনার করিয়া পায় নাই—গিরিঠাকুরাণীই সেখানেও বাদ সাধিয়াছেন। সংসারে সমাজে কোনো খানেই তিনি কাহারও জন্য স্বচ্ছন্দ, সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রার পথ মুক্ত রাখেন নাই। আপনার অপমান করিয়াছেন, সত্যের অপমান করিয়াছেন। না, গিরীশ কাহাকেও ক্ষমা করিবে না। কাহাকেও না।

গিরিঠাকুরাণীকেও সেই অসম্মানের হাত হইতে এইবার মুক্তি দিবে তাহারা। যদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে পীতাম্বর গাঙ্গুলীর—গিরিঠাকুরাণীকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। সত্যকে গিরীশ স্পর্ধার সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত করিবে—না হইলে কাহারও মুক্তি নাই।

১৭

পীতাম্বর গাঙুলীর অপরাধ নাই। হৈ রৈ না করিয়া একটি সুলক্ষণ-যুক্তা কুলীন কন্যাকে একদিন বিবাহ করিবেন ; সেইরূপ সন্ধানও করিতে-ছিলেন। তবে অনূঢ়া কুলীন কন্যারা প্রায়ই বয়সে এত বড় যেন এক-একটি ঠানদিদি। আর এমনি মুখরা তাহারা যে সেই সব ধাড়ী দজ্জাল কন্যারা কেহ শাশুড়ী হইয়া বসিলে আর কন্যাবধূর রক্ষা আছে ? তিনি বেশ বুঝেন এই জাতীয় বয়স্কা স্বামীহীনা মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধেও কিছুই জোর করিয়া বলা যায় না। স্ত্রীলোক, পুরুষ না হইলে চলিবে কেন ? তাহা ছাড়া কুলীন দেখিলে হয় না,—তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কুলীনের ভক্ত নন। তিনি চাহেন ভালো ঘরের মেয়ে, তাঁহার দশজনের সংসারে সকলকে মানাইয়া লইতে পারিবে,—অবশ্য দেখিতে শুনিতে একটু ভালো হইবে। সংসার নিজের হাতে লইতে পারিবে, চিন্তাহরণের বধূকে গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিবে পীতাম্বর গাঙুলীর তাহাই আসল কথা—বউমা তাঁহার ঘরের লক্ষ্মী। সে ঘরে থাকিলে চিন্তাহরণই বা যাইবে কোথায় ?

কিন্তু কোনোখানে কথা স্থির হইবার পূর্বেই তিনি বজ্রাহত হইয়া গেলেন।

চুপ করিয়া থাকিলেও কি তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন না ? এমনি তাঁহার শত্রুতা করিবে তাঁহার ছেলেরা।

গিরীশ আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে বলিয়া বেড়াইতেছে—গাঙুলী মহাশয়ের বিবাহ করিতে হইলে বিবাহ করা উচিত গিরিঠাকুরাণীকে।

অনেকেই মুচকিয়া হাসিল। কেহ কেহ তামাসাও করিতে ছাড়িল

না। কিন্তু আত্মীয় পরিজন তাই বলিয়া ত পাগল হয় নাই। তাহারা পীতাম্বর গাঙ্গুলীর পুত্রদের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। মেয়েরা ছিঃ ছিঃ করিতে লাগিল, পুরুষেরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। এমন কুষ্মাণ্ডও হইতে পারে মানুষ! বাপের নামে, মাসীর নামে কী বলে?

তাই বলিয়া কেহ ছাড়ে না। কথা উঠিতেই তাহা লুফিয়া লইল। আসলে কথাটা ত লোকের নিকট একেবারে নূতন নয়। তবে ছেলে হইয়া এমন কবুলটা মা মাসীর নামে কেহ করে? করিতেছে যখন তখন অন্যেরাই বা চুপ করিয়া থাকিবে কেন? ইহা কি তাহাদের অপরাধ?

গিরীশেরও তেমনি দৃঢ়পণ কিন্তু! বেটার লেট দেন নেবার। যাহা সত্য তাহাকে গ্রহণ করিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে; তাই বলিয়া তাহা মিথ্যা হইবে না এবং অগ্রাহ্যও নয়।

কলঙ্কের একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। কিছু দিনের মত আর কোনো কথা কাহারও ভাবিবার অবকাশ হয় নাই। পীতাম্বর গাঙ্গুলী প্রথমে ভাণ করিলেন যেন ইহা কুলোকের সেই পুরাতন কুৎসা। কিন্তু তাহাতে ত গিরীশের মুখ চাপা দেওয়া গেল না। তখন তিনি বলিলেন—ইহা ব্রাহ্মদের শত্রুতা। শহরে তিনি মুখ দেখাইতে যেন না পারেন, ইহারই ষড়যন্ত্র এই সব। পীতাম্বর গাঙ্গুলী যত ক্ষিপ্ত ভাবে ইহা প্রচার করিতে লাগিলেন ততই গিরীশ শহরে বসিয়া তাহাদের বক্তব্য দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতে লাগিল। দশজনেও কথাটা খোঁচাইয়া তুলিবার জন্যই বারবার বলিল: 'তাহা কি হয়, তাহা কি হয়। গিরি ঠাকুরাণী কর্তার শ্যালিকা, বিধবা মানুষ—এত কাল গিয়াছে। অবশ্য বরাবরই লোকে নানা কথা বলিত। কিন্তু লোকে বলে বলিয়া ছেলেরাও বলিবে? অবশ্য গিরীশ, চিন্তা হরণ বাহিরের লোক নয়; জানে বলিয়াই বলে। কিন্তু ঘরের লজ্জা

কি বাহিরে বলিবার মত? তাহা ছাড়া, এককালে যাহা ছিল, তাহা ছিল। কিন্তু সেই সব পুরাতন কথা ঘাঁটিয়া লাভ কি?

অর্থাৎ বেশ মুখরোচক একটা কথা পাইল পীতাম্বর গাঙ্গুলীর পক্ষ প্রতিপক্ষ সকলেই। নূতন কথা নয়, কিন্তু রসাল কথা।

রাজীবের ডাক পড়িল—মাসী মা ডাকাইয়াছেন।

মাসী মা! রাজীব তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিতে যায় নাই। মাসীমায়ের সঙ্গে দেখা করা কি সম্ভব? কিন্তু তিনি নিজে ডাকাইয়াছেন—অন্যকে নয়, তাহাকে।

রাজীব ভাবিত মনে দেখা করিতে গেল। কি কথা হইবে তাহা সে জানে না, কিন্তু বুঝিতে পারে। রাজীবও প্রস্তুতও হইল।

মাসী মা সেই সুদীর্ঘ কেশ কাটিয়া ফেলিয়া উন্মাদিনীর মত দুই চক্ষু লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে মূর্তিতে একই কালে পুঞ্জিত কালিমা, আর তাহারই ফাটলে ফাটলে অগ্নিস্রাব। কেমন ভয় করিতে লাগিল রাজীবের।

মাসী মায়ের কথাতেও অস্পষ্টতা নাই এইবার।

তীব্র কণ্ঠ: তোমরা কি মা-মাসী জ্ঞান একেবারে হারাইয়াছ?

রাজীব নিজেকে সম্বৃত করিতে চাহে, বলিল: সে কি কথা, মাসী মা!

'মাসী মা।' এখনো মুখে ওই ডাক! কিন্তু মা-মাসী জ্ঞান আছে সত্যই তোমাদের?—কঠিন তীব্র ভর্ৎসনা চক্ষুতে, কণ্ঠস্বরে।

রাজীব নীরব রহিল। বুঝিল ইহার সহিত যুক্তি তর্ক চলিবে না। বলিল: অন্যায় করি, যাহা করি, মা-মাসীর কাছে ত আমরা আপনারই থাকিব।

গিরি ঠাকুরাণীর কঠিন, বজ্র-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি খানিকক্ষণ অগ্নিবর্ষণ করিল। তারপর সেই মুখ ছাইয়া নামিতে চাহিল বর্ষাধার।

রাজীব, এমন সর্বনাশ কেন করিলে তোমরা?—কণ্ঠ অশ্রুতে ভরিয়া গিয়াছে।

রাজীব 'সুনীতি' ও 'সত্যানুরাগ'-জনিত যে সাহস বক্ষে লইয়া আসিয়াছিল অশ্রু দেখিয়াও তাহা হারাইবে না কিন্তু গিরীশের মত দীপ্তি নাই তাহার কথায়। কণ্ঠ তাহার স্নেহার্থী বালকের মতই। মাসী মা যে তাহাকে মাতার মতই বাঁচাইয়াছেন।

সে বলিল: আপনাকে ত মায়ের অপেক্ষা কম জানি নাই। মাকে ছাড়িয়া আসিয়াও আপনাকে মায়ের মত পাইয়া ছিলাম, মাসীমা।—ভুলিব কেন সেই কথা।

তবে? তবে? তবে? কেন আমার এমন সর্বনাশ করিলে তবে? —কান্নার ঢেউ বুকের মধ্যে গিরিঠাকুরাণীর। সেই আত্ম-প্রত্যয়শীলা মর্যাদাময়ী রমণী আর নন তিনি। বিচলিত, বিমথিত, দিশাহারা যেন।

রাজীব আরও স্নেহার্দ্র, আরও স্থির কণ্ঠে বলিল: চিন্তাহরণ দাদা ও গিরীশের কথাই বলিতেছি—তাহারা আপনাকে অপমান করিতে চাহে নাই। তাহারা যে আপনার কাছেই মানুষ, মায়ের অপেক্ষাও আপনিই ছিলেন তাহাদের বেশি। মা বলিতে আপনাকেই তাহারা জানিত।

কঠিন ক্রোধাগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল আবার গিরি ঠাকুরাণীর চোখ।—শত্রু, শত্রু, শত্রু। তাই এমন শত্রুতা করিতেছে। উহাদের নাম করিয়ো না আমার কাছে।

রাজীব একটু থামিয়া বলিল: না, মাসীমা, তাহারা আপনার ছেলে। ছেলেই হইতে চায়, তাহাতেই এই প্রস্তাব পাড়িয়াছে গাঙ্গুলী মশায়ের কাছে।

ছেলেই হইতে চায়!—গিরিঠাকুরাণী মুখ আবৃত করিলেন, কান্নায় সমস্ত দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। —এই বুঝি তাহার পথ!

এইবার রাজীব তাহার বক্তব্য নিবেদন করিল স্থির শান্তস্বরে; এই ত পথ, মাসীমা। মানুষের কাছে, নিজের কাছে, কারো কাছেই ত অপমানের অসম্মানের কিছু নাই ইহাতে। বরং অসম্মানের কিছু থাকিলে তাহা এইবার শেষ হইবে।

রাজীব কথায় তেমন পটু নহে। গিরীশ বা চিন্তাহরণ হইলে যাহা বলিত তাহা সে বলিতে পারিল না। অবশ্য রাজীব যাহা বুঝাইতে চাহিবে, তাহা গিরিঠাকুরাণী জানিতেন। কিন্তু সেই পথে তাঁহার নিষ্কৃতি নাই, ইহা কি রাজীব বুঝিতে পারে না? একদিন যাহা সত্য ছিল, আজ তাহা দুঃস্বপ্ন! আজ তাহাকে স্বীকার করাই মিথ্যা! তাহা ছাড়া, গিরিঠাকুরাণী আপনার কাছে পরাজয় মানিলেও পৃথিবীর নিকট সেই পরাজয় স্বীকার করিবেন না। সেই মর্যাদা আত্মাভিমান তেজ,—পৃথিবীতে সসম্মানে চলিবার স্পর্ধা—তিনি নিজের কাছে খোয়াইলেও বাহিরে সকলের নিকট খোয়াইবেন না। কারণ, তাঁহার রক্তক্ষয়ী আত্মসংগ্রামের কথা ত তাহারা জানে না। লোকে শুধু পরাজয়ের গ্লানিই দেখিবে। পরিহাস করিবে, নানা ইতর ইঙ্গিতে তাহাকে বিদ্ধ করিবার সুযোগ পাইবে। গিরি ঠাকুরাণী কিছুতেই তাহা সহিবেন না।—ধর্ম! তুমি জানো তোমার মাহাত্ম্য। কেন গিরিঠাকুরাণীকে তুমি তোমার নিরাপদ আশ্রয়ে পিতৃগৃহে ঘিরিয়া রাখিলে না? কেন সে আসিল ভগ্নীর সংসারে, স্নেহার্থিনী ভগ্নীর সহায়তায়?

নিয়তির একি নির্মম বিদ্রূপ! তাহার ভগ্নীর সেই সন্তানদের মায়ায় গিরিঠাকুরাণীকে বদ্ধ হইতে দিলে কেন? তারপর দিলে কেন সেই বাল-

বিধবা তরুণীকে বিমুগ্ধ এই যুবক ভগ্নীপতির প্রণয়-পাশে একটু একটু করিয়া আবদ্ধ করিয়া? তখন আর গিরি ঠাকুরাণী তাহা ছাড়িতে পারেন নাই, ছাড়াইতে চাহেন নাই। ভগ্নীর মূক হৃদয় জ্বালাকে স্বীকার করিয়াও গিরি ঠাকুরাণী তখন স্বীকার করিয়াছেন সেই মুগ্ধচিত্ত পুরুষের প্রণয়-নিবেদন।

আজ গিরি ঠাকুরাণীর কোনো মোহ নাই তাঁহার সম্বন্ধে। সে দিনই কি ছিল? সে মানুষকে তিনি চিনিয়া ছিলেন প্রথম অবধিই; চতুর চালাক, অগভীর চিত্ত। শূন্য নারী হৃদয় তবু সেই অন্যায় ভয়ঙ্কর কুটিল স্রোত হইতেই অঞ্জলি ভরিয়া লইয়াছে ভালোবাসা। আর সেই নারী-হৃদয় ইহাও দেখিয়াছে—গিরিঠাকুরাণী আজও তাহা স্বীকার করিবেন নিজের কাছে,—এই অগভীর-হৃদয় পুরুষ-চিত্ত যত অগভীর হউক - পঙ্কিল নয়, ক্লেদে গ্লানিতে পীতাম্বর গাঙ্গুলী তাঁহার নারী মনকে ভরিয়া দেন নাই। তাঁহার সমাজে তাঁহার মত পুরুষেরা গোপনে প্রকাশ্যে একাধিক ইতর-ভদ্র নারীকে লইয়া আপনাদের বাসনা চরিতার্থ করে;—পীতাম্বর গাঙ্গুলী সে ক্লেদ-মুক্ত। গিরি ঠাকুরাণী আপন জীবনের মধ্যে তাঁহার সেই ভালোবাসা সত্যই স্বীকার করিয়াছেন—কুণ্ঠাহীন মনে নয়, সমস্ত তাঁহার চিরাচরিত সংস্কার সত্ত্বেও। অনেক দিন পূর্বেই তিনি আত্মশাসন করিতে পারিয়াছেন—চিন্তাহরণ ও গিরীশকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহাদের মায়ায় তাহাদেরই সম্মানে, তাহাদের পিতার সম্মানে, আর আপনার সম্মানে। তিনি তবু পীতাম্বর গাঙ্গুলীকে নিজের অন্তরে স্থান তেমনি দিয়া আসিয়াছেন। অথচ জানিতেন তাহা অন্যায়; বুঝিতেন তাহা অধর্ম্ম, তাঁহার কল্যাণ-বোধের অননুমোদিত, তাঁহার আত্মমর্যাদাজ্ঞানও উহাতে স্বস্তি পায় নাই। না, ইহা যত সত্য হউক, ইহাতে ধর্ম নাই, কল্যাণ নাই, সম্মান নাই। তাই তিনি পৃথিবীর নিকট

আপনার এই পরাজয়কে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মর্যাদাবোধ, তাঁহার দায়িত্ববোধ—সমাজে সংসারে তাঁহার স্নেহআদরের ভগ্নী-সন্তানদের মর্যাদা,—এ সবই ছিল তাঁহার মনের আশ্রয়। অথচ, দেখিতেছিলেন, সেই দ্বৈত-সাধনায় তিনিই শুধু ক্ষয় হইবেন না; তিনি ক্রমেই দেখিলেন এই সাধনাও ক্ষয় হইতে লাগিল।

নন্দীগ্রাম ছাড়িয়া তাই তিনি শহরে আসিলেন। কারণ, ভগ্নীর সেই সংসারকে তিনি ধ্বংস করিয়া সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসিয়া থাকিবেন না। বিদেশের এই গৃহে সেই লোকচক্ষুর সর্পিল স্পর্শ তাহাকে তখন আর তত স্পর্শ করিতে পারিল না। পীতাম্বর গাঙ্গুলীও তাঁহার শাসনে সংস্পর্শে অনেকখানি সংযত উন্নত হইলেন, ইহাও প্রত্যক্ষ। কিন্তু গিরিঠাকুরাণী বুঝিলেন—গৃহের প্রতিটি ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্যবস্থা ও ঘটনা হইতে সেই বার্তা বিদেশের আত্মীয় সমাজেও ছায়াপাত করে—দেবপ্রসাদ চৌধুরীকেও বিমনা করিয়া দেয়। পীতাম্বর গাঙ্গুলীর সহিত তাঁহার সম্পর্কে যে গোপনতা অনিবার্য, তাহাতেই এই লজ্জা, গ্লানিবোধও অনিবার্য। তাই যত দূরে সরাইয়া রাখুন তিনি আপনার যৌবন শেষের মোহ বাসনাকে, মাসীমায়ের স্নেহাঞ্চল ঘেরা বালকদের মনেও আকাশ হইতে, বাতাস হইতে সংশয়ের ছায়া প্রবেশ করিতেছে।—উপায় নাই, উপায় নাই। গিরিঠাকুরাণীর উপায় রহিল না তাঁহার গিরীশকে ও চিন্তাহরণকে তিনি এই বিষবাষ্প হইতে রক্ষা করেন।

তবু তিনি ভাবেন, তাঁহার স্নেহ, তাঁহার মমতা, তাঁহার আত্মমর্যাদার বলে কি তিনি ইহজীবনের এই কয়টি দিন লোক চক্ষে অপরাজেয় মহিমায় নিঃশেষ করিতে পারিবেন না?—ধর্ম, তুমি পরজন্মে তোমার শোধবোধ লইও! এই জন্মের এই কয়টি দিন গিরি ঠাকুরাণীকে সসম্মানে কাটাইতে দাও!

চিন্তাহরণ ও গিরীশের গৃহত্যাগে তিনি প্রথম দেখিতে পাইয়াছিলেন ধর্মের সেই দণ্ড। যে গৃহে তিনি সর্বময়ী, সেই গৃহে তাঁহার প্রিয়তম সন্তানরাই এখন স্বস্তি পায় না। গিরিঠাকুরাণীর মনে সেইদিন হইতে নিজের মোহ, মমতা, স্নেহবাসনা ও মর্যাদাবোধ ক্রমেই অনুশোচনায় রূপান্তরিত হইতে লাগিল। সেই লক্ষণ রাজীবেরাও পূর্বেই দেখিয়াছে—গিরীশ তাহাতে আরও ক্ষুব্ধ হইয়াছে—মাসী মা সাহস-শূন্য, আত্ম-ছলনায় বশীভূত! সাহস করিয়া তিনি আর অসার শাস্ত্র ও সমাজের নিয়মকেও অমান্য করিতে এখন পারেন না। পরে পীতাম্বর গাঙ্গুলীকে তিনিই প্রায় সেই বাসগৃহ ত্যাগে বাধ্য করিয়াছেন। শহরেরএকা বাড়ীতে শুধু পুরাতন পাচিকাকে লইয়া তিনি জপে তপে ব্রতে দিন কাটান। গিরিঠাকুরাণী ক্রমেই একা, আরও বেশি একা হইয়া যাইতে লাগিলেন। সাহস নাই গিরীশকে ডাকান, চিন্তাহরণকে দেখেন,—উহাদের দৃষ্টি বুঝি নির্বাক অভিযোগে তাহাকে বিদ্ধ করিবে। তিনিও আর বলিতে পারিবেন না—আমি মর্যাদাময়ী গিরিঠাকুরাণী—কর্ত্রী হইবার জন্যই যে জন্মিয়াছে।

ছোট বোন নন্দীগ্রামে মরিল—কিন্তু তাঁহার কি মরণ নাই? মরিলে বুঝি তিনি বাঁচিয়া যান—হয়ত তখন গিরীশও কাঁদিবে, চিন্তাহরণও কাঁদিবে।—তাঁহার মরিবার কল্পনায়ও গিরীশ ও চিন্তাহরণ আসিয়া যায়। এই মায়ার স্বপ্ন তাঁহাকে মৃত্যু-কল্পনাতেও নিষ্কৃতি দেয় না।

এমনি সময়ে তাঁহার মস্তকের উপরে এমন করিয়া পদাঘাত করিল গিরীশ ও চিন্তাহরণ।.. হে ধর্ম, একেবারে কেন তুমি চূর্ণ করিয়া ফেলিলে না গিরিঠাকুরাণীর মাথা তোমার ন্যায়দণ্ডের নিষ্করুণ আঘাতে? এমন করিয়া এই প্রিয়জনের পদাঘাতে থেঁৎলাইয়া মারা কেন তাঁহাকে? এইটুকু দয়াও কি করিবে না তুমি? করিবে না তাহা গিরীশ চিন্তাহরণ?

গিরি ঠাকুরাণী রাজীবকে ডাকাইয়াছেন। গিরীশ ও চিন্তাহরণ কি

এই ক্রুর পরিহাস বন্ধ করিবে না? তিনি শুনিলেন—তাহাদের উন্মাদ দণ্ডাজ্ঞা। রাজীব বুঝাইয়া বলিল।

'অসম্মান এই ভাবেই শেষ হইতে পারে। আর মাসী মা আগেও মা ছিলেন, এখন সর্ব রকমেই হইবেন মা—।'

না হইলেও, রাজীব কর্তব্য পালন করিয়াছে।

দিন কয় গেল। শহরে গ্রামে কথাটা পল্লবিত হইয়া কদর্য হইয়া উঠিতেছে। হঠাৎ বেচারামের দেউড়ির বাসাবাটির মুহুরি কাকা সেই রাত্রিতে ছুটিয়া আসিলেন: গিরীশ, চিন্তাহরণ, রাজীব, শীঘ্র চলো। গিরিঠাকুরাণী কেমন করিতেছেন।

ব্যাপার শুনিয়া রাজীব ব্রাহ্ম সমাজের ডাক্তার বাবুকে আনিতে ছুটিল। চিন্তাহরণ ও গিরীশ তাড়াতাড়ি ছুটিল মাসীমায়ের নিকট।

গিরিঠাকুরাণী অদৃষ্টে আরও দণ্ড আছে, তাহাই বুঝা গেল। শুধু ধুতুরার বীজে মানুষের প্রাণ সহজে বিনষ্ট হয় না। তদুপরি আবার নূতন পাশ-করা ডাক্তারও আসিয়া গেল। গিরিঠাকুরাণী যম যাতনা ভুগিলেন, পাইলেন না মৃত্যুর আশ্রয়। শুধু ভুগিতে লাগিলেন।

চিন্তাহরণ বলিল: মা, আমাদের ক্ষমা করো। তোমার যাহা মত তাহাই হইবে—চলো আমাদের কাছে।

আমার মত!—গিরি ঠাকুরাণী বলিলেন ক্ষীণকণ্ঠে—আমার মতের খোঁজ কি তোমরা লইয়াছিলে আগে? তোমাদের মতটাই আমার উপর চাপাইতে চাহিয়াছিলে।

গিরীশও বিচলিত হইয়াছিল, বলিল: তাহা বুঝি নাই।

স্পষ্ট হইল গিরিঠাকুরাণীর কণ্ঠ: জীবনে ভুল করিয়াছি।—হাঁ, ভুল করিয়াছি। —জোর দিয়াই কথাটা আবার তিনি বলিলেন: বিধবা

যখন অদৃষ্টের বিধানে হইয়াছি, তখন সংসারে বিধবার মত না থাকিতে পারিলে পাপই হয়। দণ্ডও তাহার পাইতে হইবে। ইহজন্মেও পাইলাম, পরজন্মেও পাইব। কিন্তু তাই বলিয়া সেই ভুলকেই মানিয়া লইয়া আরও ভুল করিব? কুল নাই, তাই অকূল ভাঙ্গিব? এমন দুর্মতি যেন না হয় কোনো মানুষের—অন্তত আমার।

প্রতিবাদে গিরীশের কি বলিবার ইচ্ছা হইতেছিল—চিন্তাহরণ চোখের ইঙ্গিতে বারণ করিল। চিন্তাহরণ আবার বলিল:

বেশ: তোমার যাহা মত তাহাই হইবে, চলো আমাদের কাছে।

না। তোমার বউকেও তোমরা সেখানে আনিলে না, এতই তোমাদের জিদ।

গিরীশ বলিল: কিন্তু এই বাড়িতে একা একা তুমি থাকিবে এইরূপে?

না, এখানে থাকিব না। পরের অন্ন আর গ্রহণ করিব না।

উভয়ে চমকিত হয়!—তাহা হইলে কোথায় যাইবে?

কাশী। এখনো আমি রাঁধিতে পারি—ভাবনা নাই।

চিন্তাহরণ এবার কাঁদিয়া ফেলিল: মা, একথা বলিলে কেন? আমরা কি তোমার ছেলে নই?

গিরিঠাকুরাণী মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন: সে তোমরা জানো।

গিরীশ বলিল: জানি,—তুমি আমাদের মাসীমা শুধু নও, মা-ও। কিন্তু তুমি ত সেই সম্মান ও সত্য স্বীকার করিতে চাহ না।

গিরি ঠাকুরাণী মুখ ফিরাইয়া লইলেন। এখনো গিরীশের সেই কথা!

গিরিঠাকুরাণী কাশী চলিয়া গেলেন। পীতাম্বর গাঙুলী অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। টাকা ফেরৎ আসিল, মালিক তাহা

গ্রহণ করে নাই। চিন্তাহরণ তাহার বেতন হইতে টাকা পাঠাইতে ভুলিল না। কিন্তু মালিকের খোঁজ পাওয়া যায় না। তিনি হরিদ্বারে না কোথায় সন্ন্যাসিনী হইয়া গিয়াছেন।

১৮

হঠাৎ চিত্রিসার হইতে একদিন সংবাদ আসিল—দেবপ্রসাদ চৌধুরী আর নাই। হঠাৎ হইলেও এই আশঙ্কা রাজীব অনেক পূর্বেই করিয়াছিল। বাড়িতেও তাহা অপরেরা ক্রমশঃ বুঝিতে বাধ্য হয়। সংবাদ পাইয়া রাজীব দুঃখ ও দ্বিধাভরেই চিত্রিসারে ছুটিয়া গেল। না গেলে সেও বোধ হয় বুঝিত না—চৌধুরী বাড়িতে দেবপ্রসাদ চৌধুরীর মৃত্যুর অর্থ কি। রাজীব শুধু বুঝিত—ছোটকর্তাই ছিলেন তাঁহার শিক্ষা দীক্ষার মূল, পিতৃমাতৃহীন রাজীবের পিতৃস্থানীয় আশ্রয়, ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী রাজীবের পৈতৃক গৃহে একমাত্র ভরসা। রাজীবের তাই দ্বিধা ছিল—দেবপ্রসাদের অবর্তমানে সেই গৃহে হয়ত রাঘব তাহাকে অবস্থানও করিতে দিবে না। —গ্রামের দশ জনার কাছে রাঘবের দেখাইতে হইবে ত, সে রাঘব চৌধুরী কত বড় ক্ষমতাশালী মানুষ, আর কি রকম দুর্দম্য সমাজপতি। কিন্তু এই দুঃসময়ে মাহেশ্বরীর সহিত দেখা না করিলে রাজীব মনে হইবে তাহা বড় অকৃতজ্ঞতা।

মেজকর্তা হরপ্রসাদ চৌধুরীও শোক-সংবাদে বাড়ি আসিয়াছিলেন। মেজকর্তা কথা বেশি ব্যয় করেন না। কিন্তু তিনি কাজের কথা বলিতে জানেন। রাজীবকে তিনি বলিলেন: এই বাড়ি এই ভদ্রাসন,

এই গোষ্ঠী, এই আত্মীয় পরিজন,—ইহাদের এখন কি হইবে? রাজীব কি কিছু ভাবিয়াছে সেই সম্পর্কে?

না, রাজীব সত্যই তাহা বেশি ভাবে নাই। সে ত এই পরিবারের ত্যজ্য বলিয়া এই গৃহ একদিন ত্যাগ করাই স্থির করিয়াছিল। দেবপ্রসাদ ছিল বলিয়া চৌধুরী বাড়ি তাহাকে দূর করিতে পারে নাই। কিন্তু অন্যেরা তাহাকে চাহিবে না, ইহাই ছিল তাহার ধারণা। এতদিন সে ভাবিয়াছে —এই বাড়িতে তাহার স্থান হইবে না। তাই সে নিজের ভবিষ্যৎই ভাবিয়াছে। তাহারা তিনবন্ধু মিলিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করিবে। দুইজনে শিক্ষকতা করিতেছে। কিন্তু রাজীবের আকাঙ্ক্ষা সে কলেজে পড়ে, সে পাশ করে, সে পরে কিছু একটা হয়;—স্বাধীন কোনো বৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বাধীন হয়, স্বচ্ছল হয়। অবশ্য, কি করিয়া তৎপূর্বে পড়াশুনার ব্যয় সংকুলান হইবে তাহা সে জানে না। চিন্তাহরণের সহায়তায় এখন গিরীশ পড়িতেছে; গিরীশের বি-এ পরীক্ষা এই বৎসর। রাজীবও তৎপর পড়িতে পারিবে আগামী বৎসর—তিন জনেরই আয় একত্র করিয়া। পাঠশেষে চিন্তাহরণ একেবারে নিজের আকজ্ঞানুযায়ী ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে সম্পূর্ণ আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিবে।

মেজকর্তা বলিলেন: তুমি বাড়ির কথা ভাবিতেছ না। আমার একা রোজগারে আর কত চলিবে বলো?—গোষ্ঠী ত কম নয়।

সত্যই না ভাবিবার আর পথ নাই। চিন্তাহরণের সঙ্গে রাজীব একমত—গিরীশ যাহাই বলুক, পিতামাতা, স্ত্রী, সমাজ ত্যাগ করা ব্রাহ্মদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হইবে কেন?—সত্যই, এই সব সাধারণ দায়িত্ব পালন না করিয়া কেহ বৃহৎ আদর্শের সেবা করিতে পারে না।

আন্তরিক ভাবেই রাজীব তাই জানাইল: আমি যতটুকু পারি

তাহা করিব। হয়ত আরও লেখাপড়া করিতে পারিলে আরও বেশি উপার্জন করিতে পারিতাম, আরও বেশি পরিবারের সাহায্য করিতে পারিতাম। সেই সুযোগ যখন আপাততঃ নাই, তখন সেই সব আশা ছাড়াই ভালো।

মেজকর্তা কথাটা আরও পাকা করিলেন। না হইলে বিদেশে যান কি করিয়া? কাহার ভরসায় রাখিয়া যাইবেন মহেশ্বরীর ছেলেদের ?

রাজীব দেবপ্রসাদের পুত্র বিভূতিকে লেখাপড়া শিখাইবার ভার গ্রহণ করিতে চাহিল। একদিন দেবপ্রসাদ রাজীবের এই শিক্ষাভার লইয়াছিলেন—তাহারই চেষ্টায় রাজীব ইংরেজী পড়িতে শহরে আসে,—মানুষ হইবার সুযোগ পায়। আর সেদিন দেবপ্রসাদ কি জানি কেন মহেশ্বরীকে এই কথাই বলিয়াছিলেন—'এইবার রাজীবের দিন। তাহার পরেই আসিবে বিভূতির পালা, রাজীবই সেদিন বিভূতিকে লইয়া যাইবে স্কুলে ভরতি করিতে।'

রাজীব মহেশ্বরীকে বলে: মনে আছে ত আপনার, ছোট মা ?

শোকার্তা মহেশ্বরী মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন। তাহার মনে পড়েনা কিছুই। বরং মনে পড়ে—রাজীবদের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের সম্ভাবনা শুনিয়া সে দেবপ্রসাদকে বলিয়াছিল—'কাজ নাই বিভূতিকে ইংরেজী পড়াইয়া।' সেই রাজীব তাঁহার বিভূতির শিক্ষাভার এখন গ্রহণ করিতে চাহে। সে অবশ্য বুদ্ধিমান্, সকল রকমেই চৌধুরী বংশের সে ভরসা। কিন্তু বিভূতিকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাহার হাতে অর্পণ করিতে মহেশ্বরী ভয় পান। ইহা যেন একটা কেমন ভয়ঙ্কর চক্র। হয়ত রাজীবের মত, চিন্তাহরণের মত, গিরীশের মত—আরও অন্যান্য শিক্ষিত ছেলেদের মত—সেই শহরে গিয়া বিভূতিও তাহার

ধর্ম, তাহার সমাজ,—তাহার মা-বাপ-ভ্রাতা-ভগ্নী-সকলকার কথা বিস্মৃত হইবে,—এমনি করিয়া পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিবে।

মহেশ্বরী চুপ করিয়া থাকেন। সম্মতি পাওয়া যায় না। রাজীব বুঝে, বুঝিয়া ক্ষুণ্ণ হয়। এই তাঁহার সেই 'ছোট মা'—দেবপ্রসাদের বিধবা, যাহার মায়া মমতা স্নেহ সে লাভ করিয়াছে। সেও রাজীবকে বিশ্বাস করিতে পারে না—পুত্রের শিক্ষাভার তাহার হস্তে দিতে চাহে না। রাজীব ব্রাহ্ম, 'খ্রীষ্টান'—বিশ্বাসের অযোগ্য।

মহেশ্বরী তাহার মনোভাব বুঝিয়া বলিল: ওই শহরে এত ছোটছেলেকে আর পাঠাইতে চাহি না, রাজীব। বড় ভয় করে!

রাজীব হাসিল। দুঃখের সঙ্গেই হাসিল: ছোট খুড়া কিন্তু শহরের ইস্কুলেই বিভূতিকেও পড়াইতেন।

মহেশ্বরী বলিল: তিনি থাকিলে আমারও ভয় ভাবনা থাকিত না, রাজীব। আজ যে তিনি নাই—আমার ভরসা কোথায়? কে উহাদের মানুষ করিবে—কবে উহারা মানুষ হইবে, বিধাতা জানেন।

আবার রাজীব বিচলিত হয়। সত্যই, এই পরিবারে এখন মহেশ্বরীর ভরসা নাই। বিভূতি এখনো বৎসর দশেকের বালক, জ্ঞান এখনো দুই বৎসরের শিশু মাত্র। কিন্তু দেবপ্রসাদ এই সংসার-ভার নীরবে বহন করিয়া গিয়াছেন; সে কথা কে আজ মনে রাখিবে? কে দেখিবে এই শিশুদের? এই গৃহে কোনোরূপে মহেশ্বরীর জীবনযাত্রা নির্বাহ হইবে—এই পর্যন্ত! তাহাও স্বচ্ছলভাবে আর হইবে না—কে সেই ভার গ্রহণ করিবে? বিভূতিকে মানুষ করিবে?—রাজীব চাহিয়াও সেইভার পাইবে না।

মেজ খুড়া হরপ্রসাদ বলিলেন: বিভূতির ভার আমি লইব। আমাদের শহরে সে স্কুলে পড়িবে।

মহেশ্বরীর তাহাতে সম্মতি হইল। সেখানে গোলমাল নাই।

হরপ্রসাদ জানায়ঃ রাজীব, তুমি বরং বাড়ির ভার লও। শহর নিকটে, দেখাশুনা তুমিই করিতে পারিবে।

রাজীব স্বীকার করিয়া লয়। দেবপ্রসাদ চৌধুরীর আশঙ্কা অমূলক, রাজীব কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে চাহে না, এই মুহূর্তে ইহা প্রমাণ করিতে পারিয়া রাজীবও কতকটা তৃপ্তি পাইল। ছোট খুড়া জীবিত থাকিলে বুঝিতেন, সে পরিবার পরিজন কাহাকেও ত্যাগ করে নাই।

পৈতৃক ভদ্রাসনের সঙ্গে রাজীবের বন্ধন এই রূপে সহজ হইয়া উঠিয়াছে। প্রায়ই বাড়ি যাইতে হয়—নানা গোলমাল লাগিয়াই আছে।

মাসে মাসে রাজীব টাকা পাঠায়। রাঘব চৌধুরী টাকা পাইয়া কি করে না-করে তাহাও না জানিয়া উপায় থাকে না। অনন্ত দুঃখ করে: 'ওর ত বাঙলা মদ না হইলেও চলে না। আমার বেলা তামাকের পয়সাটাও দেয় না. রাজীব।' রাজীব জানে দলবল লইয়া দাঙ্গা ফ্যাসাদ মামলা মোকদ্দমা একটা না-একটা রাঘব বাধাইতেছে,—না হইলে গ্রামের লোক তাহাকে ভয় কবিবে কেন? শহরেও তাই মাঝে মাঝে রাঘব আসে—অবশ্য রাজীবের সহিত সে দেখা করিবে না, তাহা নিষ্প্রয়োজন।

অন্যদিকে দেবপ্রসাদের ছেলে বিভূতি ত্রিপুরায় নিজে বাঁধিয়া বাড়িয়া নিজের পড়াশুনার সংস্থান করে। হরপ্রসাদ সেখানে সদরে প্রায় থাকেন না, এই ওজুহাতে বিভূতির খরচও তিনি বিশেষ দেন না। অথচ রাজীব চাহিলেও মহেশ্বরী বিভূতিকে রাজীবের নিকট পড়িতে শুনিতে পাঠাইবেন না,—শেষে বিভূতিই বা কি হইবে কে জানে? রাজীব দুঃখ পায়—হয়ত পড়াশুনাও তাহার হইবে না।

রাজীব বাড়ি গেলে দেখে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা আর বিশেষ হয় না।

বাহিরের পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছে; বাড়ির মেয়েদের সামান্ত লেখাপড়ারও আর সম্ভাবনা নাই। রাঘব উহার ঘোরতর বিরোধী।

শৈলীর মা বলেন: তুমি শৈলীকে বই দিয়াছ পড়িতে। কিন্তু পড়িবে কি? কাজকর্ম নাই? বিবাহের কথাই এখন ভাবিতে হয়। না হইলে ইহার পরে বিবাহই হইবে না। উহাকে চিরজীবন কে খাওয়াইবে পরাইবে? রাঘবকে কিছু বলিলে সে রাগ করে। বলে, 'কুলীনের মেয়ে, পণ পাইব কোথায়?' না হয় দোজবর বা সতীনের সংসারই হইবে। এক আধটা সন্ধানও পাইতেছি। তুমি একটু দেখো।

রাজীব বিরক্ত হয়। বরপণ সে-ই বা পাইবে কোথায়? কিন্তু সর্বাপেক্ষা অন্যায় কথা—শৈলীর জন্য দোজবর বা কোনো বহুবিবাহিত পাত্র সন্ধানের প্রস্তাব। চৌধুরী সংসারের দায়িত্ব ভার লইয়াছে বলিয়া রাজীব উহার আবর্জনা রাশির মধ্যে তলাইয়া যাইবে নাকি? গিরীশ এই আশঙ্কাই তাহার ও চিন্তাহরণের সম্বন্ধে পোষণ করে। 'পাঁকের কুণ্ড এই হিন্দু পরিবার, ইহার মধ্যে গিয়াছে কি, তলাইয়া যাইবে।' না, রাজীব কিছুতেই ভুলিবে না— সে ব্রাহ্ম, তাহার আদর্শ আছে, সুনীতি সুরুচি জ্ঞান আছে।

সে জিজ্ঞাসা করে: শৈলীর মত কি?

শৈলীর মত! শৈলীর মা অবাক হন। রাজীব শত হইলেও খ্রীষ্টানই।

কিন্তু রাজীবও মর্মাহত হয়। অনেক চেষ্টায় সে শৈলীর মত সংগ্রহ করিতে পারে। শৈলী বলে: কেন, তা নয় কি চিরকাল এমন পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিব? দাসীগিরি করিলে পরের বাড়িতে করিব কেন?

মাস তিন পরে শহরে রাজীব শৈলীর চিঠি পাইল—দাদাভাই বড় তাড়াতাড়ি। শীঘ্র আসিও।

কিসের বিপদ? হয়ত শৈলীর মা পীড়িতা।

রাজীবকে দেখিয়াই রাঘব গৃহের ভিতরে চলিয়া যায়। ভিতরে গিয়া বলিল: কোথা হইতে আসিল এই আপদ!

শৈলীর মা বলিলেন: ভালোই হইল! দুইজনে পরামর্শ করিয়া এখন দিনক্ষণ স্থির করো।—রাঘব আরও চটিয়া যায়: কাহার সাহত পরামর্শ করিব? কে আমার এমন গুরুঠাকুর?

রাজীব কিন্তু বুঝিতে পারিতেছে না—বিপদ কি? শৈলীই বা কোথায়? একটু পরেই মহেশ্বরী আসিল। বলিল: তুমি শোনো নাই কিছু? তাই বলো। আমি ভাবিতেছিলাম—তুমিও ইহাতে আপত্তি করিলে না কেন? অবশ্য গাঙ্গুলী মহাশয়ের বয়স একেবারে যায় নাই। পঁয়তাল্লিশের মত হইবে। তথাপি উপযুক্ত পুত্র, কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ রহিয়াছে সংসারে। আবার বিবাহ কেন?

রাজীব এইবার বুঝিল পীতাম্বর গাঙুলীর কথা হইতেছে—তাঁহার সহিত আবার বিবাহ প্রস্তাব কাহার? শৈলীর?

মহেশ্বরী জানায়—প্রস্তাব ঠিক। এখন ঘটক ফিরিয়া আসলেই রাঘব যাইবে বায়নাপত্র করিতে। বড়লোক কুটুম্ব হইবে, রাঘব খুব উৎসাহী, তৎপর।

রাজীব আর অপেক্ষা করিল না। তৎক্ষণাৎ বাড়ির অন্দরে প্রবেশ করিল। ডাকিল: ছোট দাদা!

রাঘব শুনিয়াছিল, উত্তর দিল না। রাজীব আবার ডাকিল: ছোট দাদা, বাহিরে আস। কথা আছে।

কিন্তু রাঘব চৌধুরী বাহিরে আসিল না।

কথা আছে। বাহিরে আস।

রাঘবের মেয়ে বলিল: বাবার মাথা ধরিয়াছে, ঘুমাইয়াছেন। এখন কোনো কথা শুনিতে পারিবেন না।

বেশ, তবে বলিস্—আমিও যাইতেছি এখনি। কিন্তু পীতাম্বর পাঙ্লীর সঙ্গে শৈলীর বিবাহ যেন না দেন, বলিয়া গেলাম।

কিন্তু শৈলী কোথায়?—রাজীব তাহাকে খুঁজিয়া পায় না। শৈলীর মা বলিলেন; সে রসুই ঘরে! না, না, তুমি সেই ঘরে যাইওনা।

রাজীব ও নিরুপায়। রন্ধনগৃহ কেন, এখনো রাজীবের নিকট বাহিরের গৃহ ছাড়া সব ঘরই বন্ধ। সে ম্লেচ্ছ, খৃষ্টান। অথচ সে-ই এই বাড়ির অন্নদাতা। তাহার দায়িত্ব আছে, অধিকার নাই।

রাজীব বলিল: একবার শৈলীকে বলুন আমি আসিয়াছি। তাহার কথাও শুনিতে চাই।

মায়ের মুখ ভয়ে শুখাইয়া গিয়াছে। বলিতে পারিলেন না—'না।' বলিলেন: রান্নাটা চুকাইয়া আসুক—না হইলে আবার স্নান করিতে হইবে ত। তুমি বাহিরেই গিয়া বসো।

হাঁ।—রাজীব গুম হইয়া গিয়া বসে বাহিরের ঘরে।

কিন্তু শৈলী কোথায়? সে আসে না কেন?—মহেশ্বরী মিছরির সরবৎ ও জলপান রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন: তুমি কি সহজ কথা বোঝ না? সে কোনো কথা বলিলে তাহাকে আর আস্ত রাখিবে রাঘব? তুমি ত বিদেশে থাক; কালই আবার চলিয়া যাইবে। তারপর শুনিবে- শৈলী কলেরায় মরিয়াছে—রেবতী চাটুজ্জের সেই বউঠানের মত,—রাতারাতি দাহ ও হইয়া যাইবে।

রেবতী চাটুজ্জের বিধবা বধূঠাকুরাণীর সন্তান সম্ভাবনা ছিল।

বিষদানে তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাতারাতি রাঘবের চক্রান্তে পোড়াইয়া ফেলা হয়—রাজীব তাহা পূর্বেই শুনিয়াছিল ।

রাজীব থালা ফেলিয়া উঠিল: বেশ, তবে শৈলী বাঁচিয়া থাকুক। আপনারাও নিশ্চন্ত হউন। কাল নয়, আমি আজই চলিলাম। আমি আর কোনো কথা বলিব না—এই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক আমার এইখানেই শেষ।

স্নানাহার না করিয়া রাজীব তখনই আবার নৌকায় চড়িয়া বসিল।

মহেশ্বরী দাঁড়াইয়া রহিল: তুমিও আমাদের ছাড়িবে, রাজীব ?

রাজীব উগ্র কণ্ঠে বলিল: হাঁ।

কিন্তু রাজীব ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না—একবার শৈলীর কথা কি সে শুনিবে না ? শৈলী তাহাকে ডাকাইয়া আনিল কেন ? এই বিবাহে কি তাহার অমত ? শৈলীকে ত সে অদৃষ্টের হাতে ফেলিয়া দিয়া যাইতেছে।

নৌকা মাঠ দিয়া নদীর দিকে চলিয়াছে। হঠাৎ কে ডাকিল পরিচিত স্বরে।

দাদা ভাই! দাদা ভাই!

রাজীব ছৈএর মধ্য হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল।

শৈলী! ব্যাকুলভাবে কলসী কাঁখে সে ছুটিতেছে—নৌকার সঙ্গে।

নৌকা থামাও।

রাজীব লাফাইয়া তীরে নামিল।—বল্, কেন ডাকিয়াছিলি ?

শৈলী তখন আর কথা বলিতে পারে না।

কি, কিছু বলিবি না ?

হঠাৎ শৈলী বলিল সত্রাসে: দাদা ভাই! তুমি পালাও—

এই কথা! পালাইব?—রাজীবের মন গর্জিয়া উঠিল—কাহার ভয়ে?

না, না। তুমি উহাদের বাধা দিলে তোমাকে উহারা মারপিট করিবে—চিঠির কথা জানিলে আমাকে খুন করিয়া ফেলিবে তুমি যাও—যাও—

শৈলী কি বলিতেছে? কিছুই বুঝি সে গুছাইয়া বলিতে অক্ষম।

তুই আমার সঙ্গে আয়, নৌকায় ওঠ্—সব শুনি—রাজীব শৈলীর হাত ধরিয়া টানে।

তোমার পায়ে পড়ি—ছাড়ো, ছাড়ো! তুমি কেন আসিলে? তোমার পায়ে পড়ি,—যাও, যাও—ছাড়ো। —শৈলী হাত ছাড়াইয়া লইতে চাহে ভয়ে।

রাজীব স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। বলিল: বেশ তবে তুই মর্।—সে হাত ছা ড়িয়া দিল।

না, না। একটা কাজ করো—তুমি নন্দীগ্রমে যাও।

নন্দীগ্রামে!—জ্বলিয়া উঠিল রাঘব।—ওঃ, তুই গাঙুলী বাড়ির কর্ত্রী হইতে চাস্। এই কথা!

তার আগে আমাকে যমে লইবে। —শৈলীর মুখে কঠিন প্রতিজ্ঞা।

তবে? তবে কেন আমাকে ডাকিতেছিলি!

চিন্তাহরণদা' গিরীশদা'কে গিয়া বলো। গাঙুলী মহাশয়কে দিয়া ভাঙচি দাও—এ বাড়িতে ইহারা জানিতে যেন না পারে—কে ভাঙচি দিল।

কৌশল? কতটুকু তাহাতে ফল হইবে? তুই আমার সঙ্গে আয়—নৌকায়।

ও মাগো, ছাড়ো, ছাড়ো! পায়ে পড়ি ছাড়ে—আমি না হইলে নদীতে ডুবিয়া মরিব।

শৈলী দৌড়িয়া দূরে সরিয়া গেল। ভয়ে সে কাঁপিতেছে—রাজীব যেন ভয়ঙ্কর শিকারী জীব।

রাজীব নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বলিল, যাঃ, মর গিয়া। তারপর নৌকায় উঠিয়া বলিল, নৌকা ছাড়ো। চলো শহরে।

শৈলী ঝোপের মধ্য হইতে দেখিল নৌকা নদীর দিকেই চলিল—শহরেই ফিরিবে রাজীব।

শেষ পর্যন্ত নন্দীগ্রামেই গেল রাজীব।

গিরীশ পরীক্ষান্তে কলিকাতা গিয়াছে, বক্তৃতা ও প্রচার করে। সেখান হইতে দাদাকেও আসিবার জন্য লিখিয়াছে। চিন্তাহরণ মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল। রাজীব জানে, তাহার বধূ মনোরমা নন্দীগ্রামে চিন্তাহরণ তাহার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না করিয়া এই অঞ্চল ছাড়িতে চাহে না। কিন্তু মনোরমা চিন্তাহরণকে কখনো কোনো সংবাদ দেয় নাই। তাহার সঙ্গে কোনো চিঠিপত্রের সম্পর্কও চিন্তাহরণ চেষ্টা করিয়াও স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। গিরীশের মতে চিন্তাহরণের সেই সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াই আসা উচিত।—সমাজে অনেক কর্তব্য আছে।

রাজীব বলিল: তুমি নিজে একবার বাড়ি যাও, চিন্তাহরণ দাদা।

চিন্তাহরণ নীরব হইয়া থাকে। রাজীব বলে: তুমি যাইবে না?

চিন্তাহরণ বলিল: যাওয়া সম্ভবত ঠিক হইবে না।

কেন?

বাবার সহিত একটা কলহ হইবে উহা লইয়া। তিনি তাহার গৃহে আমাকে স্থান দিবেন না।

বেশ ত হইবে কলহ। তাহাতে ভয় কি? তোমার স্ত্রীকে তুমি লইয়া আসিবে।

চিন্তাহরণ জানায়: ভয় নয়। কিন্তু মনোরমারও সম্ভবত মত নাই। হয়ত সাক্ষাৎও হইবে না।

রাজীব গম্ভীর হইল। বলিল: তুমি ঠিক জানো?

একরকম। যতবার তাহার মত জানিবার চেষ্টা করিয়াছি; কোনো উত্তর পাই নাই?

রাজীব ভাবিয়া বলিল: তুমি ঠিক জানো, সেই সব সংবাদ পৌঁছিয়াছে?

চিন্তাহরণ বলিল: মনে হয়। তাহার মামা নর্মাল স্কুলে পড়ে। সে-ত সংবাদ লইয়াছে নন্দীগ্রাম হইতে—সে আমাদের অনুগতও।

রাজীব কি ভাবিল। তারপর বলিল: তুমি একবার যাইবে নন্দীগ্রামে? চলো একসঙ্গে যাইব।—গাঙ্গুলী মহাশয় কি বলেন শুনিতে চাই, পারিলে তোমার স্ত্রীর কথাও শুনিয়া আসিবে।

তাহার দেখা পাইব কিনা সন্দেহ।

দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া স্থির হয়—দুইজনে নন্দীগ্রামে যাইবে। গিরীশ যখন নাই, তখন এই বিষয়ে তাহাদের মতভেদ বিশেষ নাই। কিন্তু যাওয়া হইয়া উঠে নাই।

পীতাম্বর গাঙ্গুলীকে রাজীব যেন এখন চিনিতে পারে না। সে মানুষের সেই কথার বাহুল্য, আলাপে আপ্যায়নে বাহুল্য, নিজের উপর অসীম বিশ্বাস—এই সব পূর্বেই চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এতটা যে তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িবেন তাহা রাজীবও ভাবিতে পারে নাই। বরং গিরীশের মত রাজীবও মনে করিয়াছে স্ত্রী বিয়োগের

পরে দুই 'দিন পীতাম্বর গাঙুলী হৈ-রৈ করিয়াছেন, স্ত্রীর জন্যও কাঁদাকাটি করিয়াছেন। তাহার পরে আপনার জমি-জমা নাম মুরুব্বিয়ানা লইয়া আবার গ্রামের সমাজে জাঁকিয়া বসিয়াছেন, দশজন গ্রামের পারিষদ, মোসাহেবের তোষামোদে ভালোই আছেন। বিবাহ তিনি করিতেন। কিন্তু গিরীশ চিন্তাহরণ তাহাতে একটা বিপত্তি ঘটাইল। গিরি ঠাকুরাণীর কথাটা তুলিয়া দেশে-গ্রামে এমন কেলেঙ্কারী বাধাইল যে, পীতাম্বর গাঙুলী উহার পরে শহরে আর যান না। কিন্তু সেই সব গোলমালও এখন কাটিয়া গিয়াছে। গাঙুলী মহাশয়ও গ্রামে আবার নিশ্চয়ই এখন বাবু হইয়া বসিয়াছেন —বৈঠকখানায় প্রজাপাইকের বিচার করেন, পণ্ডিতদের লইয়া শাস্ত্র কথা শোনেন, পাশার ছক পাতিয়া খেলিতে বসেন, সন্ধ্যায় আধটুকু, সংবাদ পত্রাদি পড়েন, তারপর এক আধটুকু নেশা মৌতাত করেন। সবই ঠিক চলিতেছে আবার। হয়ত ছেলেদের ক্ষমা করিবেন না, কিন্তু জামাতা দৌহিত্রদের লইয়া এক রকম ভালোই কাটাইবেন। শহরে একআধ সময়ে তাহারা শুনিয়াছে গাঙুলী মহাশয় বিবাহের জন্য আবার উদ্যোগী হইতেন, কিন্তু জামাতা তাহাতে বাধা দিতেছে ;—শ্বশুরের সম্পত্তিটা এইভাবে বেহাত হইবে নাকি? সম্প্রতি সে জামাতা পীড়িত। এই সুযোগে কে জানিত তাহার পাত্রী ও স্থির হইয়াছে—শৈলী? চিন্তাহরণ গিরীশ কেন, রাজীবেরও যে বয়ঃকনিষ্ঠা। শুনিয়া রাজীব ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় ক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সে বুঝিল—শৈল এই বিবাহে অনিচ্ছুক। অথচ বিপদও তাহার। সত্যই কৌশলে কার্যোদ্ধার করাই উচিত—শৈল ঠিকই বলিয়াছে। না হইলে তাহার জীবন সংশয় হইবে চৌধুরী বাড়িতে রাঘবের তাড়নায়। রাঘব চৌধুরীকে গাঙলী মহাশয় হাত করিয়াছেন।

তিনি চৌধুরীদের শহরের আশ্রয় দাতা। রাজীবেরও পিতৃতুল্য অভিভাবক। কিন্তু শক্ত মানুষকে তিনি ভয় করেন। রাজীবকেও তাঁহার গিরীশের মতই ভয়। তাই তাঁহার সম্মান রাখিয়াই তাঁহাকে শক্ত কথা শুনাইবার জন্য রাজীব প্রস্তুত হইয়া লইল—এই বিবাহ সে কৌশলেই রোধ করিবে। ধমকেই কাজ হইবে। জামাতাকেও না হয় সংবাদ দিবে।

শক্ত কথা বলিবে কি ? পীতাম্বর গাঙ্গুলী রাজীবকে দেখিয়াই ভীত, সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। মুখের দীপ্তি নিভিয়া গিয়াছিল। এখন যেন রক্তের লেশও তাহাতে রহিল না। তথাপি অভ্যাস মত সমাদরের চেষ্টা করিলেন—লোকজন ডাকিয়া রাজীবের হাত পা ধোয়া, বিশ্রামের ও জলখাবারের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

রাজীব বলিল : আপনার সঙ্গে কথা আছে, জ্যেঠামহাশয়।

'জ্যেঠামহাশয়' ডাকটি ইচ্ছা করিয়া যোগ করিল—পাছে সে আত্মবিস্মৃত হয়। তথাপি 'কথা আছে' শুনিয়াই মুখ পাংশু হইয়া গেল গাঙ্গুলী মহাশয়ের।

এখনি ? না হয় বিশ্রামের পরে বলিতে ?

রাজীব এইবার দৃঢ়স্বরে বলিল : না, এখনি।—দৃঢ়তা না দেখিলে পীতাম্বর গাঙ্গুলীর সাহস বাড়িয়া যাইবে।

গাঙ্গুলী মহাশয় গৃহান্তরে গিয়া সন্তর্পণে বসিলেন। সাহস নাই—জিজ্ঞাসা করেন কোনো কথা। রাজীব বলিল : চিত্রিসার হইতে আসিতেছি। —রাজীব একটু থামিল। গাঙ্গুলী মহাশয় মুখ নিচু করিয়া আছেন। রাজীব একটুক্ষণ পরে এইবার দৃঢ় ভৎ'সনার স্বরে বলিল : আপনি এখনো বিবাহের সংকল্প ত্যাগ করেন নাই, শুনিলাম।

পীতাম্বর গাঙ্গুলী তথাপ চোখের দিকে তাকাইতে পারেন না।

রাজীব বলিল: মাসী মায়ের কথা সব জানেন। তারপরেও আপনার এই মতি গেল না। একটু অনুশোচনাও হইল না উহার পরে ?

পীতাম্বর গাঙ্গুলী সত্যই রোদন করিতে লাগিলেন। রাজীব ক্রোধ প্রত্যাশা করিয়াছিল ক্রোধ না হউক, তাঁহার নিকট বিরক্তি ও উগ্রতা দেখিবে ভাবিয়াছে। অন্তত দুর্বল, চতুর লোকের মুখে পিণ্ডলোপের সেই সাফাই শুনিবে। কিন্তু তাহার পরিবর্তে দেখিল এই মধ্যবয়স্ক, বন্ধু-পিতার চোখে জল, নীরব অশ্রুধারা।

কেমন অপ্রস্তুত হইল রাজীব। বলিল: কেন, জেঠামহাশয় ? কেন, আপনার অভাব কিসের ? পুত্র পুত্রবধূ, কন্যা জামাতা, কি নাই আপনার ?

পীতাম্বর গাঙ্গুলী তথাপি কিছুই বলেন না। কাঁদিতেছিলেন আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

পরে রাজীব সব শুনিয়া যাহা বুঝিল তাহা এই—শহরে দশজনের মধ্যে একজন হইবার নেশায় যতদিন গাঙ্গুলী মহাশয় মশগুল ছিলেন, তত দিন তিনি কিছুরই অভাব বোধ করেন নাই। ছিলও সবই। কিন্তু পুত্রদের গৃহত্যাগ, ধর্মত্যাগ, পিতৃবিরোধিতা—এই সবের পরে তাঁহার শহরের সমাজে সসম্মানে বাসের পথ রহিল না। গিরি ঠাকুরাণী কেমন হইয়া গেলেন—পীতাম্বর গাঙ্গুলীর দর্শনেই তাঁহার কেমন ক্রোধ চাপিয়া যাইত—তাঁহার জন্যই নাকি গিরীশ চিন্তাহরণ মাসীমায়ের পর হইয়া গেল। কিন্তু স্ত্রী দুর্গাবতী ছিলেন সতীলক্ষ্মী; ছেলেদের আঘাতেই তিনি পৃথিবী ছাড়িয়া গেলেন। পীতাম্বর গাঙ্গুলীর গ্রামেই বা তখন রহিল কি ? আরও রহিল না—তাহাদের মাসীমাকে জড়াইয়া পুত্রদ্বয় যে সব কাণ্ড করিল তাহাতে। উহার পরে কাহাকেও আর মুখ দেখাইবার জো কোথায় ? গ্রামে তিনি কোনোকালে থাকিতে পারিতেন না;

শিক্ষিত মানুষ কেহ এখানে নাই। এখন শূন্য গৃহে কি লইয়া এইভাবে থাকিবেন ?—বলিতে বলিতে সকরুণভাবে জানান :

'সব যে শূন্য ! শূন্য রাজীব'।

কথাটা নিজে না শুনিলে হাস্য সম্বরণ করা দায় হইত। রাজীব ভাবিত —এইরূপই সমাজ কর্তাদের সাফাই। কিন্তু পীতাম্বর গাঙ্গুলীর চোখের জল, পাংশু মুখ, রাজীবের নিকট ভীত সঙ্কুচিত আবেদন, এই সমস্ত দেখিয়া রাজীবের রাগ হইল না। বরং সে কৃপানুভব করিল :—মানুষটা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। দয়ার প্রার্থী সে তোমাদের কাছে, তাহাকে কি আঘাত করিবে তুমি, রাজীব চৌধুরী ?

বিশেষত রাজীব ইহাও বুঝিল—এই বিবাহ ইহাকে দিয়া ভাঙিয়া দেওয়া অসাধ্য হইবে না। দুর্বল চরিত্র, ভীত মানুষ : শৈলী ঠিক চিনিয়াছে মানুষটাকে না দেখিয়াও।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন বিষয়েও রাজীব সচেতন হইল। 'শূন্য ?' কি শূন্য পীতাম্বর গাঙ্গুলীর ? ঘর-দুয়ার কন্যা-জামাতা, আত্মীয় পরিজন সবই ত আছে। চিন্তাহরণ গিরীশও নাই, এমন নয়। নাই তবে তাঁহার কি ? স্ত্রী ? অনেক দিনই ত তিনি ছিলেন শয্যাগত, চির সঙ্গিনীও তিনি ছিলেন না পীতাম্বর গাঙ্গুলীর। ভোগ-বিলাসের অভাবও মোটের উপর ঘটে নাই তাঁহার জীবনে। তথাপি কি সেই জিনিস যে, আজ এই যৌবনান্তে পঁয়তাল্লিশ বৎসরের উপরেও আর একজনকে গৃহিণী রূপে লাভ না করিলে তাঁহার মনে হয় শূন্য, সব শূন্য ! হৃদয়ের অনির্দেশ্য যেই শূন্যতার সঙ্গে তাহারা যুবকেরা পরিচিত ইহা কি তাহাই ? না, শুধু ভোগ-পরিতৃপ্ত পুরুষের ইহা অভ্যস্ত ভোগ-বাসনা ?

সত্যই রাজীব বলিতে না বলিতেই পীতাম্বর গাঙ্গুলী স্বীকার করিলেন —চিত্রিসারের সেই চৌধুরীদের ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিবার সংকল্প

তাহার বিন্দুমাত্র নাই। উহা ঘটকের প্রস্তাব, রাঘবের পীড়াপীড়ি। রাজীবের সঙ্গে রাঘবের উহাতে বিরোধ ঘটবে তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। রাজীব ত ব্রাহ্ম; সে আর বাড়ি ঘরের দায়িত্ব লইবে কেন?—সে যাহা হউক আত্মীয় কুটুম্বদের মধ্যে মনান্তর ঘটাইতে তিনি চাহেন না। তিনিই রাজীবকে আসিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইবেন না, অন্য কিছু বলিবেন কেন? সুখে থাকুন চিত্রিসারের সকলে। তিনি সদ্বংশজাত একটি বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা চান। শুনিয়া ছিলেন—চৌধুরীদের ভাগিনেয়ী বড় সড়—'আর তোমাদের বাড়িতে দেবপ্রসাদের নিকট শিক্ষাদীক্ষাও পাইয়াছে।' গিরীশ চিন্তাহরণের অপেক্ষাও ছোট নাকি সেই পাত্রী? ছিঃ ছিঃ! পীতাম্বর গাঙুলী তাহা জানিতেন না। ঘটক মহাশয়ও রাঘব ত তাহা একবারও বলে নাই।—রাজীব বিশ্বাস করুক—পীতাম্বর গাঙুলী ক্ষেপিয়া যান নাই। এ প্রস্তাব তিনিই ভাঙিয়া দিবেন। সংসারে একজন মানুষ চাই—এই পর্যন্ত। চিন্তাহরণের বধূকেই বা না হইলে কে দেখে শোনে, বুঝাইয়া-পড়াইয়া এই সংসারের কর্ত্রী করিয়া তোলে? —তিনি পুরুষ মানুষ, পারিবেন কেন সব?

বউমা,—

মনোরমা ছুটিয়া নিকটে আসিল। শ্বাশুড়ী এতদিন পরে কথা বলিলেন। কি বলিতেছেন, মুখের কাছে ঝুঁকিয়া না পড়িলে শোনা যাইবে না।

বউমা, তোমার শ্বশুর মহাশয়কে একবার ডাকিয়া দিবে।

মনোরমা আবার শোনে,—কর্তা মহাশয়কে ?

শ্বাশুড়ী মাথা নাড়িয়া জানাইল হাঁ।

এই কয় দিন শ্বশুর মহাশয় বারবার এই গৃহে আসিয়াছেন। কিন্তু শ্বাশুড়ী তাঁহাকে দেখিয়াই ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছেন। চোখ বুজিয়া রহিয়াছেন। কথাও বলেন নাই। আজ দশ দিন ক্রমাগত এইভাবে গিয়াছে। পুত্রদের উপবীত-ত্যাগে তিনি শয্যাশ্রয় করিয়াছিলেন।

শহর হইতে বাড়ি ফিরিয়াই সেবার পীতাম্বর গাঙ্গুলী চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছিলেন। অভিশাপ দিতেছিলেন—ধর্ম আছেন, সব তিনি দেখিতেছেন। এত অন্যায় তিনি সহিবেন না।'

দুর্বল দেহে দুর্গাবতী গৃহের দ্বার ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। কাহার উদ্দেশে এই শাপ-শাপান্ত পীতাম্বর গাঙলীর ? দুর্গার বুক কাঁপিতেছে। ''সে যেন বুঝিতে পারিতেছে। তবু ভাবিতে পারে না নূতন কি আঘাত আসিতেছে। কিন্তু অভিসম্পাত করিতেছেন কাহাদিগকে কর্তা মহাশয় ? পীতাম্বর গাঙ্গুলী অন্দরের দিকে আসিতেছেন। প্রাঙ্গণ হইতে উত্তর দেন, আর কাহাদের ? শত্রুদের, শত্রুদের।

কি হইয়াছে তাহাই বলো। বাপ হইয়া তুমি অভিসম্পাত করিতেছ,—কী কাণ্ড! —বলিতে ভয়ে উৎকণ্ঠায় শ্বাস যেন রুদ্ধ হয় দুর্গার।

পীতাম্বর গাঙ্গুলী উন্মাদের মত বলিতে লাগিলেন: বাপ! বাপের সঙ্গে এমন ভাবে আচরণ করে ছেলে। আমি উহাদের বাপ, না, তুমি উহাদের মা? তাহাই ত জিজ্ঞাসা করিতেছি। পুত্র হইলে এমন শত্রু হয়?

দুর্গার মুখ কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। তাহার অসহায় ব্যাকুল দৃষ্টিতে ঘৃণার জ্বালা দেখা দিল। শক্ত করিয়া দেয়াল ধরিয়া সে মুখ ফিরাইল। না, গৃহাভ্যন্তরেই সে যাইবে।

ওঃ! তুমিও রাগ করিয়া চলিলে। হায়রে বিধাতা! আমি ছেলেদের নামে মিথ্যা বলিব। ধর্ম! —সত্যই হতাশ, ব্যথিত গাঙ্গুলী মহাশয়ের কণ্ঠস্বর।—তাহাদের জন্য কি না করিতে চাহিয়াছি আমি!

এই কথা মিথ্যা নয়। দুর্গাবতী মুখ ফিরাইলেন না, শুধু দাঁড়াইলেন।

পীতাম্বর গাঙ্গুলী বলিলেন: কী না করিতাম! কিন্তু জানো—তাহারা পৈতা পর্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলিযাছে?

অ্যাঁ!—দুর্গা ঘুরিযা দাঁড়াইল কাঁপিতে কাঁপিতে:—কি বলিলে? কি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে?

পৈতা! আর কি রহিল বাকী, বলো? যাহা বাকী আছে তাহারও দেরী নাই—দুইটা খ্রীষ্টান মেয়েকে দুই ভাই বিবাহ করিবার জন্য নাকি মাতিয়া উঠিয়াছে।

পীতাম্বর গাঙ্গুলী নিজের সমর্থনে একটা কথা অতিরঞ্জিত করিলেন। জন কয় দেশীয় খ্রীষ্টান মেয়ের সহায়তায় শহরে ব্রাহ্মরা স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে—গিরীশেরা তাহাতে উৎসাহী। কিন্তু এই শেষের অংশ মনোরমা শুনিলেও দুর্গার কানে পৌঁছে নাই।

কাঁপিতে কাঁপিতে দুর্গা পড়িয়া গেল। 'কি হইল!' কি হইল!' দুর্গাকে ঘরে আনিয়া শোয়াইয়া দিল সকলে।

কয়দিন দুর্গা আর শয্যাত্যাগ করে নাই। বউমা ছাড়া আর কেহই তাহাকে খাওয়াইতে পারে নাই। শ্বশুর বারেবারে কথা বলিতে আসিয়াছেন। দুর্গা মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, চোখ বুজিয়া রহিয়াছে। শেষে বধূর নিকটই তিনিও স্ত্রীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, শয্যাপার্শ্ব হইতে মনোরমা মাথা নাড়িয়া হাঁ, না, জানাইয়াছে। শ্বশুর মহাশয় ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ শ্বাশুড়ীর কি হইল, কর্তা মহাশয়কে ডাকিতে বলিলেন? —মনোরমা অবাক হয়।

পীতাম্বর গাঙ্গুলী উৎকণ্ঠিত মুখে ছুটিয়া আসিলেন। আবার কি নূতন অপরাধ করিয়াছেন তিনি, কে জানে?

মনোরমা শয্যাপার্শ্ব হইতে গৃহান্তরে গেল। দুর্গা বলিল: বসো।

ইতস্তত করিয়া পীতাম্বর গাঙ্গুলী সন্তর্পণে স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বেই বসিলেন।

দুর্গা মুখ খুলিল: তুমি তাহাদিগকে ত্যজ্যপুত্র করিতে চাও, করিও।

না, না, আমি তাহাদের ত্যজ্যপুত্র করিতে চাহিনা। —পীতাম্বর গাঙ্গুলী তাড়াতাড়ি বলেন।

দুর্গা বাধা দিল: করিও—তাহারা তোমার অবাধ্য। কিন্তু একটা কথা আমায় দাও—

বলো।

বলো রাখিবে?

আমি তোমার কোন কথা রাখি না?—পীতাম্বর গাঙ্গুলী স্বভাবানুযায়ী বলিতে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ দুর্গার চোখের দিকে তাকাইয়া থামিয়া পড়িলেন। আর কথা বলিতে পারেন না। অধোবদন হইলেন। দুর্গাও

কথা কহে না। সব চুপ্‌চাপ্‌! কেহ নাই ভাবিয়া মনোরমা ঢুকিতেছিল, শ্বশুরকে দেখিয়া দাঁড়াইল। —চোখে জল কেন শ্বাশুড়ীর।

অশ্রু মার্জনা করিয়া দুর্গা হাসিয়া বলিলেন: তাহা হইলে শোনো: বউমাকেও ডাকো,—বউমা!

দ্বারের এক কোণে আসিয়া দাঁড়াইল মনোরমা।

অপরাধ যাহারই হউক—বউমা নিরপরাধ। তাহাকে আমিই আমাদের সংসারে আনিয়াছি। অদৃষ্টে তাঁহার কি আছে জানি না। কিন্তু বলো—তুমি তাহাকে বঞ্চিত করিবে না।

আমি বঞ্চিত করিব বউমাকে?

না, না, কথা দাও। এই আমার শেষ প্রার্থনা তোমার কাছে। আমার যাহা কিছু সব তাহার, আর কাহারও নয়!

পীতাম্বর গাঙ্গুলী আবেগ ভরে বলিলেন: আমার জিনিসই কি তাহার নয়? শোনো, বউমা, শোনো, আজ হইতে তুমি আমার পুত্রবধূ শুধু নও, পুত্রও।—আমি তোমার বুড়া ছেলে!

মনোরমা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। খানিক পরে শ্বাশুড়ীর ইঙ্গিতে আবার বাহিরে চলিয়া গেল। সব অদ্ভুত, অনিশ্চিত ঠেকিতেছে।

পীতাম্বর গাঙ্গুলী এইবার যেন স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া পাইতেছেন। স্বাভাবিক মুখরতা ফিরিয়া আসিতেছে। স্ত্রীর নিকটে সরিয়া বসিয়া তিনি বলিলেন: কত সাধ, কত স্বপ্ন ছিল!

দুর্গা বলিল, পূরণ হইবে, ভাবিও না।

উপহাস করিল নাকি দুর্গা? দুর্গাও কি গিরিঠাকুরাণীর মত শেষে তাঁহাকে উপহাস করিতেছে? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পীতাম্বর গাঙ্গুলী বলিলেন: পূরণ! পূরণ হইবে কি দিয়া? ইহকাল পরকাল সব যে শূন্য করিয়া দিল উহারা।

দুর্গা বলিল : সাধ্য কি! আমার ইহকাল—সে তোমারই হাতে। আর পরকাল—না, কাহাকেও যখন ঠকাই নাই, সেই পরকাল আমার কে কাড়িয়া লইবে? ছেলেরা? তুমি? না, আমি তাহা বিশ্বাস করি না। ভগবান, এত মূর্খ নন—কে জল দিল না-দিল, তাহা দিয়া মানুষের পরকাল স্থির করিবেন।

পীতাম্বর গাঙ্গুলী চমকিত হন। দুর্গাও এমন কথা বলে। ইহা যে গিরীশের চিন্তাহরণের কথা। গিরিঠাকুরাণীর মুখেও এই কথা শুনিলে তিনি বিস্মিত হইতেন না। কিন্তু সেই গিরিঠাকুরাণী বরং এখন উল্টা মত গ্রহণ করিয়াছেন—সব জিনিসেই তিনি আপনার পাপের ছায়া দেখেন; আর সব কিছুরই জন্য দায়ী করেন পীতাম্বর গাঙ্গুলীকে।—পীতাম্বর গাঙ্গুলী আবার সেই চিন্তায় ফিরিয়া যান—অথচ তাঁহার অপরাধ কি? বিধাতা জানেন—তিনি গিরিঠাকুরাণীকে প্রলুব্ধ করেন নাই। সম্ভব হইলে তিনি তাহাকে পত্নীর মর্যাদাও দিতেন। বিধবা-বিবাহে ত তাহার আপত্তি ছিল না—কিন্তু সে যে সম্ভব নয়।

হঠাৎ তিনি স্ত্রীকে বলিলেন : জানো, তোমার দিদি আমার মুখদর্শন করেন না। আমারই পাপে নাকি আমার পুত্ররা এইরূপ ধর্মদ্রোহী হইল।

এখনো সেই চিন্তা! দুর্গা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। পরে বলিল : হতভাগিনী! এত তাঁহার গুণ, কিন্তু সেই গুণ তাহার কাল হইল। মেয়ে মানুষের গুণ ত গুণ নয়, আগুন। জ্বলিয়া মরে। কিসে শান্তি পাইবেন দিদি, কে জানে।

এই ত দুর্গার চিরদিনের মত কথা। পীতাম্বর গাঙ্গুলী তাহাতে আশ্বস্ত বোধ করেন। সত্যই হতভাগিনী গিরিঠাকুরাণী।

দুইজনে কেহ কথা বলে না আর। শেষে দুর্গাই বলিল : যাও, তোমার কাজ আছে।

না, না। কাজ কোথায় আর আমার এখানে ?

দুর্গা হাসিয়া বলিল : কাজ অনেক। দেখ গিয়া কাছারি বাড়িতে।

মনোরমাকে আবার ডাকিল দুর্গা। সে পথ্য, আহার্য লইয়া আসিল। দুর্গা হাসিল : বেশ! কিন্তু আজ আমাকে সাজ করাইয়া দাও—আমার অলঙ্কার লইয়া আস। একবার পূজায় বসিব।

কি হইল শাশুড়ীর ? মনোরমা আবাল্য এই শাশুড়ীর স্নেহ পাইয়াছে, কিন্তু কখনো তাহার এমন সাজিবার সখ দেখে নাই।

স্নান করিয়া দুর্গা মনোরমাকে বলিল : এসো।

হাতের দুই গাছি মোটা বলয় লইয়া একে একে তাহা সে মনোরমাকে পরাইল। আপত্তি করিলে কে শোনে! —ইহা আমার শাশুড়ীর আমলের জিনিস, তোমাকে পরাইয়া যাইব, —এই বাড়ির কর্ত্রীর পরিতে হয়।

মনোরমা ভয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ়।

পরে বলিল, চলো এখন পূজার ঘরে আমার সঙ্গে পূজার জিনিস সাজাইয়া দাও।

পূজা আর শেষ হয় না!

মনোরমার হাত ধরিয়া শাশুড়ী বলিলেন : এসো।

কি করিবেন তিনি ?

বিগ্রহের পাদস্পর্শ করিয়া শাশুড়ী বলিলেন : ঠাকুর, তুমি জানো আমার কোনো দোষ নাই। কোনো দোষ নাই আমার এই মেয়ের, আমার পুত্রেরও। তুমি যদি পাথরের ঠাকুর না হও, তাহা হইলে জানো মায়ের, স্ত্রীর প্রাণের কথা। 'ধর্ম, ধর্ম' করিয়া পুরুষ মানুষকে খেলিতে দিও না এমন করিয়া আমাদের জীবন লইয়া।—তিনি মাথা লুটাইয়া দিলেন বিগ্রহের পদ তলে। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন : শোনো, আমার স্বামী পুত্র সংসার কিছুই আমি গড়িতে পারি নাই। কেবলই বাধা

পাইয়াছি, ভয় করিয়াছি। সবই তাই ভাঙিয়া গেল; অধর্মই বাড়িল। বলো—এই সংসার তুমি সাহস করিয়া গঠন করিবে, কিছুতেই বাধা মানিবে না। বলো, স্বামী পুত্র সংসার কাহারও অন্যায় সহিবে না।

মনোরমা ভয় পাইতেছিল, ভালো করিয়া বুঝিতেছিল না; কিন্তু শপথ করিল।

গৃহে ফিরিয়া শ্বাশুড়ী আবার শুইয়া পড়িলেন। বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, আর উঠিতে পারেন না। একে একে মনোরমাকে সকল অলঙ্কার পরাইয়া দিলেন। —পরো, আমি দেখিয়া লই একবার।—সিন্ধুকের চাবি, লক্ষ্মীর ঝুলি, সব তিনি দেখাইয়া দেন। —তুমি দেখিবে। বংশের বড় বউ তুমি। বড় মাথা নিচু করিও না।

পীতাম্বর গাঙুলী স্ত্রীর আহার পর্যবেক্ষণে আসিলেন। গৃহিণী শুনিবেন না: না, না, তুমি বিশ্রাম করো। ঘুমাইয়া লও। ইহার পরেই চাটুজ্জে মহাশয়রা পাশা খেলিতে আসিবেন। —গাঙুলী মহাশয়কে চলিয়া যাইতে হয়। কে জানে, কি বলিবেন আবার গৃহিণী। অদ্ভুত তাহার কথাবার্তা!

শ্বাশুড়ী বলেন: উহাদের অনেক আছে—ধর্ম আছে, দেবতা আছে, সমাজ আছে। কিন্তু আমাদের মেয়েদের সংসার ছাড়া আর কিছু নাই। তাহাই ধর্ম, তাহাই দেবতা। কিন্তু সেই সংসারে ছোট হইতে নাই।

মনোরমা কি যেন এইবার বুঝিতে পারে।

শ্বাশুড়ী আবার বলিলেন: তোমার শ্বশুর, মা, বড় দুর্বল মানুষ, দেখিবার লোক না থাকিলে একদণ্ডও তাহার চলে না। দেখিও যেন আরামটুকু পান—কিন্তু ছোট হইও না তবু।

মাত্র দুই দিন পরেই শ্বাশুড়ী সকাল বেলা উঠিয়া বসিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন। আর উঠিলেন না।

পীতাম্বর গাঙুলী অসহায়ের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিলেন। কিন্তু মনোরমা কাঁদিবার অবসর পায় নাই। গাঙুলী বাড়ির গৃহিণী সধবা মরিয়াছেন, ভাগ্যবতী ; তাই তাঁহাকে দেখিবার জন্য গ্রামের ভদ্রকন্যারা ভিড় করিয়া আসিতেছেন। ওদিকে সৎকারের ব্যবস্থা জাঁক-জমক করিয়া করিতে হইবে ; লোকজন আসিতেছে। কে তাহাদের দেখে ? শ্বশুরকেই বা কে সান্ত্বনা দিয়া স্নান আহার করায় ? মনোরমাই বাড়ির কর্ত্রী।

মনোরমা পীতাম্বর গাঙুলীর ও ভরসা। শাশুড়ীর পরে সে গৃহভার গ্রহণ করিয়াছে। শ্বশুরের আরামের অভাব ঘটে না। গিন্নিঠাকুরাণীকে উপলক্ষ করিয়া যে বিসদৃশ কাণ্ড ঘটিল তাহাতে শ্বশুরের প্রতিই তাহার সহানুভূতি বাড়িয়াছে—লোকটাকে কি করিয়া অপদস্থ করিল তাহার পুত্ররা। মনোরমাকেও তাহারা ছোট করিতে চায় !

২০

গাঙুলী মহাশয়ের নিকট কথাটা রাজীব পাড়িল : সেই ভদ্রমহিলা কি বলেন এই ব্যাপারে ? —আপনি ত আবার সংসার করিবেন।

ভদ্রমহিলা ! ভদ্রমহিলা আবার কে ? —পীতাম্বর গাঙুলী প্রথম বুঝিতেই পারেন নাই। —ওঃ ! বউমার কথা বলিতেছ ? বউ মা কী কথা বলিবে ! বউ মা তেমন মেয়ে নাকি ? সে আমার সংসারের লক্ষ্মী।— পীতাম্বর এইবার বাক্যে মুখর হন। —তোমরা তাঁহার কি বুঝিবে ?

খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া রাজীবও বলিল : কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ কি হইবে, ঠিক করিয়াছেন কিছু ?

গাঙুলী মহাশয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন : কাহার ভবিষ্যৎ কি, তাহা কি আমরা ঠিক করিতে পারি, না জানিতে পারি ?

না, রাজীব, সেই অহঙ্কার আমার আর নাই। এই সংসারে আমরা নিমিত্ত মাত্র।

রাজীব কোমল করিয়াই বলিল: আপনি নিজে যখন আবার সংসার করিবেন ঠিক করিয়াছেন, তখন তাঁহাকেও তাঁহার সংসার করিতে দিন।

দেওয়ার মালিক কি আমি?—তারপর আবার কথা ফোটে মুখে পীতাম্বর গাঙুলীর,—সে হিন্দুর মেয়ে। ঠাকুর মানে, দেবতা মানে, ব্রত করে, পূজা নিয়ম পালন করে। চিন্তাহরণ গ্রহণ করিবে কিরূপে তাহাকে? আর এই ঠাকুরদেবতা ফেলিয়া সে যাইবে কিরূপে খৃষ্টানের ঘর করিতে? সে ত খৃষ্টান হয় নাই।

সহজভাবে রাজীব বলিতে চাহিল: তাহা হইলে তাঁহার পুনরায় বিবাহ করা উচিত।

পীতাম্বর গাঙুলী অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলেন! —কি বলিলে?

রাজীব একটু জোর দিয়াই বলিল: বলিলাম তাঁহাকে আবার বিবাহ করিতে দিন, না হয় তাঁহাকে চিন্তাহরণ দাদার নিকট পাঠাইয়া দিন। এই আমাদের মত।

পীতাম্বর গাঙুলী নীরব। ধীরে ধীরে পরে বলিলেন: তোমাদের মত! তোমাদের মত ত সমাজের সংসারের মত নয়, বিশেষ করিয়া মেয়েদের মত একেবারেই নয়। দেখিলে ত একজন বিষ খাইতে বাধ্য হইলেন, দেশান্তরিত হইলেন —তোমাদের এই মতের দৌরাত্ম্যে।

রাজীব মাথা অবনত করিল অপরাধ-বোধে। এই ধারণা চিন্তাহরণ ও তাহার মনেও এখন দেখা দিয়াছে। পীতাম্বর গাঙুলীও একটু উন্মনা হইলেন। তারপর আবার আরম্ভ করিলেন ধীরে ধীরে: আমার মতও কম উগ্র ছিল না, এখনো তাহা ত্যাগ করি নাই আমি। কিন্তু আমরা পুরুষেরা যাহাই বলি, মেয়েরা আমাদের লক্ষ্মী। দেখিলাম

ত চিন্তাহরণের মাকে—কেমন করিয়া সকল সহিয়া হিন্দুনারীর সংসার পালন করিলেন। সেই সতীলক্ষ্মী না থাকিলে কোথায় যাইত সব আমাদের পাপে তলাইয়া। তাহারা আমাদের পূজা-আর্চা, ঘর-সংসার কিছুই নষ্ট করিতে দিবেন না। তোমরা যতই অকূলে ভাসিয়া যাও; তাঁহারা আমাদের ধর্ম অক্ষয় রাখিবেন। —পুরাতন বক্তৃতার ভাষাই গাঙ্গুলী মহাশয়ের এইবার মুখে আসিয়া গিয়াছে, তিনি তাই বেশ স্বচ্ছন্দচিত্ত।

রাজীব তর্ক করে নাই, উহার প্রয়োজনও দেখে নাই। কিন্তু তবু জানাইয়াছে—এই সবই মহিলারা গঠন করিবেন। বরং শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধীন ভাবে আরও কল্যাণকর রূপে গঠন কবিবেন। কাহারও সাধ্য নাই তাহা বন্ধ রাখিতে পারে।

রাজীব পরে বলিল: চিন্তাহরণদাদার স্ত্রীও কি ইহাই বলেন?

পীতাম্বর গাঙ্গুলী বলেন: তবে কি বলিবে? এই ত এখন সে ঠাকুর ঘরে ভোগ রাঁধিতেছে। ইহার পরে আমাদের আহারের ব্যবস্থা করিবে, খাওয়াইবে পরাইবে, বাতাস করিবে,—চাকর পা টিপিয়া দিবে; —আমি ঘুমাইয়া পড়িলে তবে বউ মা স্নান করিবে, আহার করিবে। তখন বসিবে আমার বারান্দায় রামায়ণ লইয়া—আগে শাশুড়ীকে পড়িয়া শুনাইত, এখন আমাকে পড়িয়া শোনাইবে। আমি শুনি নাকি? শুনিব না? চিরদিন আমাদের এই রূপই গিয়াছে, তাহা উল্টিয়া যাইবে? দেখিবে কি তুমি?

রাজীব চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল: হাঁ। তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে চাই।

পীতাম্বর গাঙ্গুলী মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কাহার সঙ্গে দেখা করিতে চাও? বউমার সঙ্গে? তাহা কি করিয়া হইবে? বাড়ির বউ সে, তোমার সঙ্গে কথা বলিবে কি করিয়া?

রাজীব বলিল: আপনার সম্মুখেই আমি বলিব—

সে আমার সম্মুখেও ত কথা বলে না। আমি যে তাহার শ্বশুর।

রাজীব একটু ভাবিয়া বলিল: চিন্তাহরণ দাদা তাঁহাকে চিঠি দিয়াছিলেন—আমাকেও বলিতে বলিয়াছেন।

পীতাম্বর গাঙ্গুলী গম্ভীর হইলেন:—বেশ। বলো; আমি জানাইব।

রাজীব এবার দৃঢ়স্বরে বলিল: না। আমি নিজেই বলিব যাহা বলিবার। —সে জানে পীতাম্বর গাঙুলী দৃঢ়তাকে ভয় করে।

কিন্তু পীতাম্বর গাঙুলীও ইতিমধ্যে অনেকটা সাহস ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। বলিলেন: কেন, বিশ্বাস হয় না আমাকে।—একটু কলহের সুর।

রাজীব আপনার মত আবার দৃঢ়ভাবে জানাইল: ইহাতে আবার অবিশ্বাসের কি? আপনি না বলিলেও তাঁহার হাতে পত্র আমরা পৌঁছাইতে পারি।—শুনিয়া পীতাম্বর গাঙুলী তাকাইয়া থাকেন। রাজীব দৃঢ়ভাবে বলে: প্রশ্ন তাহা নয়। আমি নিজে শুনিতে চাই—তিনি কি বলেন।

পীতাম্বর গাঙুলী বলিতে চাহিলেন: কি আবার বলিবেন? কিন্তু রাজীবের কঠিন দৃষ্টি আবার তাড়না করিল। তিনি বলিলেন: তাহা হইলে চলো অন্দরে। বউমাকে ডাকাই। সেখানেই এখন তুমি জলগ্রহণ করিবে। ঘরদুয়ার বউমা ধোয়াইয়া দিবেন পরে গঙ্গাজল দিয়া।

দুয়ারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল অবগুণ্ঠিতা মূর্তি।

পীতাম্বর গাঙুলী বলিলেন: বউ মা, চিন্তাহরণের সংবাদ আনিয়াছে রাজীব—রাজীব চৌধুরী। নাম শুনিয়াছ। শোনো।

নিরুত্তর মূর্তি দাঁড়াইয়া রহিল। একটি দাসী মেয়ে বলিল: উনি পূজার ঘরে যাইবেন—স্নান করিয়াছেন। এখন এইঘরে আসিবেন না।

পীতাম্বর রাজীবের মুখের দিকে তাকাইল। সে দৃষ্টির অর্থ—শুনিলে ত? তোমাদের স্পর্শেও গৃহ অপবিত্র হয়।

রাজীব বলিল: বেশ, ওখান হইতেই শুনুন। শুনুন—আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। চিন্তাহরণ দাদাকে গ্রহণ করিবেন, না, করিবেনা, তাহাই তিনি জানিতে চান।

দ্বার প্রান্ত হইতে মূর্তি নীরবে সরিয়া গেল। দাসী মেয়েটিকে রাজীব তথাপি জানাইল, বেশ ; উনি লিখিয়া উত্তর যেন দেন অপরাহ্ণে।

অপরাহ্ণে আর একবার রাজীব বলিল : পত্রের উত্তর কোথায় ?

পীতাম্বর গাঙ্গুলী অন্দরে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। অন্দর হইতে সংবাদ আসিল—, পরের মারফৎ সংবাদ পাঠাইবে কেন ঘরের বউ ?

রাজীব নত মস্তকে গিয়া নৌকায় বসিল।

মাস তিন চার পরে শহরে সংবাদ আসিল—ফুলে মেলের একটি বয়স্থা কন্যাকে শান্তিপুর না নবদ্বীপ হইতে বিবাহ করিয়া পীতাম্বর গাঙ্গুলী নন্দীগ্রামে ফিরিয়াছেন। দেশে দুই একজন সমাজ-পতি ছাড়া কেহ জানিতেও পারে নাই গাঙ্গুলী মহাশয় কোথায় গিয়াছেন। ঘটক ও দুই একজন বয়স্ক বন্ধু ছিলেন তাঁহার সঙ্গী। বিনা জাঁক জমকে সহজ ভাবে গাঙ্গুলী বাড়ির নূতন কর্ত্রী আসিলেন এবং সহজ ভাবেই তিনি গৃহভারও গ্রহণ করিয়াছেন। গৃহকর্মে তিনি অভ্যস্তা। দেহের বাঁধন আছে, লাবণ্য আছে, বয়স ও সম্ভব ত্রিশের উর্দ্ধে। তদুপরি আছে ও-দেশের আচার নিষ্ঠা, মিষ্টি কথা। আত্মীয় পরিজন সুখ্যাতি করিতেছে।—অবশ্য জামাতা কন্যা দৌহিত্রেরা ক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সে বৈষয়িক কারণে। না হইলে সতীনপুত্রের বধূকে পর্যন্ত নূতন শাশুড়ী আপন করিয়া লইতে পারিয়াছেন। শাশুড়ী আসিতেই পুত্রবধূ তাহার হাতে সিন্দুকের চাবি ও স্বর্গগত কর্ত্রীর অলঙ্কারের বাক্স্ তুলিয়া দিয়াছে—পীতাম্বর গাঙ্গুলীর বলিতে হয় নাই, গৃহিণীর দাবী করিতেও হয় নাই। ইহাতে আর আশ্চর্য কি ? এমন ত চিরকালই দেশে ঘটিয়াছে। বিপত্নীকের সংসার করা কুলীন কন্যার পক্ষে নূতন কি ? সৎ-শাশুড়ীই বা কোন্ পদস্থ বংশে না থাকে বধূদের ? চিরদিনই এইরূপ ঘটে। কেবল গাঙ্গুলী মহাশয়ের

দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার পুত্ররাই মাঝখানে নানা রকম হৈ-হল্লা বাধাইয়া একটা সম্মানিত লোককে অপদস্থ করিয়াছে। কিন্তু দুই দিনেই সেই গ্লানি তাঁহার মন হইতে মুছিয়া ফেলিবেন নূতন গৃহিণী—পুত্রবধূ লইয়া স্বামী লইয়া সংসারে সুস্থির হইয়া বসিবেন। ইহাইত এই দেশের মেয়েদের স্বাভাব, চিরদিনের গৃহধর্ম।

আরও কয় মাস পরে। প্রভাতে স্নানান্তে উপসনাদি শেষ করিয়া চিন্তাহরণ খাতা পেন্সিল লইয়া বসিয়াছে। পদ্য রচনায় সে আবার আত্মনিয়োগ করিয়াছে। আর ত তাহার কোনো দায়িত্ব নাই সংসারে; ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও সাহিত্য-রচনাই এইবার তাহার ব্রত। গিরীশ হয়ত মনে করে দাদা সংসার-সুখ চায়। অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করিয়া তাই নতুন সংসার বাঁধিতে পারে। চিন্তাহরণ বুঝাইতে পারিবে না —ইহা তাহার ভুল ধারণা। গিরীশ মানিবে না—বাঙ্‌লা সাহিত্যও একটা কম আদর্শ নয়। বৎসর দুই পূর্বে মাইকেল এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত পরিচয়ে গিরীশও কতকটা বিস্মিত হইয়াছিল; কিন্তু মাইকেল বলিলেন, দেবদেবীতে ক্ষতি কি?—তাহাদের ছাড়িয়া ভারতবর্ষীয় ভাষায় কবিতা লেখা অসম্ভব। গিরীশ তাই বলিয়াছে" লোকটা শেষ পর্য্যন্ত 'হিদেন' ও পৌত্তলিকই রহিয়াছে।" চিন্তাহরণ কিন্তু তখন বিশেষরূপে উদ্‌বুদ্ধ হয়। "ঢাকাবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে" মাইকেল সনেট লিখিলেন একটা বৈঠকে।

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ববঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।

চিন্তাহরণও মনের উচ্ছাসে উত্তর লিখিয়াছে তাহার অনুকরণে:

বঙ্গের অঙ্গনে তুমি জন্ম-মধুকর,
হে মধুসূদন! বহি আনিয়াছ পরিমল
দেশ-দেশান্তর হতে, অপূর্ব সুন্দর,
শত গোলাপের গন্ধ, শুভ্র শতদল ......
কি লভিবে পূর্ববঙ্গে মধুচক্র তরে?
মধুহীন ধুতুরা এ—দিব কার করে?

মধুসূদন ইংরেজিতে বলিয়াছে—'বৎস, উহাই মহাদেবের গ্রাহ্য এবং তোমাদের মধুসূদনও নীলকণ্ঠ—অনেক বিষ তাহার কণ্ঠে।" বেদনায় দুঃখেই বুঝি কবিরা কবি হয়, মাইকেলকে দেখিয়া সে তাহা বুঝিয়াছে। তাহারও মনে বেদনা জমিয়া উঠিয়াছে দিনের পর দিন। চিন্তাহরণ তাহাকে মধুতে পরিণত না করিলে তাহা শুধু বিষ হইয়াই থাকিবে। না, দেবপ্রসাদ চৌধুরী, বনমালী চট্টোপাধ্যায়ের আশা ও আশীর্বাদ সে বিস্মৃত হইবে না। অবশ্য, ভগবানের দয়া চাই। সে আবার সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিবে। বিষকে মধু করিয়া তুলিবার সাধনা ত ইহাই।

কে গৃহের বাহিরে খোঁজ করিল 'গাঙ্গুলী মহাশয় কোথায়?' ভৃত্য হয়ত দেখাইয়া দিয়াছে, চিন্তাহরণ ও অপেক্ষা করিতেছিল,—অবগুণ্ঠনবতী এক নারীমূর্তি, পশ্চাতে একটি বালক। একবার গুণ্ঠন একটু তুলিয়া চিন্তাহরণকে সে নারী দেখিল। তারপর পিছন ফিরিয়া বালককে বলিল: নসু, তুই যা। মামাকে বলিস—আমি এই বাড়িতে রহিলাম। —বলিয়া অবগুণ্ঠন আরও খুলিয়া সে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

চিন্তাহরণ এই অপ্রত্যাশিত নারীমূর্তির আবির্ভাবে চমকিত হইয়াছিল। তাহার অপেক্ষাও বেশি চমকিত হইল এইবার এই কণ্ঠস্বরে। এই কণ্ঠস্বর ত তাহার ভুলিবার উপায় নাই। পাঁচ বৎসর না দেখিয়া

হয়ত এই সপ্তদশী তরুণীকে মনোরমা বলিয়া চিনিবার মত সাহস তাহার হইত না। অপরিচিতা যুবতীর মুখের দিকে চিন্তাহরণ চোখ তুলিয়াও তাকাইত না। কিন্তু এই কণ্ঠস্বর পাঁচ কেন, পঞ্চাশ বৎসরেও পরিবর্তিত হইত না। এ যে মনোরমা!

চিন্তাহরণ বিস্ময়োৎসুক কণ্ঠে বলিল: তুমি!

হাঁ, আসিলাম।—অবনত দেহ ততক্ষণে পদ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছে। শান্ত ঈষৎ লজ্জিত, কিন্তু স্থির তাহার কণ্ঠ। চিন্তাহরণ তখনো বিস্ময়ে বিমূঢ়। বলিল: তুমি!

হাঁ, আমিই।

আসিলে যে?—বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে তাহা শুদ্ধ করিল চিন্তাহরণ: আসিলে কি করিয়া? কখন, কিরূপে আসিলে, এখানে?

বলিতেছি,—শুনিবে সব। তাহার আগে তোমাদের ইস্কুলের বেলা হইতেছে,—রান্না-বান্নার কি হইতেছে, কি করিতে হইবে,—একটু দেখিয়া বুঝিয়া লই।

'রান্না-বান্না, ইস্কুল'—চিন্তাহরণ আপনা হইতেই উচ্চারণ করিল শব্দ কয়েকটি। সে বুঝিয়াও যেন সাহস করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ততক্ষণে মনোরমা রন্ধন-গৃহের দিকে চলিয়াছে। চিন্তাহরণ বলিল: রান্নার এখনো সময় আছে। রাজীব বাজারে গিয়াছে, আসিবে এখনি।

আসুন। আমি ততক্ষণ দেখিতেছি।

মনোরমা এই বাড়ির গৃহিণীর মত বলিতে বলিতে রন্ধন গৃহের দিকে যায়। চিন্তাহরণও পশ্চাতে পশ্চাতে অগ্রসর হইয়া গেল।

মনোরমা আপনার সংসার আপনার হাতে সহজ ভাবে তুলিয়া লইল। মনোরমা শিক্ষিতা নয়, বেশি চতুরাও নয়, একটা সুস্থ সতেজ ব্যক্তিত্ব

তাহার আছে, ইহা বুঝা বেশ গেল। সেই ব্যক্তিত্ব কাহারও কথায় একেবারে বিচলিত হয় নাই। সে একবারও ভাবে না যে, সে কত বড় সাহসের কাজ করিয়াছে। সে জানে গাঙুলী মহাশয়ের সংসারে তাহার প্রয়োজন মিটিয়া গিয়াছে, শ্বশুরের আরাম পরিচর্যার জন্য আর পুত্রবধূর প্রয়োজন নাই। নূতন গৃহিনী সেখানে কোনো ফাঁকও করিতে রাখিবে না। স্বামী, সিন্দুক, অলঙ্কার, সংসার সবই সে বুঝিয়া লইয়াছে। মনোরমাই সেখানে বরং বাড়ন্ত। নিজের সংসার গঠন করিতে হইবে।

না হয় চিন্তাহরণ তাহাকে অমন বিশ্রী কথা লিখিযাছে,—অনেক লাগিয়াছিল তাহার সেই সব পত্র। রাজীবের মূর্খতা সে কখনো ক্ষমা করিতে পারিবে না। সে কি ভাবিয়াছিল ? চিন্তাহরণের পক্ষ হইয়া সে মনোরমার নিকট ওকালতি করিবে ? —স্বামী তাহার এতই পর ? মনোরমার অভিমান আছে বৈ কি। এখনো তাহা যায় নাই। দীক্ষা গ্রহণ কালেত তাহাকে চিন্তাহরণ স্মরণ করে নাই। মনোরমা সেই অভিমান মনে মনে এখনো পোষণ করে। কিন্তু তারা সত্বেও চিন্তাহরণ ত স্বামীই ; —মনোরমা বলিবে কেন সে চিন্তাহরণের স্ত্রী নয় ? এই অন্যায় সে করিবে কেন ? স্বামীর গৃহে আসিতই সে একদিন। তাহার সংসার সে করিবে না ত কি ? তবে শশুরের জীবিত কালে আসিত না। কিন্তু এখন তিনি আবার সংসারী হইয়াছেন, মনোরমার আর দেরী করা কেন ?

নন্দীগ্রাম ছাড়িয়া মনোরমা প্রথম আসিয়াছিল পিত্রালয়ে। পিত্রালয় হইতে বারুণী স্নানের উপলক্ষ করিয়া আসিল শহরে মাতুলালয়ে। মা ছিলেন সঙ্গেই। তিনি অবশ্য মনোরমার সংকল্প জানেন না। কিন্তু তিনি বরাবরই বলিতেন—মনোরমাকে চিন্তাহরণের হাতেইত তিনি দান

করিয়াছেন—পীতাম্বর গাঙ্গুলীকে নয়। —আজ এই বালক প্রোন্‌পোটিকে সঙ্গে লইয়া মনোরমা একাকিনী কাহাকেও কিছু না বলিয়া এই বাড়িতে আসিয়াছে। ছেলেটি বাড়ি চিনে, সে যে চিন্তাহরণেরই ইস্কুলের ছাত্র।

মন যখন স্থির তখন সমস্যাটা মনোরমার নিকট অত জটিল মনে হয় নাই। যদি চিন্তাহরণ তাহাকে আজ এখন প্রত্যাখ্যান করিত? সে ভয় মনোরমার মনে স্থান পায় নাই। মনোরমা আপনার শক্তি জানে। সে নিরপরাধ; কোন্ ধর্মের সাধ্য আছে বলে সে ছোট? নিষ্পাপ মেয়েকে কোনো স্বামীর সাধ্য আছে অসম্মান করিতে পারে? সাধ্য আছে তাহার স্বামীর অগ্রাহ্য করিবে তাহার মনের বিশ্বাস দেবতা ধর্ম্ম?

এক বেলার মধ্যে এতদিনকার জটিল সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। আর গিরীশকে ভাবিতে হইবে না—কোন্ নবদীক্ষিতা ব্রাহ্মকন্যাকে বিবাহ করিতে দাদাকে সম্মত করা যায় কিরূপে। রাজীব কল্পনাও করে নাই এমন সহজ ভাবে কোনো শিক্ষা-দীক্ষা-হীন নারী, সেকালের গৃহবধূ, আপনা হইতেই আপনার মন স্থির করিতে পারে। অবগুণ্ঠন থাকিলেও মনোরমা এখনো তাহাকে তাহার নির্বুদ্ধিতার জন্য উপহাস করিতে ছাড়িল না। দিন্ তিনি সেই গঞ্জনা;—রাজীব মহাউৎসাহে গিরিশকে আজ সংবাদটা দিয়া লিখিল—ভাবিল না গিরীশ প্রীত হইবে কিনা দাদার এই 'হিন্দু স্ত্রীর' ভার গ্রহণে। রাজীব লিখিল,—" স্বাধীনতা-বোধ ইহকে বলে না আবার কাহাকে বলে? পীতাম্বর গাঙ্গুলী জানে না—আমাদের মেয়েরা সত্যই সংসারের লক্ষ্মী। শুধু লক্ষ্মী নয়, তাঁহারা শক্তি স্বরূপিনী। এই সত্যটাই ত আমরা ব্রাহ্ম যুবকেরা আজ জগতের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিব। সেইদিন আসিয়া গিয়াছে। তাই ত বধূঠাকুরাণী এমন করিয়া আসিয়া আমাদের গৃহে উঠিলেন। এই স্রোত কে রোধ করিবে?"

সমাপ্ত